প্রথম প্রকাশ : ১৯৭১

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

সূচীপত্র

ভূমিকা

'অধুনাতন কালের বঙ্গসমাজে যে সকল মহাদোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া মধ্যে মধ্যে মনে অতিশয় দুঃখের উদয় হয়।.... বন্ধুভাবে সুমিষ্ট স্বরূপাখ্যান বর্ণনা, সেই দোষ সকল প্রতিকারের প্রধান উপায় মনে করিয়া গ্রন্থের সকল স্থানে আমি তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।' "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখক এই ভাবে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং গ্রন্থে বর্ণিত 'অধুনাতন কাল' হলো উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। বঙ্গসমাজে 'মহাদোষ' অবশ্য অনেক আগেই প্রবেশ করতে শুরু করেছে, তবে শতাব্দীর শেষপাদে এ সম্বন্ধে বাঙালী একটু বেশী সচেতন হয়ে ওঠে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) জাতীয় সভায় "সে কাল আর এ কাল" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং তাঁরও অভিপ্রায়, 'ইংরাজী শিক্ষার ইষ্ট বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে যে সকল অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই, আমি সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি, পূর্ব্বে আমার এইরূপ মানস ছিল।' ('প্রথম বারের বিজ্ঞাপন', "সে কাল আর এ কাল")। ইংরাজী শিক্ষা তথা বিদেশী ভাবানুকরণের ফলে বাঙালী সমাজে যে-পরিবর্তন ঘটে তা নিয়ে রাজনারায়ণের পূর্বেও অনেকে আলোচনা করেছেন, এবং শুধু ইংরাজী-শিক্ষার 'ইষ্ট' নয় 'অনিষ্ট' সম্বন্ধেও অনেক বাদপ্রতিবাদ হয়েছে। আসলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই বাঙালী সমাজে নানা পরিবর্তন ক্রমশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, এবং একদিকে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজ এই রূপান্তরে যেমন বিচলিত হয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণের দল সমাজ-ধর্ম-সাহিত্য সর্বক্ষেত্রে বিদ্রোহ ঘোষণায় তৎপরতা দেখিয়েছেন। ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের "সমাচার দর্পণ" খুললেই চোখে পড়বে উত্তেজিত পত্রপ্রেরকদের যুবাসম্প্রদায় সম্বন্ধে নানা অভিযোগপূর্ণ পত্রাবলী :

> বিদ্যা গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজী কথা প্রায় দুই তিন শত শিখেন নোটের নাম লোট বডিগর্ডের নাম বেনিগারদ লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্ব্বদাই

হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাঙ্গলা ভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙ্গালি পত্রও লিখেন না সকলকেই ইংরেজী চিঠী লিখেন তাহার অর্থ তাঁহারাই বুঝেন, কোন বিদ্বান্ বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠী বুঝিতে পারেন। ("সমাচার দর্পণ", ১৫ সেপ্টেমবর ১৮২১)।

এই কলিকাতা মহানগরে অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরা পুরুষানুক্রমে পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যাভ্যাস দেবতা ব্রাহ্মণ সেবা ইষ্টপূজা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে নিয়ত কালক্ষেপণকরিতেছেন। কিন্তু এঁহারদিগের কাহারো২ যুবা সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন যেহেতুক কুশীল লোকেরা বিদ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না ইহাতে বয়ঃক্রীড়া কিরূপ চলে কেবল অনায়াসসাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয় তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এক২ বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপদ্বারা সর্ব্বদা সহবাস করিয়া প্রীতি জন্মায় সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও ঐ অসদালাপ দ্বারা ক্রমে২ ঐ পথবর্ত্তী হন। ("সমাচার দর্পণ", ১৬ মার্চ ১৮২২)।

'বাবু'রা ক্রমশ যে-পথ অনুসরণ করেছেন তা নিয়ে সেকালে অনেক ব্যঙ্গচিত্র রচিত হয়েছে, বিশেষ ভাবে মনে পড়বে প্রমথনাথ শর্মা [ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] রচিত "নববাবু বিলাস" (১৮২৩?) পুস্তিকাটির কথা, যেখানে সমাজ-বিপ্লবে বিব্রত ও উত্তেজিত লেখক 'নববাবু'র কীর্তিকলাপ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেন:

ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্ম্মকার চর্ম্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যা-গমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমনী-সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন

বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন···। ("নববাবুবিলাস," কলিকাতা, রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ১৩৪৪, পৃ. ১০)

হঠাৎ-নবাব এই বাবু-সমাজ প্রাচীনদের তর্জনীতে ভ্রূক্ষেপ করে নি সত্য, কিন্তু কোথাও একটা অদৃশ্য শৃঙ্খলও ছিল, যাকে একেবারে অস্বীকার করা যুবা-সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফলে মিথ্যাচার বেড়েছিল ; একদিকে বাহিরে হিন্দুয়ানী রক্ষার প্রয়াস অন্যদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা—এই নিয়ে সমাজ চলছিল ; সামাজিক কাঠামোটি ভেঙে পড়ে নি। "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" (১৮৬১) যখন লেখা হচ্ছে তখনও পর্যন্ত এই ধারাই চলছে, যদিও সে-দিনের যুবকেরা অনেকেই তখন সমাজপতির আসন পেয়ে গেছেন।

রাজনারায়ণ বসু যিনি যৌবনে অপরিমিত মদ্যপান করে 'টপভুজঙ্গ' হয়ে থাকতেন, তিনিই প্রৌঢ় বয়সে লিখছেন 'মদ্যপান যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে অতি ভীষণ অনিষ্টপাতের কারণ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ···· যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে।' ("সে কাল আর এ কাল", কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৯)। এবং শুধু মদ্যপান নয়,—শরীর, বিদ্যাশিক্ষা, উপজীবিকা, সমাজ, চরিত্র, রাজ্য এবং ধর্ম—সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীর অবনতি তাঁর চোখে পড়েছে। মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাঙালী সমাজের সর্বাঙ্গীন অধঃপতন ঘটেছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। আসলে যা ঘটেছে, তা হলো এই—পঞ্চাশ বছর আগে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তা ক্রমশ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ভালো-মন্দ মিলিয়েই এই পরিবর্তন ঘটেছে। তবে শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরাজী-শিক্ষার 'অনিষ্ট' সম্বন্ধে অন্তত সকলের মনে আতঙ্ক জাগে নি, তাহলে ইংরাজী-শিক্ষা লাভের জন্য বাঙালী আকুল হয়ে উঠতো না। ইংরাজী-শিক্ষার ফলও তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। ধীরে ধীরে ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রূপান্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো। তখনই প্রবীণদের মনে দেখা দিল 'অনিষ্ট' চিন্তা।

পরিবর্তনের জন্য দায়ী অবশ্য শুধু 'ইংরাজী-শিক্ষা' নয়। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে সকলে সমান সচেতন না হলেও, তার গুরুত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। শতাব্দীর প্রথম দিকে যে 'বাবু'-সমাজের উদ্ভব হয়েছিল, তারাই পরবর্তীকালে শহুরে-মধ্যবিত্তে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথমে যা ছিল অন্ধ অনুকরণ ও অমিতাচার, তাই পরে সংস্কার ও শিষ্টাচারে

পরিণত হয়। আজকের দিনে আমরা বুঝি, কিছু পেতে হলে কিছু হারাতে হয়। শতাব্দীর শেষপাদে রাজনারায়ণ বসু উত্তেজিত কণ্ঠে অভিযোগ করছেন, 'চতুর্দ্দিকে হীন অনুকরণের প্রবলতা দৃষ্ট হইতেছে। প্রতি পদেই অনুকরণ, ইহাতে আন্তরিক সারবত্তার হানি হইতেছে, বীর্য্যের হানি হইতেছে, আমরা অন্য সমাজীয়দের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছি। কি আশ্চর্য্য! সাহেবেরা যাহা করিবেন, তাহাই ভাল, আর সব মন্দ। ("সে কাল আর এ কাল," পৃষ্ঠা ৬৯)। বলাবাহুল্য' এ অভিযোগের সারবত্তা স্বীকার করে নিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন, 'অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে ; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।' ('সে কাল আর এ কাল', "বঙ্গদর্শন", পৌষ ১২৮১। পরে 'অনুকরণ' নামে প্রবন্ধটি "বিবিধপ্রবন্ধ" প্রথম খণ্ড-এর অন্তর্ভুক্ত)। অনুকরণের ফলে, এবং অনুকরণ সত্ত্বেও আমরা রামমোহন, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রকে পেয়েছি। রাজনারায়ণের ভাষায় এঁদের 'Anglicized বুড়ো' বলতে পারি, কিন্তু তাঁরা সে-কালের মানুষ, না এ-কালের মানুষ বলা কঠিন। আসলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দেখা গেল শতাব্দীর প্রথম পাদ সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ মনোভাব,—সে-কালের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনে আশ্চর্য তৎপরতা।

শুধু বয়োবৃদ্ধি বা কালগত দূরত্বই এর একমাত্র কারণ নয়। শতাব্দীর প্রথম দিকে জোয়ারের জলে পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিল, সে ছিল আত্মবিস্মৃতির কাল। তার মধ্যে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর বিরল ব্যতিক্রম। শুধু যুবাসম্প্রদায়ের 'মতিভ্রম' হয়েছিল তাই নয়, প্রবীন সমাজ-পতিরাও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কি হচ্ছে,—বড় দ্রুত সে পরিবর্তন। তারপর ধীরে ধীরে ভঁটার সময়ে পায়ের তলায় মাটি ফিরে এল—হঠাৎ যেন দীর্ঘ সুপ্তির পর জেগে ওঠা। দেখা দিল আত্মজিজ্ঞাসা। হয়তো এর মধ্যে কিছুটা পিছুটান ছিল, তবু এ কথাও সত্য, এই প্রথম বাঙালী আত্মস্থ বোধ করলো। প্রাচীন এবং নবীনের দ্বন্দ্ব নূতন ভাবে শুরু হলো ; যারা ছিল একদা নবীন, তারাই আজ প্রাচীন। রাজনারায়ণ বসু বিরল ব্যতিক্রম নন। সে কাল আর এ কালের তুলনায় অনেকেই

আগ্রহী হয়ে উঠলেন (দ্রষ্টব্য, ভোলানাথ চক্রবর্তী প্রণীত "সেই একদিন আর এই একদিন, অর্থাৎ বঙ্গের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা", ১৮৭৫)। "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" এই ধারারই একটি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু অধুনা বিস্মৃত, নিদর্শন।

'দেবলোকস্থিত মনোরম উদ্যানে' প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) আসর জমিয়ে বসে আছেন, তাঁর চারপাশে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, কালীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি একে একে সমবেত হলেন। 'নানাবিধ সদালাপের পর প্রিন্স্ জিজ্ঞাসিলেন, আমার দেহান্ত হইলে বঙ্গভূমি কীদৃশ বেশবিন্যাসে ও কীদৃশ ব্যক্তিবৃন্দে বিভূষিত হইয়াছে, সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে আমার যৎপরোনাস্তি ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; আপনারা সদয় চিত্তে তৎসমুদয় আমাকে অবগত করিলে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিব।' ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরলোকগমনের পর থেকে ১৮৭৫/৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বছরের বাংলা দেশের সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাহিত্যিক অবস্থা গ্রন্থটির দুই খণ্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। উন্নতির কথা কদাচিৎ বলা হলেও (দ্র· প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ), অবনতির চিত্রাঙ্কনেই লেখক বেশী আগ্রহী। এদিক থেকে রাজনারায়ণের সঙ্গে "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়"-এর লেখকের মনোভঙ্গির সাদৃশ্য আছে। তিনি শুধু রাজনারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন না, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সঙ্গে রাজনারায়ণের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তবে রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজের ছাত্র, সে-কালের আধুনিক মানুষ,৷ তিনি পরিণত বয়সে এ-কালের নিন্দা করলেও এ-কাল সম্বন্ধে একেবারে আশাহীন নন। "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থে এ-কাল সম্বন্ধে নৈরাশ্যের ভাবই প্রবল, কারণ লেখক বর্তমানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। লেখক ভাঁটার টানে অনেকটা পিছিয়ে যেতে চান, যেখানে ফিরে যাওয়া বাস্তবে আজ আর সম্ভব নয়। তাই "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থে কিছুটা জ্বালা আছে, আক্রোশ আছে—কৌতুকের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত পক্ষপাত গোপন থাকে নি।

নিরপেক্ষতার অভাব সত্ত্বেও "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থটি কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান বিবেচিত হবে। কলিকাতা শহর কি ভাবে

পরিবর্তিত হচ্ছে—রাস্তাঘাট, যানবাহন, দোকানবাজার তার চিত্র গ্রন্থটিতে পাওয়া যাবে। ১৮৭০-৭৭ সালের সাময়িক অনেক ঘটনাও উল্লিখিত হয়েছে, যার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। 'ইংরাজী-শিক্ষিত' সম্প্রদায় এই গ্রন্থের নায়ক—কিভাবে তাঁরা বাঙালী-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, এবং আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছেন,—দেখানোই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। 'অনুরাগ'-প্রিয় ও 'ভারত-প্রিয়' বাঙালীকে নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে, কিন্তু বাংলা দেশ যে ক্রমে 'বর্বর-স্থান'-এ পরিণত হচ্ছে, তা নিয়ে লেখকের ক্ষোভ যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে। লেখক দেখছেন, স্নেহ, মায়া, মমতা, হৃদয়বত্তা—সব লুপ্ত হয়েছে। বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি, চিকিৎসা—সর্বক্ষেত্রে অন্যায়, অসাধুতা ও প্রতারণা বাড়ছে। বলাবাহুল্য, লেখকের বিচার সে-কালের সঙ্গে এ-কালের তুলনা সূত্রেই নির্ধারিত, এবং ধরেই নেওয়া হয়েছে সে-কালে ক্ষোভের কোনো কারণ ছিল না। এ-কালের সামাজিক রীতিনীতি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তার কারণ শুধু ইংরাজী-শিক্ষার প্রসার বা সাহেবদের অনুকরণ নয়, আসলে অর্থনৈতিক বিশেষ-অবস্থা পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। লেখক এ সম্বন্ধে একেবারে অচেতন নন, তবে তিনি যে 'দেবলোক'-এর স্বপ্ন দেখেন, সেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা মানব-জীবনের নিয়ন্তা নয়। লেখক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন নি, অথচ তিনি জানেন, ইংরেজ শাসন এবং নূতন বাণিজ্যিক নীতি সমাজ-পরিবর্তনের কারণ। এইখানে তাঁর স্ববিরোধ—বর্তমানকে স্বীকার না করে উপায় নেই, অথচ বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে অক্ষম।

লেখক যে-আদর্শ তুলে ধরতে চান তা সে-কাল বা এ-কালের আদর্শ নয়, তা নিত্যকালের অভীষ্ট বস্তু। সুতরাং এ-কালের সমালোচনা করেছেন বলেই যে তিনি প্রাচীনপন্থী এমন বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন রাজনারায়ণের প্রবন্ধটি সমালোচনা করেছিলেন তখন তাঁর মনেও প্রশ্ন জেগেছিল এই তুলনার সার্থকতা সম্বন্ধে; তিনি লেখেন, 'রাজনারায়ণবাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করেন, রাজনারায়ণবাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করিয়াছেন—বাঙ্গালির হিতার্থে। সে কালে আর এ কালে নিরপেক্ষভাবে তুলনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—এ কালের দোষনির্ব্বাচনই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ কালের গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই—করাও

নিষ্প্রয়োজন; কেন না, আমরা আপনাদিগের গুণের প্রতি পক্ষকের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি।' ('সে কাল আর এ কাল')। "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" সম্বন্ধেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য। লেখক দ্বিতীয় খণ্ডের 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছেন, "এক্ষণে বঙ্গসমাজে যে সকল অনুচিত রীতি পদ্ধতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কিয়দংশ প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করায় সারদর্শী বিজ্ঞগণ যথেষ্ট অনুরাগের সহিত তাহা পাঠ করিয়া বলেন, 'মধ্যে মধ্যে ঐরূপ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় বিপথস্থ জনগণের অনুচিত রীতি পদ্ধতি নিবারণের যত্ন করা উচিত।'... মহোদয়গণ আরো এই মনে করিয়া লেখকের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন যে আমি বিদেশীয় ব্যক্তি নহি, তাঁহারা যে বঙ্গমাতার সন্তান আমিও তাঁহারই সন্তান। তাঁহারদিগের ভ্রাতা, ভ্রাতাগণের অনুচিত রীতি পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমি লেখনী ধারণ করিয়াছি, সেই হেতু যেন তাঁহারা আমার প্রতি অসন্তোষ ও অস্নেহ প্রকাশ না করেন, আমি তাঁহারদিগের অত্যাজ্য বস্তু ও তাঁহারদিগের নিকট অশেষবিধ প্রশ্রয় পাইবার অধিকারী।"

সমাজ-পর্যালোচনায় বিপদ দেখা দেয় নি, কারণ লেখক সেখানে বাঙালী মধ্যবিত্ত সংস্কার দ্বারা চালিত, তিনি দশজনের একজন হয়েই কথা বলেছেন। বেশভূষা-আচারঅনুষ্ঠানে যে পরিবর্তন হচ্ছে, অধিকাংশ বাঙালী তখনও তা মেনে নিতে পারে নি। শাস্ত্র-নির্ভরতা এবং ঐতিহ্যবোধ রাজনারায়ণের 'এ-কালে' সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। বরং যেটুকু হারিয়েছিল তা আবার ফিরে আসছে।

সাহিত্যের উপর সমাজের প্রভাব পড়ে সত্য, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য প্রধানত কলিকাতা-কেন্দ্রিক হওয়ায় বৃহত্তর বাঙালী সমাজের সঙ্গে তার যোগ স্পষ্টগোচর নয়। বাঙালী সমাজে পরিবর্তনের গতি মন্থর, এমনকি কলিকাতার বাহিরে সমাজ অনেক পরিমাণেই অপরিবর্তিত। এ অবস্থায় বাংলা সাহিত্যে যে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে তার সঙ্গে বাঙালী সমাজের বৃহত্তর একটি অংশ মানস সাযুজ্য অনুভব করে নি। মাইকেল মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি তাই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শহরবাসীর উপভোগের সামগ্রী ছিল। "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রথম প্রকাশের পর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই; কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এ ও যেমন সত্য, তেমনি সংস্কৃত-পণ্ডিত-সমাজ এবং ঈশ্বরগুপ্ত-কবিওয়ালার কাব্য-পরিতৃপ্ত পাঠক "মেঘনাদবধ কাব্য" সম্বন্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এও ততোধিক

সত্য। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ যখন অসহিষ্ণুভাবে বলেন, 'বঙ্গমণ্ডলীতে নহে কেবল কতিপয় সামান্য শ্রেণীর বিষয়ী লোকের ও লেখকদিগের উৎসাহদাতা মহাশয়গণের নিকট তাহা প্রদীপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত, কি সাধুভাষায় সুশিক্ষিত কোন ব্যক্তির নিকট মাইকেলের যশঃ প্রদীপ্ত হয় নাই।'—তখন তিনি নিঃসন্দেহে বহুতর বাঙালী কাব্য-পাঠকের সমর্থন লাভ করেছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে কিছুটা স্বীকার করে নিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র তখনও অপাঙ্‌ক্তেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে মধুসূদনের মতোই প্রধান অভিযোগ ছিল যে, তিনি বিজাতীয় ভাবাপন্ন লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি ও ভাষাকে কিছুতেই 'জনগণ' নিজের বলে স্বীকার করতে পারছিল না। তুলনায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা প্রশংসা পাবে এই তো স্বাভাবিক। এবং আজকের দিনে সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা পাদটীকায় স্থান লাভ করেন, তাঁরা সেদিন ছিলেন বহু প্রশংসিত, যেমন নীলমণি বসাক, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য, মধুসূদন বাচস্পতি। ইংরাজী-জানা এবং ইংরাজী-না-জানা—এই উভয় দলের বিরোধ উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে; আধুনিককালে একেই বলা হয়—'আমরা' ও 'তাঁহারা'র বিরোধ। "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থে 'তাঁহাদের' বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে (আক্ষরিক অর্থে 'ইংরাজী-না-জানা' শব্দটি ব্যবহার করছি না),—'দুই এক মহাশয় ব্যতীত এক্ষণে বঙ্গভাষায় কোন ইংরাজী-শিক্ষিত খঞ্জনী-ভায়ারা, নির্দোষ কবিতা লিখেন নাই, পরেও যে তাহা লিখিবেন, সে আশাও নাই; কবিতা-সম্বন্ধে ইঁহাদিগের রুচিই অপ্রশংসনীয়।'

"সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থের লেখক নিরপেক্ষ নন, কিন্তু একশো বছর পরে আজকের দিনে আমরাও নিরপেক্ষ নই। তাঁরা ছিলেন এক পক্ষে, আমরা অন্য পক্ষে। তাঁরা একদা বিচারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন, ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরাজয় না হলেও, আজ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হারিয়েছেন। আমরা কিছুটা সুবুদ্ধির অধিকারী বলে বিচারক-পদের জন্য প্রলুব্ধ নই। "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" অতীত বঙ্গের পরিচয়, 'সে কাল' থেকে আমরা আজ দূরে সরে এসেছি। 'এ কালে'র সঙ্গে 'সে কালে'র তুলনা আমরা করবো না। তবে 'সে কাল' সম্বন্ধে আমাদের বিতৃষ্ণাও নেই, বিমুগ্ধতাও নেই। যদি সুবুদ্ধির অধিকারী হই, তাহলে আমরা 'সে কাল' থেকে কিছুটা শিক্ষা নিতে পারি, 'এ কাল'-কে বোঝার জন্যই 'সে কাল'-কে জানা দরকার।

"সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" আমাদের জ্ঞানের রাজ্য কিছুটা প্রসারিত করবে, এই আশা নিয়ে গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

গ্রন্থ পরিচয়

"সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" দুই খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডের দুটি সংস্করণের সন্ধান পাওয়া গেছে, প্রকাশকাল—প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করছি।

সুরলোকে/বঙ্গের পরিচয়।/প্রথম খণ্ড।/"অতোহর্সি ক্ষন্তমসাধু সাধু বা/হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"/কলিকাতা/শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্তৃক/প্রকাশিত।/সংবৎ ১৯৩২।

সুরলোকে/বঙ্গের পরিচয়।/দ্বিতীয় খণ্ড/"অতোহর্হসি ক্ষন্তমসাধু সাধু বা/হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"/কলিকাতা/বাল্মীকি যন্ত্রে/শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক/প্রকাশিত/সংবৎ ১৯৩৪।

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্র—
সুরলোকে/বঙ্গের পরিচয়।/প্রথম খণ্ড।/"অতোহর্সি ক্ষন্তমসাধু সাধু বা/হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"/দ্বিতীয় সংস্করণ।/Calcutta./Printed by Behary Lall Bannerjee/At Messrs. J. G. Chatterjee & Co's Press,/44, Amherst Street./Published by Kalikinkar Chakravarti./1882.

গ্রন্থকার পরিচয়

"সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নেই। তবে বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া আছে—হরনাথ ভঞ্জ। কলিকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পুস্তকতালিকায় সম্ভবত সেই কারণেই "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়"-এর লেখক হিসাবে হরনাথ ভঞ্জের নাম আছে। শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ 'সাহিত্যসেবকমঞ্জুষা'য় হরনাথ ভঞ্জকে "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়"-এর রচয়িতা বলে নির্দেশ করেছেন (দ্র. "মাসিক বসুমতী", কার্তিক ১৩৬১, পৃ. ৫৬)। বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগের নির্দেশ গ্রহণ করা

ছাড়া গ্রন্থকার-নির্ণয়ের অন্য কোনো উপায় বর্তমানে নেই। পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, দুটি খণ্ডই (প্রথম সংস্করণ) ছাপা হয়েছে বাল্মীকি যন্ত্রে; বাল্মীকি যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী ছিলেন হরনাথ ভঞ্জের অগ্রজ দ্বারকানাথ ভঞ্জ। ভঞ্জ পরিবারেরও ধারণা হরনাথ ভঞ্জ "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থের রচয়িতা।

চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত বহড়ু গ্রামে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে হরনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণমোহন ভঞ্জ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাঁথি-নিমক-মহলের পেস্কার ছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় এবং পরে ভবানীপুর স্কুলে হরনাথ পড়াশুনো করেন। বিভিন্ন সাহেবের অফিসে (টি. বি. শুইনহো, রবার্ট ও চেরিয়েল, ডি ক্রুজ প্রভৃতি) কিছুদিন চাকরি করার পর শ্যামাচরণ বসুর সঙ্গে একযোগে মুচ্ছুদ্দিগিরির কাজে নিযুক্ত হন। মুচ্ছুদ্দিগিরির কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তাঁকে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রজ দ্বারকানাথ এবং স্বগ্রামস্থ শ্রীনাথ বসুর সহযোগিতায় হরনাথ South Suburban Bahru School (গ্রন্থ-শেষে ব্যবহৃত S S.B S. আদ্যক্ষরগুলি স্কুলের নাম হতে পারে) স্থাপন করেন। 'বহড়ু হাই স্কুল' নামে বিদ্যায়তনটি এখনও হরনাথের স্মৃতি বহন করছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সেকালের বহু মনীষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। ১৪ই জুন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হরনাথের মৃত্যু হয়।

সম্পাদনা নীতি

"সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থের দুই খণ্ড একত্রে পুনর্মুদ্রিত হলো। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে; শুধু প্রয়োজনবোধে দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ প্রমাদগুলি প্রথম সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যে বক্তব্যগত ও তথ্যগত কোনো বৈষম্য নেই, তবে দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষার পরিমার্জনা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের (অন্য সংস্করণ পাওয়া যায় নি) পাঠ গৃহীত হয়েছে। মূল গ্রন্থের বানান ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত আছে। কিছু ছাপার ভুল অবশ্য সংশোধন করা হয়েছে (মূল গ্রন্থে 'শুদ্ধিপত্র'-এর তালিকাটি খুব ছোট নয়)। মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থে দুটি বক্ররেখার (/ /)

মধ্যে দেওয়া আছে। 'তথ্যপঞ্জী', 'নির্দেশিকা' এবং পাদটীকাগুলি বর্তমান সংস্করণে সম্পাদকের সংযোজন।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

গ্রন্থটি সম্পাদনা ও পুনর্মুদ্রণের কাজে অনেকে সাহায্য করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই কয়েকজনের নাম—অনুপরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, অশোক উপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ ভক্ত, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্যামাপ্রসাদ সরদার, সুভাষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বপন মজুমদার। এঁদের সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

অলোক রায়

সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়

প্রথম খণ্ড

বিজ্ঞাপন

অধুনাতন কালের বঙ্গসমাজে যে সকল মহা দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া মধ্যে মধ্যে মনে অতিশয় দুঃখের উদয় হয়। সেই দুঃখই আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত করিয়াছে। বন্ধুভাবে. সুমিষ্ট স্বরূপাখ্যান বর্ণনা, সেই দোষ সকল প্রতিকারের প্রধান উপায় মনে করিয়া গ্রন্থের সকল স্থানে আমি তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখে ঈষদ্ধাস্যের উদয় হয় এবং তাহার সহিত তিনি নিজ-দোষ সংশোধনে যত্নবান্ হয়েন, ইহাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, হয়ত গ্রন্থের স্বরূপাখ্যান সকল বন্ধুচক্ষে নীরস ভাব ধারণ করিবে। যদি তাহাই হয়, তবে বন্ধুবৃন্দ আমাকে হিতপ্রার্থী বিবেচনা করিয়া ক্ষমা করিবেন। ইহা নিশ্চিত ভাবিবেন, আমি যে সকল ব্যক্তির প্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছি, তাঁহাদিগের গুণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার মানস রহিল।

অবশেষে আমি এই গ্রন্থে যাঁহাদিগের সম্বন্ধে স্বরূপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট গ্রন্থের আখ্যা পত্রে উদ্ধৃত মহাজন বাক্য সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি,—"হিতকারী বচন সাধু বা অসাধু [illegible] তাহা ক্ষমার যোগ্য, যেহেতু হিতকারী অথচ মনোহারী বচন দুর্লভ।"

দেবলোক

দেবলোকস্থিত মনোরম উদ্যান হেমময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, তাহার অভ্যন্তরে সমতল পথানিচয় বিবিধ বর্ণ উজ্জ্বল প্রস্তরে আচ্ছাদিত, সকল পথের উভয় পার্শ্বে শ্যামল দূর্ব্বাদল সমাকীর্ণ ও অবিরল বৃক্ষরাজি স্থাপিত ; তত্রস্থ সূর্য্য-কিরণে উষ্ণতা নাই। উদ্যানের শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্রে কৃষ্ণসার মৃগ, বিচিত্র ময়ূর, ও হরিদ্বর্ণ শুকপক্ষী পরমোল্লাসে বিচরণ, উল্লম্ফন এবং মধ্যে মধ্যে কেলি করিয়া দর্শকদিগের নেত্ররঞ্জন করিতেছে। কিছু দূর অতিক্রম করিয়া উপবনের মধ্যদেশে উপস্থিত হইলে দৃষ্ট হয় এক অনির্ব্বচনীয় পুলকদায়িনী সদ্‌গন্ধযুক্ত মধুর-কল্লোলিনী স্বচ্ছ স্রোতস্বতী মৃদুমন্দ গতিতে বহমান হইতেছে। স্থানে স্থানে চিত্ত-তৃপ্তি-করী বিবিধ কুসুমলতা বৃহৎ বৃহৎ তরু আশ্রয় ও আবৃত করিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে অজস্র নিষ্কণ্টক-বৃন্ত-গোলাপ বিকসিত হইয়া আছে ; যাহার চিত্ত-বিনোদন সৌরভ সমীরণ সহকারে সতত প্রবাহিত হইতেছে। স্বরবান্ কোকিল কলহংস, অপ্সরা কুলের সুললিত সঙ্গীতে স্বর সংযোগ করিতেছে, স্রোতস্বতী তীরবর্ত্তি কুসুমিত তরু-লতায় ·প্রতিভা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে। সেই নানা উৎকৃষ্ট পদার্থ পরিপূরিত স্থানে এক কল্পবৃক্ষ জগতের যাবতীয় সুরস ফলে শোভা পাইতেছে,এই তরু- /১/ তলে হীরকমণ্ডিত পর্য্যঙ্কে, পয়ঃফেণনিন্দিত শুক্ল সুকোমল শয্যায়, প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর বিরাজ করিতেছেন। সেই শান্তিরসাস্পদ অমরাবতী তুল্য, [illegible]সেব্য প্রদেশে তাঁহার সহিত সন্দর্শন দ্বারা আত্মা চরিতার্থ করিতে অশেষ-শাস্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, জষ্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিত, জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রভৃতি মহোদয়গণের উজ্জ্বল আত্মা, ক্রমে ক্রমে উপনীত ও যথোপযুক্ত সম্মানিত হইয়া প্রিন্স্‌কে প্রদক্ষিণ পুরঃসর হেম-ময় দিব্যাসনে উপবেশন করিলেন। নানাবিধ সদালাপের পর প্রিন্স্ জিজ্ঞাসিলেন, আমার দেহান্ত হইলে বঙ্গভূমি কীদৃশ বেশবিন্যাসে ও কীদৃশ ব্যক্তিবৃন্দে বিভূষিত হইয়াছে, সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে আমার যৎপরোনাস্তি ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, আপনারা সদয় চিত্তে তৎসমুদয় আমাকে অবগত করিলে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিব।

সম্বাদতত্ত্ব

মৃত বাবু কালীপ্রসাদের উক্তি।

মহাশয় শ্রবণ করুন।

কলিকাতার বাহ্য দৃশ্য আর সেরূপ নাই। রাজপথে গ্যাসের নল, টেলিগ্রাফ্ তারের স্তম্ভ, ময়লানির্গমের ড্রেণ ও স্বচ্ছ-সলিলবাহিনী /২/ লৌহ-প্রণালী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গঙ্গায় দুই খান রেলওয়েষ্টীমার, নিয়ত লোক পারাপার করিতেছে। পশ্চিম ও পূর্ব্ব প্রদেশে, অহরহ ট্রেণ যাতায়াত করাতে, কত লোক, কত দ্রব্য দেশান্তরের পথ হইতে ক্ষণ মধ্যে কলিকাতায় উপস্থিত হইতেছে। পুরাতন ডাকঘর নাই, লাল দীঘির পশ্চিমে পূর্ব্বতন সেলাখানার স্থলে এক প্রকাণ্ড ডাকঘর[১], আর সেই ডাকঘরের স্থানে ছোট আদালতের অট্টালিকা নির্ম্মাণ হইয়াছে। টালা সাহেবের নিলাম ঘরের স্থানে আর এক বৃহৎ অট্টালিকা হইয়া তথায় করেন্সি আফিস ও আগ্‌রা ব্যাঙ্কের কার্য্য চলিতেছে। অস্লার ও বরকিনইয়ং সাহেবের কার্য্য ভূমিতে টেলিগ্রাফের আফিস[২] ও ড্যালহৌসি ইন্‌ষ্টিটীয়ুট[৩] নামক একটী গৃহ মার্কুইসহেষ্টিং-এর প্রতিমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে নির্ম্মিত হইয়াছে। উইলসন কোম্পানির হোটেল এক্ষণে গ্রেটইষ্টারণ হোটেল নামে খ্যাত হইয়াছে। যথায় সুপ্রিম কোর্ট ছিল, তৎপ্রদেশে হাইকোর্টের[৪] এক প্রশস্ত বিচারালয় নির্ম্মিত হইয়াছে; ক্যামক্ ষ্ট্রীটে হেঙ্গারবস্তি নামে যে বনাকীর্ণ স্থান ছিল, উহাকে মনোহর অট্টালিকা শ্রেণীতে সুশোভিত করিয়া ভিক্টোরিয়া স্কোয়্যার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মুর্‌গীহাটার ক্ষুদ্র পথ প্রশস্ত হইয়া ক্যানিং ষ্ট্রীট নাম পাইয়াছে। গরাণ হাটার রাস্তার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া বীডন ষ্ট্রীট নাম পাইয়া মাণিকতলাভিমুখে গিয়াছে। উহার দক্ষিণ ও চিৎপুর রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে বীডন্ স্কোয়্যার নামে এক মনোহর উদ্যান বাঙ্গালি মহাশয়গণের বিচরণার্থে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমে তাহাতে সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সে সকল স্থানান্তরিত করত এক্ষণে তথায় নির্গন্ধ-বিলাতী তরু লতা,

শোভা সম্পাদন করিতেছে। মলঙ্গার ওয়েলিংটন দীঘি, গ্রথিত হইয়া জলের হ্রদ করা হইয়াছে। ভিতরে হ্রদ, উপরে মৃত্তিকাবৃত বিচরণ স্থান। গঙ্গাতীরে একটী রাস্তা হইয়া আহিরী টোলার ঘাট /৩/ হইতে আর্ম্মানি ঘাটের সন্নিকটে আসিয়াছে। পটল ডাঙ্গার কলেজের সম্মুখে গোলদীঘি আর গোলাকার নাই, তাহা চতুষ্কোণ হইয়াছে। বোধ হয় বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নূতন অট্টালিকা[১] মহাশয়ের দেখা হয় নাই, সেটীও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। হিন্দু কলেজের প্রেসিডেন্সি কলেজ নাম প্রদত্ত হইয়া এতকালের পর উহার একটী সুচারু অট্টালিকা[২] বিনির্ম্মিত হইয়াছে। হেয়ার সাহেবের স্কুলের বাটী ছিল না, তাহা সম্প্রতি হইয়াছে[৩]। গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক পটলডাঙ্গায় বৃহত্ বৃহত্ স্তম্ভ বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়[৪] প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রাহ্ম কেশব[৫] ঝামাপুকুরে এক উপাসনা মন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে মন্দির মস্‌জিদ গির্জ্জা তিনেরই অবয়ব আছে। ৪৫ বৎসরের অধিক হইল, লোকে শুনিয়া আসিতেছিলেন, গঙ্গার উপরে এক সেতু নির্ম্মাণ হইবে। শুনিলাম, সংপ্রতি মির্‌বহর ঘাটের দক্ষিণে অপূর্ব্ব লৌহসেতু বিচিত্র বিলাতীয় শিল্পের পরিচয় দিতেছে। মর্ত্ত্য লোকের, সেই শিল্পকার্য্যটী, মহোদয়ের দর্শনীয় পদার্থ; পূর্ব্বতন বোডঘরের স্থানে ইণ্ডিয়ান্‌মিয়ুজিয়ম্[৬] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাটের কলে কলে বাগবাজার কাশীপুর আকীর্ণ হইয়াছে। নিম্‌তলার ঘাটে হিন্দু হিতার্থী রামগোপাল বাবুর[৭] যত্নে শবদাহ কার্য্যের ইষ্টক নির্ম্মিত শ্মশান স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু অনেক ইংরাজ ও হিন্দুকুলতিলক চন্দ্রকুমার ডাক্তার[৮] নিমতলায় শবদাহ সম্বন্ধে অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় সে প্রকার লাল সুর্‌কীর রাস্তা নাই। এক্ষণে প্রস্তর খণ্ডের রাস্তা এবং প্রধান প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বে ফুটপাত হইয়াছে ও পরমিট্‌ ঘাটে আমদানি রপ্তানির সুন্দর জেটি প্রস্তুত হইয়াছে। নগরে তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মাণের নিষেধ হওয়াতে, দীনদুঃখী লোকেরা খোলার ঘর প্রস্তুত করিয়া

১ ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল-এর নূতন গৃহ ১৮২৫

২ জর্জ ক্যাম্বেল কর্তৃক প্রেসিডেন্সী কলেজ গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন ৩১ মার্চ ১৮৭৪

৩ হেয়ার স্কুল গৃহ ১৮৭২

৪ সেনেট হাউস ১৮৭২

৫ কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা ২২ অগাস্ট ১৮৬৯

৬ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম গৃহ ১৮৭৫

৭ রামগোপাল ঘোষ

৮ চন্দ্রকুমার দে

তাহাতে বাস করিয়া সূর্য্যের উত্তাপ, বর্ষার জল, শীতকালে হিমপ্রবাহ ও পক্ষীর উপদ্রব ভোগ করিতেছে।/৪/

এক্ষণে যেরূপ অসংখ্য বিজাতীয় রোগের ও লেখকের বৃদ্ধি হইয়াছে, তদুপযুক্ত ঔষধালয় ও মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তখনকার মত আর কেরাচি গাড়ি নাই। তাবত ভাড়াটে গাড়ি, পাল্কি গাড়ির অবয়ব ধরিয়াছে।

মাথায় প্রায় কোন কুটীওয়ালা কেটী পাক্‌ড়ী বাঁধেন না, মেরজাইয়ের বদলে দল্‌দলে তাকিয়ার গেলাপের মত একপ্রকার গাত্রাবরণ হইয়াছে, তাহার নাম পিরাণ, সকলেই তাহা ব্যবহার করেন। কলিকাতার স্ত্রীলোকেরা মল, মিশি, নত, পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মোজা ও চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করা উচিত ছিল, তাহা করেন না। কিন্তু স্থানে স্থানে পর্ব্বোপলক্ষে মল, ঠন্‌ঠনের চর্ম্মপাদুকা ও চরণাবরণ পরিধান করিয়া রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দেখা গিয়াছে। কর্ম্মচারী মাত্রে প্রায় সকলেই, প্যান্টুলেন চাপকান ব্যবহার করিতেছেন। যবনের ন্যায় প্রায় সকল হিন্দুই শ্মশ্রুধারী হইয়াছেন। ধূমপান প্রায় তিরোহিত হইয়া নস্য গ্রহণের আবির্ভাব হইয়াছে। বিশেষতঃ নস্যদানী কিশোরদিগের করে চিরপ্রণয়িনী হইয়া আছে।

ভারতীয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁ-দিগের দুই একজন ব্যতীত সকলেই ইংরাজদিগের অভিপ্রায়ে ক্রমাগত সম্মতি-সূচক শিরশ্চালন দ্বারা ডিটো দিতেছেন।

সুপ্রিম্‌কোর্ট ও সদর দেওয়ানী উভয় আদালত সম্মিলিত হইয়া হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই কোর্টে ক্রমে ক্রমে চারিজন বাঙ্গালি জজ[১] নিযুক্ত হইয়া তাহার মধ্যে তিনজন কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে মৃত দ্বারকানাথ মিত্র, যে বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সার্থক। এক্ষণে হাইকোর্ট ও তাহার বিচারাসন, পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দৃশ্যে /৫/ সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু তথায় বিচার কার্য্য পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় না। হাইকোর্টে আর বয়োধিক বিচারপতি নাই। উক্ত রুধিরে সত্বাসত্ব ও দোষাদোষ মীমাংসা ও দণ্ড বিধান করিতেছেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ পূর্ব্বে ইংরাজী বক্তৃতা

১ শম্ভুনাথ পণ্ডিত (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩–৬ জুন ১৮৬৭, মৃত্যু); দ্বারকানাথ মিত্র (১৬ জুলাই ১৮৬৭–২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, মৃত্যু); অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৬ ডিসেম্বর ১৮৭০–১৭ অগাস্ট ১৮৭১, মৃত্যু): রমেশচন্দ্র মিত্র (৩০ মার্চ ১৮৭৪–১ জানুয়ারি ১৮৯০)

করিতেন একণে পরম পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অনরএবল্ দিগম্বর মিত্র সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়ট পত্র প্রকাশিতেন, এক্ষণে কৃষ্ণদাস পাল সে কার্য্য করিতেছেন।

পূর্ব্বে অনেক কৃতবিদ্য লোক ছিলেন, তাঁহাদিগের কোন উপাধি ছিল না। এক্ষণে বিলাতের প্রথানুসারে অনেকে বি এ; এম্ এ; বি এল্ ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতেছেন। এডুকেশন কৌন্সিল রহিত হইয়া ডিরেক্টর ও ইনস্পেক্টর দ্বারা শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ হইতেছে। এমন পল্লী দেখা যায় না যে তথায় গবর্ণমেন্ট সাহায্যাধীন বাঙ্গালা অথবা ইংরাজী ভাষায় বিদ্যালয় নাই।

মতভেদ কত প্রকার হইয়াছে বলা যায় না। বিধবা বিবাহের দল, বেশ্যা বিবাহের দল, নীচ জাতিতে বিবাহ করিবার দল, বহু বিবাহ নিবারণের দল, বাল্য বিবাহ রহিতের দল, ভার্য্যা বিবাহ দাতার দল, নগরে যূথেযূথে দেখা যায়।

যুবকেরা বিলাতে গিয়া, কেহ কেহ বেরিষ্টার, কেহ ডাক্তার হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াই ইংরাজ পল্লীতে বাস করিয়া থাকেন। নির্ব্বোধ পিতা মাতারা, পুত্রদিগকে উচ্চপদস্থ ও ইংরাজ ভাবাপন্ন করণার্থে বিলাত পাঠাইতে ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু তদ্দারা পিতা মাতা স্বদেশী স্বজনগণের কতদূর বিঘ্ন সংঘটনা হইতেছে, তদ্বিষয়ে পিতা মাতার চৈতন্য জন্মিতেছে না। ইংরাজ ভাবাপন্ন পুত্রেরা যে উত্তর কালে পিতা মাতা স্বজনগণের কোন উপকারে আসিবেন, তাহার আর অণুমাত্র আশা ৵ নাই। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীকে ইংরাজেরা প্রায় কোন সাহায্য করেন না, তাঁহারাও ইংরাজ ভাবাপন্ন হইয়া সেইরূপ করেন। জানি না তাঁহারা, কাহার কি করিবেন।

দেশীয় মুদিরা তাঁহাদিগের নিকট কোন প্রত্যাশা করিতে পারে না, বিলাতের ফেরোতেরা, চাউল ডাউল প্রভৃতি ভোজ্য, তাহাদিগের নিকট ক্রয় করেন না। কুম্ভকারেরা. কি প্রত্যাশা করিবে? ফেরোতেরা, কলাই করা ডেকে, রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তৈলকারেরা কি প্রত্যাশা করিতে পারে? এক্ষণে ফেরোতেরা, তৈলের পরিবর্ত্তে চর্ব্বি ব্যবহার করিয়া থাকেন। হিন্দু দাসীরা, উহাঁদিগের নিকট কি প্রত্যাশা করিতে পারে? এক্ষণে যবনীরা, তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছে। হিন্দুভৃত্যেরা তাঁহাদিগের ৵ নিকট কি লাভ করিতে পারে? যবন খেজমত-গারেরা, তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত

করিতেছে। শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা ঢাকার তন্তুবায়েরা কি ভরসা করিতে পারে? এক্ষণে ফেরোতেরা, বিলাতীয় বস্ত্রের কোট প্যান্টুলান ব্যবহার করিতেছেন। মোদক মেঠাইওয়ালারা ফেরোতের নিকট কি লাভ করিতে পারে? এক্ষণে উইলসনের হোটেল হইতে তাঁহাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য আসিতেছে। কংসকারেরা তাঁহাদিগের নিকট কি উপার্জ্জন করিতে পারে? এক্ষণে কাঁচের বাসন তাঁহাদিগের ভোজন পাত্র হইয়াছে। ভারবাহকেরা তাঁহাদিগের নিকট কি প্রত্যাশা করিতে পারে? এক্ষণে মোষক বাহক ভিস্তিরা, তাঁহাদিগের পেয় ও স্নানীয় জল যোগাইতেছে। স্বর্ণকারেরা, তাঁহাদিগের নিকট কি লভ্য করিতে পারে? এক্ষণে ফেরোতদিগের বিবিভাবাপন্ন গৃহিণীরা, কোন অলঙ্কার ব্যবহার করেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, কি করিবেন, তাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ শাস্ত্র, বিলাতি ফেরোতদিগের নিকট প্রভা পাইতেছে না। /৭/

বাঙ্গালার কত প্রকার কর হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা করা যায় না, পুলিস ট্যাক্স, লাইটিং ট্যাক্স, গাড়ীর ট্যাক্স, বাটীর ট্যাক্স, পথের ট্যাক্স, বোটের ট্যাক্স, প্রভৃতি ট্যাক্স মনুষ্যকে উৎখাত করিয়াছে।

নিদারুণ দুঃখের কথা কি কহিব, বাঙ্গালি বাবুরা, বাঙ্গালির সভাতে নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া, মাতৃভাষার প্রতি অরুচির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণবর্ণা খৃষ্টান মহিলারা ও বিলাতী ঢঙ্গের বাঙ্গালি স্ত্রীরা শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে মুখমণ্ডলে এক প্রকার শ্বেত চূর্ণ প্রক্ষেপ করেন; অকস্মাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁহারা ময়দার মোট বহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের গাউন পরিচ্ছদের বিকট চটকের দ্বারা, গতি বিধান কালে বোধ হয় যেন ধীবর কন্যারা, জলাশয়ে বংশনির্ম্মিত মৎস্যধরা পোলো বাহিয়া চলিতেছেন। যাঁহারা পল্লীগ্রামের মৎস্যের জলায় গিয়াছেন, তাঁহারা এ দৃষ্টান্তটীর সার্থকতা মানিতে দ্বৈধ করিবেন না। এই শ্রীমতীরা, হোএল বোন্ বাস্কেট ও প্যাডের সাহায্যে নিতম্বিনী হইয়া থাকেন।

এক্ষণে প্রতি গ্রামে প্রতি পল্লীতে গ্রন্থকর্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। কতই তর-বে-তর দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক সমাচার পত্র প্রকাশিত হইতেছে। কতই নভেল ও নাটকের সৃষ্টি কর্ত্তা হইয়া, আপনাপনি, পরস্পরের প্রশংসা করিতেছেন। এতদ্বিষয়ের সবিস্তর পশ্চাত বর্ণন হইবে। বঙ্গবাসী ইংরাজী শিক্ষিতেরা কিছু দিন ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন; কিন্তু

পরকীয় ভাষায় মনের ভাব তত আয়ত্তমতে প্রকাশ হয় না, তজ্জন্ত তাঁহারা এক্ষণে প্রায় দেশীয় ভাষায় পুস্তক ও প্রবন্ধ সকল লিখিতেছেন।

রাজা, C.S.I., K.C.S.I. প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক উপাধি অনেকে পাইতেছেন যাঁহাদের নিজে খাস্ত বস্ত্র ক্রয়ার্থে নিত্য হাট বাজারে না যাইলে চলে না, তাঁহারা পর্য্যন্ত রায়বাহাদুর হইতেছেন। /৮/

গবর্ণর সাহেবেরা, মধ্যে বৎসরের অধিকাংশ কাল সিমলার পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেন, শুনিয়াছি বিচক্ষণ লর্ড নর্থব্রুক সে নিয়মের অন্তথা করিয়াছেন।

খৃষ্টীয়ান হইয়া হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস হইতেছে দেখিয়া আমড়াতলার শিবচন্দ্র মল্লিক, প্রায়শ্চিত্তবিধান দ্বারা তাহাদিগকে পুনশ্চ হিন্দুসমাজভুক্ত করণার্থে শাস্ত্রের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রাজনারায়ণ মিত্র নামক একব্যক্তি, কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় সপ্রমাণ হেতু শাস্ত্রের পোষকতা সংগ্রহ করিয়াছেন। স্নুবর্ণ বণিকেরা মধ্যে বৈশ্যবর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রবল হইয়া ক্রমশঃ ধর্ম্মশাস্ত্র অপ্রচলিত হইতেছে। এক্ষণে জাতান্তর হইলে পৈতৃক বিষয়, কুলটা হইলে স্বামীর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নীলকরের অত্যাচার, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যত্নে গ্রাণ্ট সাহেব অনেক দমন করিয়া আসিয়াছেন। সেইহেতু আপনার প্রতিমূর্ত্তিপটের পার্শ্বে, তাঁহার প্রতিরূপ টাউনহল গৃহে লম্বমান আছে। সংপ্রতি যশোহরের স্তায়ানুগত মেজিষ্ট্রেট, স্মীথ সাহেব, এক পেয়াদাকে যথোচিত প্রহার করা অপরাধে, এক নীলকর শ্বেত পুরুষকে কারাবরোধ দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অপক্ষপাতিতার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে।

ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড মহাভারত পুস্তক, বহুব্যয় করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে বঙ্গভাষা অতি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

বিলাত হইতে নানা প্রকার পাড়্দার বস্ত্র আনীত হইয়া সিম্লে, শান্তিপুর ও লালবাগানের তন্তুবায়দিগের মুখমণ্ডল মলিন করিয়াছে। /৯/ যাত্রার পরিবর্ত্তে নাটক অভিনয় হইতেছে। হোমীয়প্যাথ, ডাক্তারেরা, বে-মালুম গোছের ঔষধ দিয়া মহত্ মহত্ রোগের শান্তি করিতেছেন।

তারিণীচরণ বসু, এবং দুর্গাচরণ লাহা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন।

লাহাবাবু বাঙ্গালার বিদ্যোন্নতির নিমিত্ত পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়াছেন।

পাথুরিয়াঘাটার খেলচ্চন্দ্র ঘোষের ভবনে একটী সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইয়াছে; তাহার উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট হইবার আশা ছিল, কিন্তু সভ্য মহাশয়েরা ধর্ম্ম বিষয়ের আন্দোলন ব্যতীত, অন্যবিধ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রম অতিবাহিত করিলে, আর কাহারও গবর্ণমেন্টের কার্য্যে থাকিবার বিধি নাই। দুর্ভাগ্য কেরাণীগণের বেতন সংপ্রতি বৃদ্ধি হইয়া, কেহ কেহ সাত আটশত টাকা পর্য্যন্ত মাসিক পাইতেছেন। মাতলায় নগর সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে শ্বেতপুরুষেরা যত্ন পাইয়া সে দিকে রেল চালাইয়াছেন। কিন্তু তথায় নগর হওয়া দূরে থাকুক, রামগতি মুখোপাধ্যায় উহার কার্য্যাধ্যক্ষ না হইলে, এতদিনে সেই রেল অন্ত লাভ করিত।

পর্ব্বোপলক্ষে কর্ম্মচারিদিগের বিদায় কাল সংক্ষেপ হইয়া গিয়াছে।

ভয়ানক দুর্ঘটনার বিবরণ কি কহিব, ১৮৪৭ খৃঃ অব্দের শিখ যুদ্ধে ও ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাই বিদ্রোহে পশ্চিমাঞ্চলে হৃদয়বিদীর্ণকর হত্যাকার্য্য ও অশেষবিধ অত্যাচার ঘটিয়াছে। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে জনৈক নৃশংস যবন জষ্টিস নর্ম্যানকে ছুরিকাঘাতে কলিকাতায় হত্যা করিয়াছে। অপর একজন, লর্ড মেও সাহেবকে ছুরিকাঘাতে পোর্টব্লেয়ারে নিধন করিয়াছে।

এক্ষণে ভারতরাজ্য কোম্পানি বাহাদুরের নাই, তাহা শ্রীমতী মহারাণীর নিজস্ব হইয়াছে।/১০/

সুবর্ণবণিকদিগের প্রথা কায়স্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়াতে, কন্যাদান-উপলক্ষে, জামাতাকে প্রায় যথাসর্ব্বস্ব দিবার রীতি হইয়াছে, আবার পাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস থাকিলে নিস্তার নাই।

গবর্ণমেণ্ট আফিসের ব্যয় সংক্ষেপ হওয়াতে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী কর্ম্মচারী পদচ্যুত হইয়াছেন এবং সামান্য কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত অনেক ইংরাজ লোক অধিক বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশে ধর্ম্মবল যাহা আছে, ধর্ম্ম যেরূপে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা কথঞ্চিৎ বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির মধ্যেই আছে।

মোট বহিয়া যাওয়া ভদ্রলোকের মধ্যে লজ্জাকর কার্য্য; ইদানীং রেলওয়ে ব্যাগ নামক একপ্রকার বিলাতীয় সভ্য মোটের সৃষ্টি হইয়াছে; কোন ভদ্রলোক ঐ মোট বহনে মতান্তর করেন না।

এক্ষণে আত্মহত্যার নিতান্ত আধিক্য হইয়াছে। ফলতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্ম গ্রন্থির শৈথিল্য হওয়া প্রযুক্ত ঐরূপ ঘটিতেছে।

এক্ষণে অনেক পিতা মাতা চাকরের জবানি অর্থাৎ দাস দাসীর ন্যায় স্বীয় স্বীয় পুত্রদিগকে বড়বাবু, মেজোবাবু, সেজোবাবু, শব্দে সম্বোধন করিয়া, সভ্যতার চূড়ান্ত দেখাইতেছেন। এবং পুত্রেরা পিতাকে পিতা না বলিয়া প্রায় কর্ত্তা বলিয়া থাকেন।

ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব পূর্ব্ববৎ আছে। মহাশয়, ধর্ম্মাবতার বলিয়া সম্বোধন করিলে ইঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকেন।

স্বস্ত্যয়নের ব্রাহ্মণ, ধোবা, নাপিত, কর্ম্মকার, সূত্রধর, মোদক এবং আপামর সকল জাতি, অধুনা চাকরী বৃত্তি অর্থাৎ কেরাণীগিরী ও মুহুরীগিরী প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কায়স্থের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। মোদক কেরাণী হইয়া, উত্তরকালে সন্দেশ বিস্বাদু করণের উপক্রম করিয়াছে। কৃষকেরা, কেরাণী কর্ম্মচারী হইয়া, উপাদেয় ফল শস্য উৎপাদনের হানি জন্মাইতেছে; পরে যে খাদ্য দ্রব্যের দশা কি হইবে /১১/ বলা যায় না। দেশীয় অস্ত্র আর পূর্ব্ববৎ তীক্ষ্ণ হয় না। হইবে কেন? কর্ম্মকারেরা যে কেরাণী ব্যবসায় ধরিয়াছেন। স্বজাতীয় ব্যবসায় আর তাহাদিগের পূর্ব্ববৎ যত্ন নাই।

প্রধান প্রধান পল্লীগ্রাম, টাউন নাম লাভ করিয়াছে। তথায় এক এক মিউনিসিপাল কমিটী স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় সেই সকল কমিটীর মেম্বর-দিগের অনেকেই দেশবাসীর উপর প্রভুত্ব প্রকাশার্থে বিশেষ তৎপর, সুতরাং তাঁহারা সকলের অপ্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের লোকের প্রিয় হইয়া কার্য্য করা পক্ষে কি উৎকট শপথ আছে তাহা কেহ জ্ঞাত নহেন।

অধুনা মহেন্দ্র, উপেন্দ্র, যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, নগেন্দ্র, এই কয়েকটী নাম দ্বারা প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা চলিতেছে।

এক্ষণে বঙ্গদেশের যে বাটীতে যে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তথায় সকলেই কর্ত্তা, অ-কর্ত্তা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

আর এক সম্প্রদায়ের অলৌকিক আচরণের কথা শুনিলে, যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইবেন। তাঁহারা পিতা মাতার জীবিতাবস্থায় তাঁহাদিগকে যথাসময়ে অন্নাবরণ প্রদান করেন না; আবার সেই পিতা মাতার জীবনান্তে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আপনার যশোগৌরব বিস্তার লালসায়, কত

শত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন ; হায় ! তাহার শতাংশের একাংশ দিলে তাঁহারা জীবদ্দশায়, সময়ে অন্নবস্ত্র পাইতে পারিতেন।

গবর্ণমেন্ট লেভিতে ইদানী অসংখ্য ব্যক্তির নাম সংগৃহীত হইয়াছে ; লেভি স্থানে তাঁহাদিগের কিরূপ সম্মান তাহা তাঁহারাই জানেন।

ইংরাজীর প্রাতুর্ভাব হইয়া বঙ্গীয় পুরুষেরা প্রায় সকলেই স্বজাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কেবল যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছেন এমন নহে, ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ প্রাচীনদিগকেও ইংরাজী ভাব, /১২/ সংক্রামক রোগের ন্যায় আক্রমণ করিয়াছে এবং তাঁহাদিগেরও হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সকলে বলেন, বোধ হয়, কালে ঐরূপ থাকিবে না। কেননা, ইংরাজদিগের অনুকরণ করিয়া বঙ্গবাসীরা যে যে কার্য্য প্রথম প্রথম সযত্নে অবলম্বন করিতে ব্যগ্র হয়েন, কিছুদিন পরে ব্যগ্রতার পরিবর্ত্তে তৎপ্রতি তাঁহাদিগের বিলক্ষণ দ্বেষ জন্মায়। মহাত্মা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের প্রদর্শিত খৃষ্টধর্ম্ম, প্রথম প্রথম কত বঙ্গযুবা অবলম্বন করিয়াছিলেন ও অবলম্বন করিতে উৎসাহী ছিলেন। এক্ষণে আর বাঙ্গালিরা খৃষ্টধর্ম্মের নামও মুখে আনেন না। ইংরাজ সাধারণেই আপনাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া ঘোষণা করিতেন, ইংরাজ মাত্রেই সত্যবাদী বলিয়া প্রথম প্রথম বাঙ্গালিদের হৃৎপ্রত্যয় হইয়াছিল ; কিছু দিন পরে তাহা আবার তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজদিগের পরিচ্ছদ, নেত্ররঞ্জন বলিয়া তাঁহারা প্রচার করায় অনেক ব্যক্তি প্রথম প্রথম তাহা ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা বাঙ্গালির পরিধেয় কিনা এই লইয়া অনেকে বিচার করিতেছেন। ইংরাজের খাদ্য উৎকৃষ্ট ভাবিয়া অনেক বাঙ্গালি প্রথম প্রথম তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; অধুনা তাহা পীড়াদায়ক ও দেহনাশক বলিয়া অনেকের প্রতীতি হইয়াছে। ইংরাজদিগের সভ্যতাকে, বাঙ্গালিরা চূড়ান্ত সভ্যতা বলিয়া প্রথম প্রথম মানিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সভ্যতাকে তাঁহারা অনেকে সভ্যতা বলিয়া মানিতেছেন না। ইংরাজির প্রাচুর্ভাব হইলে, প্রথম প্রথম ইংরাজী শিক্ষিতেরা, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে লঘু ভোজন, স্বর্ণকবচ ও ঔষধ ধারণ দ্বারা রোগ মুক্ত হয়, শুনিলে তাচ্ছিল্য ও উপহাস করিতেন, এক্ষণে আর সেরূপ করেন না। প্রথম প্রথম তাঁহারা পুরাণে ব্যোমযান বাষ্পযান ইত্যাদির বিবরণ শুনিয়া উপহাস করিতেন, এক্ষণে বেলুন ও রেলওয়ে শকট চালনা দেখিয়া, সেই পুরাণোক্ত বিবরণের প্রতি /১৩/ উপহাস করেন না। গোল্‌ডষ্টকর্‌, ভট্ট মোক্ষমূলর ও

জর্ম্মন দেশীয় পণ্ডিতেরা যথেষ্ট গৌরব না করিলে কিম্বা সংস্কৃত পাঠ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ না হইলে বঙ্গ দেশের সংস্কৃত শাস্ত্রের আরও অধঃপতন হইত, এবং তাহাকে অসার ভাবিয়া, ইংরাজী শিক্ষিতেরা নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইতেন।

এক্ষণকার পুত্র, বিবেচনা করেন যে, পিতা তাঁহার প্রতি শত সহস্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য আছেন, কিন্তু পুত্র পিতার প্রতি কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য নহেন। আর আর সমাচার পরে নিবেদন করিব। সংপ্রতি কিশোরী-চাঁদের আত্মার কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। শুনিয়া প্রিন্স কহিলেন, ভালই ত, বলুন।

উন্নতি

মৃত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের আত্মার উক্তি।

বঙ্গের আধুনিক উন্নতি সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণাজ্ঞা হয়। তরুণবয়স্কদিগের অনেক সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে। সেকালের লোকের ন্যায় ইহাঁরা সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত, ও বিজাতীয় কেশ মুণ্ডন করিয়া নিরন্তর অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ করেন না। প্রাচীনদিগের অপেক্ষা স্বদেশের উন্নতি সাধনপক্ষে ইহাঁদিগের কথঞ্চিৎ প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছে। ইহাঁরা প্রাচীনদিগের ন্যায় নীচ লোকের সহিত আলাপ ও /১৪/ বন্ধুতা করিতে চাহেন না। ইহাঁরা প্রায় অর্দ্ধেকে পুরাতন প্রথা অনুসারে উৎকোচ গ্রহণ করেন না। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়া সাধারণের মনের মালিন্য বিনষ্ট করিয়াছে; অন্তঃপুরের ইতরভাষা অন্তর্হিত হইয়াছে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস হইয়াছে; কল্পিতভয়ে নবীনা রমণীরা প্রাচীনাদিগের ন্যায় অভিভূত হয়েন না। নানা দেশের পুরাবৃত্ত, স্থানীয় বিবরণ, বিদেশীয়দিগের স্বভাব ও ব্যবহার ইহাঁরা অনেক অবগত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের বুদ্ধির জড়তার হ্রাস হইয়াছে।

পূর্ব্বে সমস্ত বিষয়ী লোকের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম ছিল; সেই কালের মধ্যে যে জ্ঞান জন্মিত, তাহাই চূড়ান্ত; পরে পাঠ দ্বারা সে জ্ঞানকে উন্নত করার রীতি ছিল না। অধুনা ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তানুসারে দেশীয় লোকেরা জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পাঠ দ্বারা জ্ঞানোন্নতি করিয়া থাকেন। লেখা পড়ার আলোচনা এত প্রবল হইয়াছে যে, যে কেহ হউন, কলিকাতার কোন পল্লীতে স্কুল স্থাপনা করিয়া সেই দিন কিম্বা দিনান্তরে অন্যূন দেড় শত ছাত্র পাইতেছেন। রাজ-সাহায্যে স্বদেশ বিদেশ জলপথে ও প্রান্তরে অশঙ্কিত-চিত্তে সকলে পরিভ্রমণ করিতে পারে। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক, তাহার ধর্ম্মকার্য্যে ধর্ম্মান্তরীয় লোক, বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। প্রবল ব্যক্তি, দুর্ব্বলের প্রতি যথেচ্ছা ক্রমে ক্ষমতা প্রকাশিতে পারেন না।

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, রাজকর্ম্মচারীরা অশেষবিধ উপায় দ্বারা তাহা নিবারণার্থে সর্ব্বপ্রকার আনুকূল্য করিয়া থাকেন। এ কার্য্যটি দ্বারা তাঁহাদিগের লক্ষ লক্ষ দোষ মার্জ্জনা হইতে পারে।

চিকিৎসালয় বিদ্যালয় সংস্থাপন দ্বারা রাজপুরুষেরা যথেষ্ট প্রজাবাৎসল্য জানাইতেছেন। মহৎ মহৎ ইংরাজ ও বাঙ্গালি উদ্যোগ /১৫/ ও আনুকূল্যদ্বারা

বিলুপ্ত প্রায় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র ও তাহার অনুবাদ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ভারতভূমির কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিতেছেন এবং অনেক বৎসরাবধি ভারতের অন্তর্গত বঙ্গভূমি হিন্দুস্থান প্রভৃতির দুর্গমস্থানে হিন্দু ও যবনদিগের স্থাপিত যে সমস্ত কীর্ত্তির অবশিষ্ট ভাগ অপ্রকাশিত ছিল, তাহা আবিষ্কার দ্বারা জনসমাজের পরমোপকার করিতেছেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে যে প্রকার গুণ ও বিদ্যার বিচার ছিল, মধ্যে তাহা ছিল না; যিনি যাহা জানিতেন, তাহার কিছুই প্রকাশ পাইত না। তাহা নিবিড় অরণ্যের আভ্যন্তরিক-সদ্গন্ধ-পুষ্পরাজির ন্যায় অনাঘ্রাত ও বিলীন হইত। এক্ষণে গুণের বিচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় সকলেরই অজ্ঞাতবিবরণ অবগত হইবার পিপাসা বলবতী হইয়াছে; কৌলীন্যের বল ক্ষীণ হইয়াছে. বহুবিবাহ প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে, রাজস্ব আদায়ের নিতান্ত জঘন্য হপ্তমের মোকর্দ্দমা চলিত নাই।

অতঃপর তর্কবাগীশ মহাশয়ের আত্মা কোন বিষয় বলিতে ইচ্ছা করেন। শুনিয়া প্রিন্স্ কহিলেন, তাহা শ্রবণার্থে আমরা সকলেই প্রার্থনা করি।/১৬/

লেখক

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আত্মার উক্তি।

উঃ আজকাল পঙ্গপালের ন্যায়, অসংখ্য লেখক, নগর পল্লী, প্রভৃতি যথায় তথায় গ্রন্থ লিখিয়া স্তূপাকার করিতেছেন। ইহাঁদিগকে কবি-মনিউমেণ্ট, নাটক-লাইটহাউস, গদ্যস্তম্ভ, পদ্য-পিরামিড্ বলিলেও যথেষ্ট হয় না। ইহাঁদিগের কবিত্ব-আলোকের আশ্রয়ে পাঠকেরা জ্ঞানরত্ন লাভ করিতেছেন। দুই একটী ব্যতীত সকল সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা সর্ব্বজ্ঞ, (সব জান্তা), সকলেই কবিত্বরস, কাব্য অলঙ্কারের ভাব, আইনের তর্ক, গ্রন্থ সমালোচনা কার্য্যে অভ্রান্ত পরিপক। কতকগুলি লেখক বঙ্গ সাধুভাষার যেন যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এই বিবেচনাতেই নীচ ভাষার উন্নতি কল্পে শশব্যস্ত আছেন। অতএব নীচ ও বিকলাঙ্গ ভাষা প্রয়োগদ্বারা নাটকাদি রচনাতে যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। জানি না সেই লজ্জাকর নীচ ও বিকলাঙ্গ ভাষার প্রতি যত্ন জানাইয়া স্বদেশীয় লোকের নিকট ঘৃণাস্পদ হইবার নিমিত্ত, তাঁহারা এত উৎসাহশীল কেন ? ঐ সকল ভাষা যেন কস্মিন্‌কালে শ্রবণ করিতে না হয়, মহোদয় ! সেই বর প্রদান করুন। যেমন কর্দ্দমাক্ত নীররাশিসমন্বিতা নদী, স্বচ্ছ স্রোতস্বতীজলে বিমিশ্রিত হইয়া তাহা পঙ্কিল করে, সংপ্রতি সেইরূপ নীচজাতি ও উৎকৃষ্ট জাতিতে বিমিশ্রিত হইয়া শ্রেষ্ঠকে অপকৃষ্ট করিতেছে ও নীচ বিকলাঙ্গ ভাষা, সাধু বঙ্গভাষায় মিশ্রিত হইয়া, তাহা কিম্ভূতকিমাকার করিতেছে। ইহাঁরা বলেন সাধু ভাষায় মনের সকল ভাব প্রকাশ পায় না, পায় কি না, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের পুস্তক /১৭/ মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে জানিতে পারেন ; তাঁহারা সকল ভাবই সাধু ভাষায় সুচারু রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আধুনিক ইতরভাষা লেখকদিগের প্রসঙ্গকালে একটী সাদৃশ্য মনে হইল। কতকগুলি বিদ্যাশূন্য ব্রাহ্মণ, রাঢ়দেশ হইতে কলিকাতার দানশীল ব্যক্তির ভবনে, দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে বার্ষিক বৃত্তি সংস্থাপন করিতে আসিয়া, পরস্পর পরস্পরকে বিদ্যালঙ্কার, তর্কালঙ্কার, শিরোমণি, বিদ্যানিধি, ইত্যাদি শ্রদ্ধাব্যঞ্জক উপাধি প্রদান করিয়া অধ্যাপকের ভাবে পরস্পর পরস্পরের অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্যের প্রশংসা দ্বারা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করেন ; সেই প্রকার ইতর-ভাষা লেখকেরা আপনাআপনির মধ্যে একজন অন্যজনকে কবিকুলতিলক, কবি শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি উপাধি প্রদানের বিনিময়ে আপনার সুবিখ্যাত উপাধি সংগ্রহ করিতেছেন। কোন কোন

গৌরবাকাঙ্ক্ষী বাবুরা লেখা্ পড়া শিখিতে অবকাশ পান নাই, তাঁহারা এক্ষণে গ্রন্থকর্ত্তা হইতে লালায়িত, কোন সভায় একটী প্রবন্ধ পাঠের নিমিত্ত ব্যগ্র। শুনিতে পাই, যন্ত্রাধ্যক্ষ ও কোন কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদক দ্বারা তাহা লেখাইয়া, স্বরচিত আরোপিয়া কথঞ্চিৎ গৌরব লাভের চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের এতদ্রূপ কার্য্যে কেহ প্রত্যয় করেন না, এতদ্রূপ প্রত্যাশাও তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অন্যায়; যেমন তৃণপত্র ভক্ষণ না করিয়া দুই চারি সের দুগ্ধ দেওয়া গাভীর পক্ষে অসাধ্য; অধ্যয়ন না করিয়া পুস্তকাদি লেখাও সেই রূপ অসাধ্য। আবার কোন কোন সংস্কৃত লেখকের কার্য্য দেখিলে মনে অতিশয় দুঃখ জন্মে। তাঁহারা অভিনব অভিধান ও ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়া অনধিকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে প্রশংসা পত্র সংগ্রহ করেন। বম্‌উইচ্, লং প্রভৃতি তত্তৎ পুস্তকের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। ঐ সকল প্রশংসাপত্র দাতাদিগের উৎকট প্রশ্রয়; উল্লিখিত রূপ পুস্তকের গুণ দোষ বিচার পক্ষে, তাঁহাদিগের কি অধিকার আছে, সেই /১৮ সকল প্রশংসাপত্র কতদূর বলবৎ, তাহা একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখুন।

পরন্তু সকল লেখকই সমালোচন লিপি প্রকাশার্থ প্রস্তুত, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা লেখকের মধ্যে কেবল অল্প সংখ্যক লেখকের গ্রন্থ সমালোচন করিবার শক্তি আছে। যেহেতু উক্ত মহাশয়গণের যে যে পুস্তক পাঠ করিলে সমালোচনার ব্যুৎপত্তি জন্মে, সে সকল বিলক্ষণ রূপে পাঠ করা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অসার অর্ব্বাচীন, যে কেহ হউন একখান পুস্তক দেখিবামাত্র স্বীয় রুচির উপর নির্ভর করিয়া সমালোচন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সমালোচন স্বীয় রুচির উপর নির্ভর করিবার কার্য্য নহে। বীভৎস রুচির অনুমোদন করিতে না পারিলে যে সুলেখক হইবে না এমন নহে। তাঁহারা সমালোচন কার্য্যের কিছুমাত্র না জানিয়া সকল পুস্তকের রচনা খণ্ডন করেন। কোন সমালোচক বাবুর আপন লিখিত পুস্তকে কর্ত্তা ক্রিয়া প্রকাশ অপ্রকাশ রাখার স্থান বিচার নাই। কি মদগর্ব্বের প্রভাব! তিনি আশা করেন, তাঁহার ভাষাকে আদর্শ করিয়া, লোকে এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করুক। আ মরি মরি! তাঁহার কি অপূর্ব্ব-পদ-বিন্যাস! পড়িতে পড়িতে ভাবের প্রভাবে আষাঢ়ীয় আনারসের ন্যায় আমাদের অঙ্গ সকণ্টক হইয়া উঠে।

অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভুক্ পুস্তক পাঠকেরা, পুস্তক পাইলেই একাদিক্রমে সর্ব্ব প্রকার পুস্তক পাঠ করেন ও প্রায় সকল পুস্তকের প্রশংসা করেন।

লেখকেরা তাঁহাদিগের প্রশংসায় প্রশ্রয় পান। শুনিলাম, লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কোন কোন বাঙ্গালা লেখককে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতেও হাস্তের উদ্রেক হয়। বাঙ্গালা ভাষা না জানিয়া /১৯/ আবার সে প্রশংসাকে কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক অনুমোদন করিয়াছেন, করিলে করিতে পারেন ; কেন না, সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা সব্‌জান্তা, সেই অনুসারেই তিনি ঐ প্রশংসায় অনুমোদন করিয়া থাকিবেন ; কি আশ্চর্য্য ! সেই প্রশংসা অবলম্বন করিয়া ঐ লেখকেরা দম্ভের আয়তন বৃদ্ধি করেন, আর তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের লেখা এক্ষণে অনেকে অনুকরণ করিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে ; যে ব্যক্তি লিখিতে না জানে, সে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেই তাঁহাদিগের তুল্য লেখক হইয়া উঠে।

সুরলোকে এই সময় একবার শুভ-সূচক বীণাধ্বনি হইল, সকলে সচকিত হইলেন এবং দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, এক শুক্লাম্বরধারী সুপ্রসন্ন-ভাব-সম্পন্ন শান্তমূর্ত্তি পূর্ব্বদিক হইতে উদয় হইতেছেন। তর্কবাগীশ কহিলেন,—আপনারা দেখুন ; আমাদিগের পরম প্রীতিভাজন চন্দ্রমোহন তর্কসিদ্ধান্তের আত্মা আবির্ভূত হইতেছেন। সকলে ইহাঁর নিকট বঙ্গদেশের অভিনব বিচিত্র ঘটনা শুনিবার যত্ন করুন। ইনি সম্প্রতি বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে আসিয়াছেন। আমার অপেক্ষা ইহাঁর অধিক অভিনব বৃত্তান্ত জানা আছে। এই কথার অবসান হইতে না হইতেই চন্দ্রমোহনের আত্মা সেই কল্পতরুতলে উপস্থিত হইয়া সকলকে বিনীতবাক্যে কুশল জিজ্ঞাসিয়া হেমময় দিব্যাসনে উপবেশন করিলেন। পরে প্রিন্স্‌ ও অন্যান্য সকলেই যথেষ্ট যত্ন সহকারে আধুনিক লেখকদিগের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ তাঁহার নিকট শুনিবার প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন,—সে অতীব বিচিত্র বিবরণ আপনারা শ্রবণ করুন। /২০/

চন্দ্রমোহনের আত্মার উক্তি।

আমি এক্ষণকার ইতর ভাষা লেখকদিগের লেখার দোষ কোন বিজ্ঞতম লোকের নিকট উত্থাপন করিলে তিনি আমাকে কহিলেন, আপনি কিছু মনে করিবেন না। উক্ত লেখক বেচারিরা সংপ্রতি কপ্‌চাইতে শিখিতেছেন, পরে বুলি পদাবলী ধরিবেন ; মধ্যে মধ্যে চঞ্চু ব্যাদান করিয়া ঠোক্‌রাইতে আসিবেন, তাহাতে আপনারা ভীত হইবেন না। ওটী উহাঁদিগের জাতিধর্ম্ম।

লেখার অভ্যাস করা হয় নাই, অথচ বাবুয়া বালিশে শিরোদেশ সংলগ্ন করিয়া মনে করেন, "আমি বেস লিখিতে পারিব, আমার অনেকগুলি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করা হইয়াছে, অতএব বাঙ্গালা লিখিব ইহার আর আশ্চর্য্য কি? উপকরণ অপ্রতুল না থাকিলে কোন একটী বস্তু নির্ম্মাণ করিবার বাধা কি আছে।" কিন্তু কি পরিমাণে কোন্ দ্রব্য কত দিলে কি প্রক্রিয়াতে একটী স্বাস্থ্যকর ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহা না জানিয়া, যেমন কেবল রাশিরাশি পরিমাণে পারদ, স্বর্ণ, মুক্তা ও লৌহ, সংমিলিত করিলে স্বাস্থ্যকর ঔষধের পরিবর্ত্তে এক প্রাণান্তকর বিষময় পদার্থ হইয়া উঠে ; যাহা সেবন করিলে দেহ পুষ্ট না হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ প্রায় ইংরাজীশিক্ষিতেরা অনেকে অপরিমেয় বিজাতীয় উপকরণে কিম্ভূতকিমাকার পুস্তক সকল প্রস্তুত করিতেছেন। তাহা পাঠ করিয়া অভিনব বিদ্যার্থীদিগের যথেষ্ট কুসংস্কার জন্মিতেছে।

যে ইংরাজী পুস্তককে আদর্শ করিয়া, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখেন, লেখার পদ্ধতি না জানাতে, তাঁহাদিগের অনুবাদে কোন রস থাকে না। যেমন স্বপ্নযোগে মিষ্টান্নাদি ভোজন করিলে তাহার কোন আস্বাদ পাওয়া যায় না, সেইরূপ ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ বা সঙ্কলনকারীদিগের অনভ্যস্ত বাঙ্গালা লেখাতে কোন রসই লব্ধ হয় না।/২১/

কোন লেখকের দৃঢ় জ্ঞান আছে যে, "আমি বহুজন সংসর্গ নিবন্ধন বহুদর্শী হইয়াছি, অতএব আমি অতি উত্তম বাঙ্গালা যদিও অভ্যাস করি নাই, তথাচ ভাবগর্ভ পুস্তক লিখিতে পারি।" যাহা হউক, তাঁহার চিন্তা করা উচিত যে, তিনি ভদ্রলোকের সহিত অধিক কাল সহবাস করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহার প্রতি যে কার্য্যের ভার আছে, তাহাতে তাঁহাকে অধিক কাল অসংখ্য ইতর অভদ্রজনের সহিত বাস করিতে হয়। সেই ইতর সহবাস নিবন্ধন তাঁহার রুচি কলুষিত হইয়াছে এবং ইতরতর বিষয়ে তিনি বহুদর্শী হইয়াছেন, কেন না তিনি যখন যাহা লিখিতে যান, তখনই তাঁহার লেখনী হইতে ইতরভাবের উদ্ভাবন হইতে থাকে। দেখুন, সেই মহাত্মা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে একখানি অশ্লীল গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ হইয়া অশ্লীল গ্রন্থ, জ্যেষ্ঠ সহোদরকে উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই।[১]

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) গ্রন্থের উৎসর্গ: 'জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীচরণে এই গ্রন্থ অর্পণ করিলাম।'

লেখক স্কট ও লিটন প্রভৃতির ইংরাজী পুস্তক হইতে যাহা সঙ্কলন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আপনার বুদ্ধি ও আপনার কল্পনা যোজনা হয় নাই, তাহাই কথঞ্চিৎ ভাবুক লোকের শ্রোতব্য হইয়াছে।

উক্ত লেখকের একটী গুণ আছে, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তিনি আপনার গ্রন্থ সন্নিবেশিত ঘটনাবলী, এতদূর মনোরম করিতে পারেন, যে তাহা পিতামহীদেবীর উপকথার ন্যায়, শূন্যহৃদয় নির্ব্বোধের নিদ্রাকর্ষণ করিতে পারে।

তাঁহার রুচি ও উদাহরণ ঘৃণাজনক, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহার আসমানির পান-রস-নিষ্ঠীবন, বিদ্যাদিগ্‌গজের গলাধঃকরণ করান প্রভৃতি ঘৃণা উৎপাদক রসিকতা তাঁহার বীভৎস রুচির স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে।[১]

হিন্দু ও যবন জাতীয় নায়ক নায়িকা সংযোগ ব্যতীত, তিনি প্রায় /২২/ কোন গ্রন্থ রচনা করেন না। অনুভব হয়, তাঁহার ধারণা আছে, রাম খোদা একত্রিত না করিলে কোন পাঠকের চিত্তবিনোদন করা দুঃসাধ্য।

তাঁহার গ্রন্থ-পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ অতি কৌতুকাবহ; অন্যান্য লেখকের গ্রন্থ-পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ দ্বারা ঘটনার স্থূল আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থ পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ অদ্ভুত ও অলৌকিক, তদ্দ্বারা প্রস্তাবের আভাস কিছুই ভাসমান হয় না, কেবল সেই প্রস্তাবের যে কোন স্থানের দুই একটী কথা-মাত্র উদ্ধৃত করিয়া শিরোভূষণ স্থির করা হয়। যথা—"না"; "অবগুণ্ঠনবতী"; "দাসী চরণে" এতদ্দ্বারা কাহার সাধ্য প্রস্তাবের আভাস বুঝে বা মর্ম্মাবধারণ করে। ইত্যাদি রূপ শিরোভূষণের সহিত তন্তুবায়ের সঙ্কেত চিহ্নের (অর্থাৎ তাঁতির ঠারের) কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সে চিহ্ন দেখিয়া কিছুই স্থির করা যায় না। তন্তুবায় বস্ত্রে গ, স, ৭, ৫, ৩, ৪, দৃষ্টি মাত্রেই বলিয়া উঠিতে পারে, এ ধুতী-যোড়ার মূল্য পাঁচ টাকা সাড়ে দশ আনা; তদ্রূপ, "না"; "অবগুণ্ঠনবতী"; "দাসী চরণে" ইত্যাদি পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ[২] দ্বারা কেবল লেখকই সমস্ত বুঝিতে সক্ষম, অন্যে নহে। লেখকের অভিপ্রায় এইরূপ যে হলধর বলিলে দশ আইনের মোকদ্দমা বুঝাইবে। কেননা হলধর নামক কোন ব্যক্তি, উক্ত আইনের মোকদ্দমা কোন জেলা আদালতে উপস্থিত করিয়াছিল। "না"

১ দ্র. 'দুর্গেশনন্দিনী'

২ দ্র. 'বিষবৃক্ষ', ১৬; 'দুর্গেশনন্দিনী', ২/৪,১৬

উল্লেখ করিলে না—ঘটিত পরিচ্ছেদের সমুদয় মর্ম্ম বুদ্ধিবলে সংগ্রহ করিতে হইবে।

আবার তাঁহার রচনাতে কি উৎকট ভাব ও শব্দের প্রয়োগ আছে! তিনি সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য ব্যঞ্জক বর্ণনাতে সুগোল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সুগোল শব্দটী তাঁহার অতি প্রিয়, যেহেতু তিনি লিখিয়াছেন "সুগোল ললাট"[১], ললাট কি প্রকারে সুগোল হইতে পারে? মনে /২৩/ করুন যেন তাহা সুগোল হইল, হইলেই বা রমণীর দৃশ্য হইবে কেন? উক্ত সুগোল ললাট শব্দ লইয়া যখন আমি, একদিন আন্দোলন করিতেছি, তৎকালে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন; আমি তাঁহাকে উহার ভাবার্থ জিজ্ঞাসিলাম, তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমাকে কহিলেন, উহার ভাবার্থ অন্য কিছুই আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে না, তবে জান কি, লেখক ব্রাহ্মণের সন্তান, চিরকাল লুচি মোণ্ডা প্রভৃতি নানা প্রকার গোলাকার দ্রব্য ভোজন করিয়া আসিতেছেন, ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে গোলই উপাদেয়, গোলই সুদৃশ্য; এই হেতুই, তিনি সুগোল ললাট লিখিয়া থাকিবেন!

লেখক স্থানে স্থানে বারংবার লিখিয়াছেন, "নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল,"[২] নাসারন্ধ্র শূন্য স্থান, কি প্রকারে তাহার কাঁপা সম্ভব; তাহার ভাবার্থ এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই এবং আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কোন সুলেখক বা বিচক্ষণ ভাবুক, গোল ললাটের ভাবার্থের ন্যায় নাসারন্ধ্র কাঁপার ভাব সংলগ্ন করিতে সক্ষম হইতেছেন না।

ইঁহার রচনাতে অনেক স্থানে বিস্তৃতি দোষ; বিশেষতঃ রূপ বর্ণনায়, ভূরি ভূরি নিরর্থক বাগাড়ম্বর; পাঠে বিরক্তি বোধ হইতে থাকে; যেমন হাইকোর্টের অরিজিনেল সাইডের উকীলেরা ফলিও গণনানুসারে, অধিক খরচা পাইবার আশায় সামান্য সামান্য মোকদ্দমা সংক্রান্ত এক এক বৃহদাকার বৃফ্ প্রস্তুত করেন, লেখক অবিকল সেই বৃফের ন্যায়, সামান্য প্রস্তাব সকল, প্রশস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ঐ রূপ লেখাকে আলঙ্কারিকেরা, বিস্তৃতি দোষ বিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐ লেখক স্থানে স্থানে সর্ব্বদাই রমণীমূর্ত্তিতে বঙ্কিমগ্রীবা[৩] শব্দ দিয়াছেন।

১ দ্র. 'দুর্গেশনন্দিনী', ১/৭

২ দ্র. 'কপালকুণ্ডলা', ৩/৬

৩ দ্র. 'কপালকুণ্ডলা' ২/২, ৩/৬। 'বিষবৃক্ষ' ৩

লড়ায়ে কার্ত্তিকের মত, স্ত্রীলোকের বঙ্কিম গ্রীবা হইলে যেরূপ সুন্দর দেখায়, আপনারা তাহা অনুভব করিয়া লইবেন। /২৪/

আবার কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে "মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা"[১] লেখা হইয়াছে, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক, পীড়িতাবস্থায় কোন কোন ব্যক্তির নাসা আকুঞ্চন ও বিস্ফারণ হইতে দেখা যায় এবং তৎকালে মুখমণ্ডল কদাকার হয়; আর কেহ কেহ বলেন, কোন কোন জন্তুর ঐরূপ হইয়া থাকে। অতএব বোধ হয়, আকুঞ্চন ও বিস্ফারণ এই দুইটী শব্দ ব্যবহারের নিতান্ত ইচ্ছা হওয়াতে লেখক তাহা কষ্ট শ্রেষ্ঠে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন।

"জানালা জ্বলিতেছে,"[২] তদর্থে জানালা ভেদ করিয়া আলোক আসিতেছে, বুঝিতে হইবে।

"হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন"[৩], লেখা হইয়াছে। ইহাতে শব্দের অনুকরণ কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

"স্তিমিত প্রদীপে"[৪] এই শিরোভূষণের প্রস্তাব পড়িতে পড়িতে চিত্রপট বর্ণনার ঘটা দেখিয়া মনে হয়, যেন আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে যাইতে যাইতে এক এক পয়সা দিয়া পটলডাঙ্গার দীঘির ধারে সহর-বিল দেখিতেছি। প্রদর্শক ঘণ্টাবাদন করিয়া আমাদিগকে তাহা দেখাইতেছে। এস্থলে লেখক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসের আলেখ্য দর্শনের অনুকরণ করিতে গিয়া তদ্বিষয়ে সফল না হইয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।

উল্লিখিত লেখক রমণীমূর্ত্তি অলঙ্কৃতা করিতে গিয়া তাহার উরুদেশে মেখলা[৫] দিয়াছেন। আমরা নিতম্বে মেখলা সর্ব্বত্র দেখিয়াছি, উরুদেশে কোন রাজ্যে দেখি নাই। শুনিয়াছি, অতঃপর তিনি কর্ণে কণ্ঠহার ও গলদেশে বলয় পরাইয়া আবকারি মহল হইতে স্বর্ণ পদক পারিতোষিক লইবেন।

১ দ্র. 'মৃণালিনী', ২/৮

২ দ্র. 'বিষবৃক্ষ', ১৮

৩ দ্র. 'বিষবৃক্ষ', ১১

৪ দ্র. 'বিষবৃক্ষ', ৪৪

৫ দ্র. 'দুর্গেশনন্দিনী', ১/৭

জগৎসিংহ নামক একজন স্তম্ভিত নায়ক ও তিলোত্তমা নাম্নী একটী /২৫/ স্তম্ভিতা নায়িকাকে কি কার্য্য সাধনার্থে লেখক তাঁহার পুস্তকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষ কার্য্য কিছুই দেখা যায় না। আবার হেমচন্দ্র নামে নায়কের[১] উদ্ধত স্বভাব বর্ণনা করিয়া কি এক কুৎসিত ভাবের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

এই লেখকের মতের চমৎকারিতার কথা শ্রবণ করুন।—অপরের মত ন্যায্য বা অন্যায্য হউক, তিনি সেই মতের বিপরীত মতাবলম্বন করিবেনই। কিন্তু যে মত খণ্ডন করেন, তাহার সবিস্তার তিনি বিজ্ঞাত নহেন। তাঁহার ইত্যাকার মতভেদ দেখিলে, আমার এক যবনীর ব্যবস্থা সংগ্রহের কথা স্মরণ হয়।

এক যবনীর অন্ন কুক্কুরে উচ্ছিষ্ট করিয়াছিল। সেই উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করা উচিত, কি অনুচিত, তাহা নিগূঢ় জানিতে, সে তাহার স্বামীকে এক মৌলবীর নিকট পাঠায়। মৌলবী কোরাণের ব্যবস্থাকাণ্ড দৃষ্টি করিয়া তাহার বিধি অবিধি কিছু পাইল না। যবন আসিয়া তাহার বনিতাকে কহিল,—মৌলবী কুক্কুরের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ পক্ষে কিছুই ব্যবস্থা স্থির করিতে পারিলেন না। তাহাতে যবনী শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের নিকট উক্ত ব্যবস্থা জানিতে স্বামীকে পাঠাইলে, পণ্ডিত শাস্ত্র দৃষ্টে কহিলেন,—আমাদিগের শাস্ত্রে কুক্কুরের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যবনী পণ্ডিতের ব্যবস্থা স্বামীর নিকট শুনিয়া কহিলেন,—তবে এস আমরা কুক্কুরের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করি, কেন না, যাহা হিন্দুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ, তাহা আমাদিগের পক্ষে সিদ্ধ ও অবশ্য কর্ত্তব্য। উক্ত লেখকের সেইরূপ ধারণা। অন্য লেখকের রুচিতে যাহা সুরস, তাহা তিনি নীরস এবং যাহা বিরস তাহা নিতান্ত সুরস বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

উক্ত লেখকের ভাব-সন্দর্ভের বিষয় আর অধিক আন্দোলন করিলে তাঁহার আরও প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইবে। অতএব সংপ্রতি এই পর্য্যন্ত /২৬/ রহিল, কেবল তাঁহার পুস্তক বিক্রেতার প্রেরিত এই বিজ্ঞাপনটী পশ্চাতে প্রকাশ আবশ্যক।—

১ দ্র. 'মৃণালিনী'

বিজ্ঞাপন

যত টন পরিমাণ নিরর্থক সন্দর্ভের প্রয়োজন হয়, তাহা নভেল লেখকের লেখাতে প্রাপ্ত হইবে। যদ্যপি ইহা কাহারও সিপমেণ্ট করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তিনি জাহাজের ফ্রেট নিযুক্ত করিয়া তৌলদার, বস্তাবন্দ মার্কওয়ালা, ওজন সরকার ও গাধাবোট, চুঁচুড়ার পরপারে বঙ্গদর্শনের কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন। Terms cash on delivery.

আর এক জন পটলডাঙ্গার শিক্ষক[১] উপর্য্যুপরি চারি খান অসার, নীরস, কর্ণোৎপীড়ক নাটক রচনা করিয়াছেন। কোন ভাবজ্ঞ ব্যক্তিকে ঐ সমস্ত দেখাইলে উহা লোকসমাজে প্রকাশ করিতে তিনি অবশ্যই নিষেধ করিতেন এবং তাহা হইলে কলিকাতায় অত বাসার অপ্রতুল বা কাহার আশ্রমপীড়া হইত না। যেহেতু উক্ত পুস্তক চতুষ্টয় নিষ্কর্ম্মা মহাশয়েরা নগরের যে যে পল্লীতে পাঠ করেন, সেই সেই স্থানে ভদ্রলোকেরা বাস করিয়া তিষ্ঠিতে পারেন না। যেহেতু কাষ্ঠবিদারণের শব্দ, ময়দা পেষার ঘর্ঘরাণি, কাংসকারের কার্য্যালয়ের ঠন্ঠনানি অপেক্ষা উক্ত নাটকচতুষ্টয়ের ভাবশূন্য—নীরস শব্দাবলী পাঠ, শত সহস্রগুণে অসহনীয়। "বাছারে আমার" "পলো" "ও হ" "করওনা" ইত্যাদি অভিনব গ্রাম্যভাষা মহামহিম লেখকের, ভাব-ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

কোন লেখক এক খান স্বাস্থ্যরক্ষা পুস্তক[২] বহ্বায়াসে বিবিধ ইংরাজী পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার স্থূলে ভুল এই যে, বাঙ্গালা বৈদ্য শাস্ত্র হইতে তাহার কোন অংশ সঙ্কলন করা হয় নাই। বৈদ্যশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত হইলে তাহা ভারতীয় লোকের দেহ রক্ষার /২৭/ সম্যক্ উপযোগী হইত, উষ্ণপ্রধান দেশে কি কি নিয়মে দেহ রক্ষা হয় তাহা না জানাতে সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই লিখিতে পারেন নাই। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর

১ হরলাল রায়

২ খুব সম্ভবত, ভরতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'স্বাস্থ্য কৌমুদী, অর্থাৎ সর্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য স্বাস্থ্যবিষয়ক নূতনবিধ গ্রন্থ' (ঢাকা, ১৮৭২)। 'বঙ্গদর্শন' (পৌষ ১২৭৯, পৃ. ৪২৩-২৮) পত্রিকায় গ্রন্থটির সমালোচনা করা হয়।

করিয়া দুই একটা দেশীয় দ্রব্যের গুণ দোষ আরোপ করিয়া লিখিয়াছেন। ফলতঃ স্বাস্থ্য-রক্ষা লেখার যোগ্য পাত্র কবিরাজ ও ডাক্তর, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে লেখকদিগের মনে কি সর্ব্বজ্ঞতা জন্মিয়াছে; তাঁহারা সকলেই সকল বিষয় লিখিবার যোগ্য মনে করিয়া অনধিকার কার্য্যে হস্ত প্রসারণ করেন।

উজীর পুত্র[1] নামে তিন খণ্ড বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকের দুই এক স্থান পড়িতে পড়িতে উহাতে সামান্য ভাব ও ইতর শব্দের শ্রেণী দেখিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে নাই। বিশেষতঃ একজন নিষ্কর্ম্মা অথচ সারগ্রাহী ব্যক্তি আমাকে বলেন, আমি উহা পাঠ করিয়াছি কিন্তু আপনার সময় সঙ্কিপ্ত, উক্তরূপ গ্রন্থ আপনার পাঠ্য নহে। উহাতে যাহা আছে তাহা আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি। "মনে করুন যখন আপনার বয়ঃক্রম সাতবৎসর, মাতামহী শিয়রে বসিয়াছেন, কর্ণমূলে অল্প অল্প করাঘাত করিতেছেন, যাদু ঘুমাও বলিতেছেন ও প্রাচীন স্ত্রীলোকের ভাষায় নানা উপকথা কহিতেছেন; মনোনিবেশ করিয়া আপনি তাহা শুনিতেছেন, সেইরূপ প্রাচীন-স্ত্রী-ভাষাসম্বলিত, অকিঞ্চিৎকর-ভাবপূর্ণ এই উজীরপুত্রের উপকথা।"

ভূরি ভূরি অযৌক্তিকভাব ও নীচ উদাহরণপুঞ্জে পরিপূর্ণ—রাজবালা[2] নামক একখানি পুস্তক পাঠ করা হইয়াছে। উহার লেখককে অভিনব গন্ডস্তম্ভ বলা যাইতে পারে। উহাঁর নিকট সংপ্রতি আর কিছু উৎকৃষ্টরূপ লেখার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি পরেই বা কি উদ্গীরণ করেন তাহা তাঁহার চর্ব্বিত চর্ব্বনকালে কোন না কোন সময়ে কাহারও দৃষ্টি পথে পতিত হইবে। /২৮/

হায় কি বলিব! ইতরভাষা লেখকদিগের দৃষ্টান্তানুসারে এমন কি, কোন কোন কৃতী সন্তান পিতা মাতাকে পর্য্যন্ত যৎকুৎসিত অশ্লীল গ্রন্থ সকল উৎসর্গ করিতেছেন। সময়াভাবে অতি সামান্য রূপে অত্যল্প লেখকের লেখার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। সময়ান্তরে আধুনিক বিজাতীয় গদ্য পদ্য লেখকগণের লেখার তদাদি তদন্ত গোচর করিলে মহাশয় প্রবলতর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

১ ফকীরচন্দ্র বসু প্রণীত

২ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গ্রিয়ের্সনের উক্তি—

বঙ্গভূমিতে যথাশ্রুত ইতর বিকলাঙ্গ অনর্থক ভাব ও ভাষা প্রবল হইবার ইতিবৃত্তান্ত আপনারা অবগত নহেন। সুতরাং যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইতে পারেন। অতএব আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি শ্রবণ করুন।

এই উদ্যানের অনতিদূরে বাগ্‌দেবী সরস্বতীর নিবাসের উপবন; কিয়ৎকাল অতীত হইল, একদিন দিবসাবসানে ঐ উপবন হইতে মহাপ্রলয় কালের ন্যায় বিজাতীয় কোলাহল আসিয়া আমার কর্ণবিবর উৎখাত করিতে লাগিল। আমি ক্রমে ক্রমে সরস্বতীদেবীর আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য নীচ বিকলাঙ্গ বঙ্গভাষার শব্দবৃন্দ, কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রেণী-বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছে এবং সকলে কহিতেছে,—মাতঃ! সাধু কিম্বা নীচ-ভাষার শব্দ সকলই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা সকলই আপনার সন্তান, সকলই সমান স্নেহাস্পদ, সকলের সমান অধিকার হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদিগের তপস্যার কি বিড়ম্বনা! যে হেতু অনাদিকাল হইতেই আমরা নীচজাতির আশ্রয়ে দিনপাত করিতেছি; ভদ্রসমাজে আমাদিগের কোন স্বত্বাধিকার নাই; সেই দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অদ্য মাতৃ-সদনে আসিয়াছি, এবার সাধুসমাজে অধিকার না দেওয়াইলে, আমরা আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিব। /২৯/

বাগ্‌দেবী তাহাদিগের ক্ষোভে তাপিত হইয়া আদেশ করিলেন,—

তোমরা বঙ্গদেশে গমন কর,—অধুনা তথায় ভদ্রসমাজে অধিকার পাইবে।

দেবী এইরূপ আদেশ করিয়া আমার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন; কোলাহল নিরস্ত হইল। পরে শুনিলাম, তাহারা সরস্বতীর আদেশানুসারে ভদ্রসমাজের গ্রন্থে স্থান পাইবার অভিলাষে স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকাগারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইল,—মাতা সরস্বতী আপনার পুস্তকে আমাদিগের স্থান প্রাপ্তির জন্য পাঠাইলেন; আমরা ইতর ভাষা, কিন্তু তাঁহার সন্তান বলিয়া, সাধু ভাষার ন্যায় আমাদিগের সর্ব্বত্র স্বত্বাধিকার সমান আছে।

ঐ সমস্ত শব্দদিগের ইত্যাকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় সহাস্যে কহিলেন,—আমার পুস্তকে তোমাদিগের স্বত্বাধিকার নাই। তোমরা সরস্বতীর বংশোদ্ভব বটে, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত নামক পুত্রের সন্তান নহ;

সংস্কৃত হইতে যে সকল সাধু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সংস্কৃতের ঔরস পুত্র ;—তাহারাই আমার পুস্তকে স্থান পায়। তোমরা সংস্কৃতের ব্যভিচার দোষে উৎপন্ন হইয়াছ, এ কারণ এখানে স্থান পাইবে না। তবে যে দুই একটী ইতর শব্দকে আমার এ স্থানে দেখিতে পাইতেছ, ইহারা কেবল সাধু শব্দদিগের বহন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি সমস্ত নিবেদন করিব। তোমরা অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

অনন্তর দ্বারবান্ বলিয়া ডাকিতেই, ইতর শব্দেরা ভয়াশ্বাসে প্রস্থান করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভায় গমন করিল এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তদ্দৃষ্টে অযোধ্যানাথ পাকড়াসী সরোষে তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে তথা হইতে বিমুখ হইয়া তাহারা কোর্ট /৩০/ অফ ওয়ার্ডসের রাজেন্দ্র বাবুর[১] সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনিও বিদায় দিলেন। তথা হইতে বিনির্গত হওত, তাহারা কালীপ্রসন্ন সিংহের পুরাণসংগ্রহ পুস্তকালয়ে উপস্থিত হইয়া মহাভারতে প্রবেশার্থ প্রস্তাব করিল। উক্ত প্রস্তাবে সিংহ সিংহের প্রতাপ ধারণ পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জনে কলিকাতানগর কম্পিত করিয়া কহিলেন,—কি প্রশ্রয়! তোমরা পুরাণসংগ্রহে স্থান পাইতে আসিয়াছ? এবং সরস্বতী তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, বলিতেছ? আমি তোমাদিগের সরস্বতীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখি না; তাঁহাকে ভয় কি? আমার চাতুরী তোমরা কি জানিবে? আমি কম পাত্র নহি! জান না এখনই তোমাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিদায় দিব। অন্যে পরে কা-কথা! ঐ দেখ ভট্টাচার্য্যদিগের অসংখ্য শিরঃশিখা-শ্রেণীতে আমার গৃহের প্রাচীর সুসজ্জিত হইয়াছে। "শিখাই-ত বটে-হে!" এই বলিয়া ইতর শব্দেরা ভয়াকুল হইয়া পলায়নের উপক্রম করিতেছে, তবু সিংহের ইঙ্গিতে হেমচন্দ্র[২], কৃষ্ণধন[৩], অভয়াচরণ[৪], প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণ স-ক্রোধে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ইতর শব্দদিগকে পুস্তকালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

অনন্তর কিছুকাল পরে অসাধু শব্দেরা আর একটী স্থান পরীক্ষা করিতে মির্জ্জাপুরাভিমুখে বাল্মীকি যন্ত্রের সন্নিকটে উপনীত হইল, যন্ত্রালয়ে সহসা

১ রাজেন্দ্রলাল মিত্র

২ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য

৩ কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন

৪ অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার

সকলের প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করিল না, যে হেতু সর্ব্বত্র তাহারা হতাদর হইয়াছিল। কেবল একটীমাত্র ইতর শব্দ, সে স্থানের অধ্যক্ষ,—কে, দেখিতে অগ্রসর হইয়া, যন্ত্রালয়ের বাতায়নের একদেশ দিয়া হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে দেখিতে পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুত পদচালনে, প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, ভাই সকল! প্রস্থান কর; প্রস্থান কর; আর কাজ নাই, এস্থানে ক্ষণেক অবস্থান করাও দুঃসাহসের কার্য্য; কারণ এখানে সেই স্থূলাঙ্গ যমসম পুরুষ আছেন /৩১/, যাঁহার বিশেষ আক্রোশে আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

অনন্তর সকলে পলায়ন পরায়ণ হইয়া পুনশ্চ সরস্বতী দেবীর নিকটে গমন করিতে হইবে স্থির করিল, কিন্তু সংপ্রতি কেহ কেহ বেলিয়াঘাটায়, কেহ কেহ নারিকেলডাঙ্গায়, কেহ কেহ পারমিট্ ঘাটে, নিজ নিজ পুরাতন বাসায় গমন করিল।

মর্ত্ত্যলোকে বিকলাঙ্গ অসাধু শব্দদিগের ঈদৃশ অপমান ঘটিয়াছে, অন্তর্যামিনী বাগ্‌দেবী জানিতে পারিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব[১] ও বঙ্গদর্শন-সম্পাদক, নাটক রচয়িতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পুস্তক লেখক, গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক, জেলা আদালতের উকীল ও আম্‌লাগণকে প্রত্যাদেশ করিলেন যে—"আমি বিকলাঙ্গ ইতর শব্দগণকে তোমাদিগের সন্নিধানে, প্রেরণ করিব, ইহাদিগকে হতাদর না করিয়া তোমাদিগের বর্ণনাতে সাদরে স্থান দান করিবে; তাহাতে তোমাদিগের অশেষ মঙ্গল হইবে। যে কোন লেখক ইতর বিকলাঙ্গ শব্দকে হতাদর করিবেন, আমি তাহাদিগের মুখে রক্ত তুলিয়া যমালয়ে পাঠাইব।"

পূর্ব্বে সরস্বতীকে অবহেলা করিয়াছিলেন সেই হেতু তাঁহার প্রত্যাদেশে ভীত হইয়া সিংহমহাশয় হুতুম্[২] লিখিয়া ইতর শব্দের যথেষ্ট সমাদর করিলে, বাগ্‌দেবী তাঁহার প্রতি কিছুদিনের জন্য অক্রোধ হইলেন, এবং উল্লিখিত প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই ঐ শব্দদিগকে তদবধি যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগের রচনামধ্যে স্থানদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইতর শব্দকে হতাদর ও সরস্বতীর আদেশ উল্লঙ্ঘন করা অপরাধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র চিররোগী হইলেন। পাকড়াশী মহাশয় এ৲কালে কালকবলে

১ কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত মাসিক পত্রিকা (পরে পাক্ষিক) 'ধর্ম্মতত্ত্ব'; প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৮৬৪।

২ কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা (১৮৬২

নিপতিত হইলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত শিরোরোগগ্রস্ত ও নিতান্ত অব্যবহার্য্য হইয়া বালীর উদ্যানে বৃক্ষসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। এ সকল সাংঘাতিক /৩২/ ঘটনা দেখিয়া আর কি কাহারও সাধুশব্দ লিখিতে সাহস জন্মায়। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ নির্ভীকতা; তিনি পীড়িতাবস্থাতেও মধ্যে মধ্যে সাধু শব্দের পুস্তক লিখিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি দুই একজন অদ্যাবধিও সাধুভাষা লিখিতেছেন, ইহাঁদিগের অদৃষ্টে উত্তরকালে, যে, কি অশুভ ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা না জানিয়া ভয়ে তদীয় স্বজনগণের হৃৎকম্প হইতেছে।

যে কারণে সংপ্রতি বঙ্গে ইতর ভাষা লেখা হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ উক্ত হইল। অপর কারণ, শ্রোতা ও পাঠকের রুচি অনুসারে সঙ্গীত ও রচনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যখন আমি নরজাতি ছিলাম কলিকাতার নিকটস্থ পল্লীতে পর্ব্বোপলক্ষে যাত্রা উৎসব দেখিতে সর্ব্বদাই আমার নিমন্ত্রণ হইত; তাহাতে অনেক স্থানীয় ভূস্বামী-ভবনে আমার গমনাগমন হইয়াছিল। আমি একবার কোন জমীদারের বাটীতে পর্ব্বোপলক্ষে রজনীযোগে যাইয়া দেখিলাম একজন বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী (পরমানন্দ কি বদন যে হউক অনেক দিনের কথা বিশেষ স্মরণ হয় না) সুললিত সুরসংযুক্ত যাত্রাঙ্গ গান করিতেছে, সহস্রাতিরেক ভদ্রলোক চিত্তার্পণ করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সেই ভদ্রমণ্ডলীর পশ্চাদ্ভাগে ঐ জমীদারের প্রায় দুই সহস্র কৃষক প্রজা বসিয়াছিল। তাহারা যাত্রাঙ্গগীতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সকলে রৈ রৈ শব্দে সং, সং, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে আসিয়া জমীদারকে জানাইল "ধর্ম্ম-অবতার! আমরা পার্ব্বনী দিবার সময়ে ত মহাশয়কে বিশেষ করিয়া জানাইয়া ছিলাম যে আমরা তাহা দিতে যথেষ্ট ইচ্ছুক; কিন্তু আমরা যেন এই পরবে সংদার যাত্রা শুনিতে পাই। তাহা কোথায়?" প্রজারা নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছে দেখিয়া জমীদার যাত্রার /৩৩/ অধিকারীকে অগত্যা সং নামাইতে আদেশ করিলেন; অধিকারী সং এর উপর সং তাহার উপর সং আনিতে আরম্ভ করিল। চাষীরা অধিক পরিমাণে পেলা দিতে লাগিল, আমরা সকলে বিদায় হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলাম। তদ্রূপ বাঙ্গালা পুস্তক পাঠকেরা অধিকাংশ এক্ষণে আর উৎকৃষ্ট শব্দ বা বৃত্তান্ত ঘটিত পুস্তক চাহেন না। তাঁহারা উক্ত কৃষক প্রজার মত সং-দার পুস্তকের গ্রাহক, তজ্জন্য সং-দাতা গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্র অনেক সং দিয়াছেন; বাঙ্গালা নাটক রচয়িতারা অনেক সং দিতেছেন।

বঙ্গদর্শন-সম্পাদক সং-এর উপর সং তাহার উপর সং দিতেছেন, এবং এক্ষণে চুঁচুড়ার সং নিবৃত্তি পাইয়া চুঁচুড়ার সমসূত্র পর-পারে বঙ্গদর্শনে নানা প্রকার সং বাহির হইতেছে। বাস্তবিক ঐ অঞ্চলটাই সং-এর আড্ং ; আর সংপ্রিয় পাঠকেরা, সংদার লেখকের যথেষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন। উক্ত পাঠকেরা যেমন তেমন সংপ্রিয় নহেন ; তাঁহারা ক্রমাগত সাজঘরের দিকে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন ; কতক্ষণে সং বাহির হইয়া ধেই ধেই নৃত্য ও তম্বিরামের মত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করে। অতএব আপনারা বিরক্ত হইবেন না।

চন্দ্রমোহন—

ইতর শব্দ লেখকই হউন অথবা সংদার লেখকই হউন, উহাঁদিগের লেখার মর্ম্মার্থ অত অকিঞ্চিৎকর ও কল্পনা শক্তি অত স্বভাববিরুদ্ধ কেন ?

প্রিন্স্—

সে উহাঁদিগের মস্তকের দোষ।

চন্দ্র—

উহাঁরা অত্যুৎকৃষ্ট বিজ্ঞ মনোরঞ্জক উত্তররামচরিতের অনুবাদ সমালোচনায়,[১] অসদৃশ নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

প্রিন্স্—

তাহা করিতে পারেন। তাঁহাদিগের বীভৎস রুচিতে ঐ পুস্তক ভাল লাগে নাই, জানেন ত বিক্রমপুরবাসী বীভৎসরুচি /৩৮/ বাঙ্গালেরা কলিকাতার উৎকৃষ্ট উপাদেয় সন্দেশ ভক্ষণ করত মিষ্ট কম বলিয়া নিন্দাবাদ ও ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরে অধিক পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব আপনারা বীভৎসরুচির দৃষ্টান্ত দেখিয়াও উত্তররামচরিতের অনুবাদাদির সমালোচনার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই ?

চন্দ্র—

এক্ষণে অযোগ্য লেখকের নাটক নবেলস্বরূপ জাঙ্গলিক লতাবল্লী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতি যত্নের সুরস সাধুভাষার বৃক্ষটীকে জড়ীভূত করিতেছে, আবার তদুপরি বিষবৃক্ষাদি নিজ নিজ শাখা প্রসারণ করিতে আসিতেছে, অতএব সাধু-ভাষা বৃক্ষের সজীব থাকিবার সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু এস্থলে ইহাও

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'উত্তরচরিত' ('বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ—আশ্বিন ১২৭৯)

বলা কর্ত্তব্য যে, দেবেন্দ্র বাবু[১] ও রাজনারায়ণ বাবু[২] প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা হইতে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, পরে তাহা বিশেষ নিবেদন করিব।

জষ্টিশ দ্বারকানাথ মিত্র—

যে সকল লেখকের কথা উল্লেখ হইল এই মহাপুরুষেরা বঙ্গ ভাষা ও ভাব সমুদায়কে (মর্ডর) হত্যা করিতেছেন ইহার প্রমাণ পক্ষে সংশয় থাকিল না। অতএব আমার বিচারে ইঁহাদিগের কাগজ, কলম বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ইঁহাদিগকে পোর্ট ব্লেয়ারে পাঠান হয়।

১ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ রাজনারায়ণ বসু

ইংরাজী-শিক্ষিত

জষ্টিশ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের আত্মার উক্তি।

ইংরাজীশিক্ষিত নব্যমহাশয়েরা, প্রায় সকলেই সম্বর্দ্ধনাবিমুখ; সম্বর্দ্ধনা কিম্বা অভ্যর্থনা করা ইহাঁদিগের পক্ষে দুষ্কর ব্যাপার! কেহ কেহ তাহা লজ্জাকর বিবেচনা করেন। ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রে সকলেই প্রাচীন /৩৫/ মহাশয়গণকে সবিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবারা, সম্মান করা দূরে থাকুক, সংপ্রতি মহাপ্রামাণিক প্রাচীনদিগকে যথাশ্রুতরূপে আসুন বসুনও বলেন না; বরঞ্চ তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করেন। কাহারও গাত্রে চরণস্পর্শ হইলে দেশীয় রীত্যনুসারে তাঁহারা নমস্কার করেন না, কি ইংরাজী রীত্যনুসারে বেগ ইউয়র পার্ডন্‌ও বলেন না।

ইহাঁরা সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে অতিশয় হাম্‌বুজ অর্থাৎ আত্মবুজ; তাহার অণুমাত্র না বুঝিলেও তৎসম্বন্ধে কাহারও সহিত পরামর্শ বা মন্ত্রণা করা তাঁহাদিগের প্রথা নহে।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" যে তত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ বোধ করাও দীর্ঘকাল সাপেক্ষ, যুবারা স্কুলে ধর্ম্মের অণুমাত্র উপদেশ না পাইয়া তথা হইতে বিনির্গত হইবার দুই চারি দিবস পরে, নিমেষের মধ্যে দৈববিদ্যাবলে ধর্ম্মতত্ত্বের নির্ণয় করিয়া ফেলেন। কোন শাস্ত্র কিম্বা কাহার উপদেশ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় নিরূপণ করেন না।

স্থূলতঃ তাঁহারা প্রায় কোন বিষয় নিগূঢ়রূপ অনুধাবন করিতে সক্ষম নহেন। বয়োধর্ম্মে রাগ দ্বেষ সম্বরণ করিতে না পারায়, তাঁহারা উৎকৃষ্ট জ্ঞানাপন্ন হইলেও সে জ্ঞান কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন না।

ইংরাজীশিক্ষিত মাত্রেই ইংরাজী পরিচ্ছদ প্রিয়; কিন্তু সে পরিচ্ছদ কুৎসিত ও অস্বাস্থ্যকর; কুৎসিত তাহা বিচক্ষণ ইংরাজেরা আপনারাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহার সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য লইয়া একদা সংবাদ পত্রে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীরামপুর হইতে ফ্রেণ্ড অফ্‌ ইণ্ডিয়া লেখেন যে ইংরাজী পরিচ্ছদ কেবল শীতপ্রধানদেশে বসতি বলিয়া ইংরাজদিগকে ব্যবহার করিতে হয়, দৃশ্য /৩৬/ সৌন্দর্য্যের জন্য তাহা ব্যবহার করা হয় না। তিনি দৃষ্টান্ত দেখান যে, ইংরাজী পরিচ্ছদ দৃশ্যে কদর্য্য ও অবিনীত ভাব বিশিষ্ট,

সেই হেতু যে যে স্থলে মহৎ ইংরাজের প্রতিমূর্ত্তি আছে, সেই প্রতিমূর্ত্তির পরিচ্ছদ একটা (ড্রেপরি) আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করা থাকে।

কৃষ্ণনগর কালেজের লব্ সাহেব বলেন,—ইংরাজদিগের পরিচ্ছদ বিশ্রী; তাহার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ পরিচ্ছদের সৃষ্টি হয়, ইহা লইয়া বিলাতে মধ্যে মধ্যে আন্দোলন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় লোকে সেই পরিচ্ছদের এত প্রিয় কেন?

নব্য ও প্রাচীন ইংরাজীশিক্ষিতদিগের তৈলমর্দ্দনে, বাল্যবিবাহে, জাতিভেদে দ্বেষ; ইহাঁরা পার্থক্য ভাবের অনুরাগী; ইহাঁদিগের জ্যেষ্ঠাধিকার ধর্ম্মান্তর অবলম্বন, শাস্ত্রে অমর্য্যাদা, শবদাহে অনিচ্ছা, বৈদ্যক চিকিৎসায় অননুরাগ প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সমস্তই ইংরাজী ভাব।

স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অর্পণ করণার্থে ইহাঁদিগের দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ, ইহাঁরা প্রায় ইংরাজীশিক্ষিত ভিন্ন সকলকেই নির্ব্বোধ মনে করেন। কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞানবিশিষ্ট লোকের বুদ্ধি ব্যুৎপত্তির নিকট কেবলমাত্র ইংরাজী পাঠার্জ্জিত জ্ঞান পরাভূত হয়।

তাঁহাদিগের আবার কতিপয় বিশেষ বিশেষ পুস্তক পাঠ করার অহঙ্কার প্রচুরতর। ভাবেন না মিল্‌টন দ্বিতীয় আর একখানি মিল্‌টন, বেকন দ্বিতীয় আর একখানি বেকন, সেক্সপিয়র দ্বিতীয় আর একখানি সেক্সপিয়র পুস্তক পাঠ করেন নাই; অথচ তাঁহারা উৎকৃষ্ট পণ্ডিত হইয়াছিলেন। অনাদিকাল হইতে বহুদর্শন ও স্বাভাবিক বুদ্ধি সংস্কারে বিশাল পৃথিবী-পত্রিকা আলোচনায় অনেক লোক প্রামাণিক হইয়াছেন। সেইরূপ এক্ষণে বহুতর প্রামাণিক লোক, দাম্ভিক ইংরাজীশিক্ষিতদিগের অপেক্ষা এই বঙ্গভূমিতে বিরাজমান আছেন। /৩৭/ জানি না তবে কেন কেবল ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাঁরা স্ফীত হইয়া উঠেন। ইংরাজী পুস্তকের সংখ্যা বহু, কেবল এক কথা এক ঘটনা পুনঃ পুনঃ লেখা। তাহাতে এত অব্যবহার্য্য বিষয়ের বর্ণনা আছে যে, সে সকল বিশেষ জ্ঞানোৎপাদন করিতে পারে না ও কাল ক্রমে কোন কার্য্যে আইসে না, সেই নিষ্ফল পুস্তক বহু ইংরাজীশিক্ষিত অনন্যচিত্ত হইয়া পাঠ করিয়া কালক্ষয় করেন, তদর্থে আমরা তাঁহাদিগকে নিষ্কাম পাঠক বলি, কেন না কোন ফলের আশা থাকিলে তাঁহারা ঐ রূপ পুস্তকপাঠে নিমগ্ন হইতেন না।

এই মহাপুরুষেরা জানিলে অথবা পারিলেও সুস্পষ্ট হস্তাক্ষর লেখেন না।

ইংরাজীশিক্ষিতেরা আপনার পিতামহ ও মাতামহের নাম হঠাৎ বলিতে পারেন না। কিন্তু বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিনের সাত পুরুষের নাম চক্ষের নিমেষে উচ্চারণ করেন। ইংরাজীপুস্তক ও সমাচার পত্র স্তূপাকার পাঠ করিতে অরুচি জন্মে না, কিন্তু দুই চারি পংক্তি বাঙ্গালা পড়িতে মুখমণ্ডল বিকৃত ও সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হয়। কেহ কেহ এতদূর নির্লজ্জ "আমি বাঙ্গালা জানি না, তন্নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই" বলিয়া আপনার গৌরব করেন। ইহাদিগের নাম লার্নেড, এডুকেটেড—বিদ্বান্; বিদ্বান্ শব্দ বিদধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কেহ অনেক বিষয় বিদিত না হইলে তাহাকে বিদ্বান্ বলা যায় না। কিন্তু এক্ষণে বিদ্বান্ শব্দের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে যে, ঐ শব্দটী প্রায় সকল ইংরাজীশিক্ষিতের নামের পূর্ব্বে অনায়াসে স্থান লাভ করে।

উক্ত বিদ্বানেরা অনেক অব্যবহার্য্য বিষয় জ্ঞাত আছেন, ব্যবহার্য্য বিষয় যৎসামান্য; এমন কি সামান্য বেতনভুক কর্ম্মচারী ও আতপতণ্ডুলভোগী সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাদিগের /৩৮/ অপেক্ষা অধিক ব্যবহার্য্য ও জ্ঞানগর্ভ বৃত্তান্ত অবগত আছেন। ইংরাজীশিক্ষিতেরা, বিবিধ বিশেষ বিষয়ে অপটু, দেশভাষা ও সংস্কৃত জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ পরিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা আবার আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলাইতে চাহেন। তাঁহারা কেবলমাত্র ইংরাজী-জানার গুণ গৌরবে উন্মত্ত হইয়া আপনাদিগকে বহুজ্ঞ বলিয়া ভাণ করেন।

আমরা তাঁহাদিগকে একদেশচর্ম্মাবৃত বৈরাগীর খঞ্জনী বলি; খঞ্জনীতে যেমন নামসঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন অন্যরূপ খেয়াল ধ্রুপদ বা প্রকৃত তান-লয় বিশুদ্ধ কোন সঙ্গীতের সঙ্গত হয় না, তাদৃশ কেবল ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গবাসীর দ্বারা কোন যৎসামান্য কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছু সম্পন্ন হইতে পারে না।

এই খঞ্জনী তাঁহাদিগের পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধু স্বদেশী প্রতিবাসী প্রভৃতি সকলেই গুণগরিমা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করেন।

অনেকানেক ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজী ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন ভাষার মর্ম্মার্থ বিদিত নহেন।

এই বিশাল পৃথ্বীপত্রে কি লেখা আছে, তাঁহাদিগের তাহা দেখা কি দেখার যত্ন হয় না। তাঁহাদিগের ধারণা আছে, ইংরাজীতে যাহা নাই তাহা অসার,

ইংরাজীতে যাহা আছে তাহাই সার ; সেই সার জানিয়া ইংরাজীশিক্ষিতেরা আপনাদিগকে সারদর্শী বিবেচনা করিয়া স্ফীত হইতে থাকেন।

ইংরাজেরা তোপে নানা দেশ অধিকার এবং কলবলে শকট ও তরণী চালনা করিতেছে বলিয়া যে তাঁহাদিগের ভাষার সকল পুস্তক সর্ব্বরাজ্যের ভাষা অপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ ভাবে পরিপূরিত হইবেই হইবে, এমন প্রত্যয় করা বুদ্ধিমান লোকের কার্য্য নহে ; যেহেতু সেই ইংরাজীর অনেক পুস্তক, দাম্ভিক গ্রন্থকারের অযৌক্তিক মীমাংসায় /৩৯/ পরিপূর্ণ ; তৎসমুদয় কু-যুক্তি হিল্লোলের বেগে কেবল ইংরাজীশিক্ষিতের বুদ্ধি বিবেচনা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। এত লোকের এত গ্রন্থ, এত লোকে খণ্ডন করিয়াছে যে কাহারও সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া হৃদয়ে স্থান দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ সেই পরদেশীয় ইংরাজী ভাষা যে বঙ্গবাসী যতই অনুধাবন করুন বা শুদ্ধ রূপে লিখুন, তাহা প্রায় সর্ব্বাংশে ভ্রম বর্জ্জিত হয় না। অতএব বাঙ্গালিরা তাদৃশ অনায়ত্ত ভাষাকে উপলক্ষ করিয়া বৃথা আপনাদিগের গুণগৌরব প্রকাশ করেন। তাই যাহা হউক ; ছাই ভস্ম সত্যং বা মিথ্যা বা কতকগুলিন শিক্ষা করিয়া রাখুন, তাহা প্রায় ঘটে না, অনেকে পাঠান্তে যেমন উচ্চতর ইংরাজীবিদ্যালয় হইতে বিনির্গত হয়েন, অমনি তাঁহাদিগের পঠিত গ্রন্থ সকল সেল্‌ফের আশ্রয় লয়, আর বহির্গত হয় না।

এই মহাত্মারা পল্লীগ্রামের বাঙ্গালা দপ্তরখানায়, নিকর্ম্মামণ্ডলীতে, প্রত্যাশাধীনদিগের নিকট এবং শ্বশুরালয়ের অন্তঃপুরে মহামহোপাধ্যায় ক্লেবর লার্নে´ড নামে বিখ্যাত ; কিন্তু ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির আয়তন বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার পক্ষে ইংরাজীশিক্ষিতেরা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়েন। আর এক রহস্তকর ব্যাপার এই যে, দশ বৎসরের কনিষ্ঠকেও ইহাঁরা সমবয়স্কশ্রেণী-ভুক্ত করিতে যত্ন করেন ; কিন্তু পাঁচ সাত বৎসরের জ্যেষ্ঠকে অসমকালিক সে কেলে পুরাতন লোক ইত্যাদি বলেন ; কলুটোলার লোক পটলডাঙ্গা-বাসীদিগকে পূর্ব্বদেশীয় বাঙ্গাল বলিলে যেমন শুনায় ইহাও সেইরূপ।

কেহ কেহ বোধ করেন, বঙ্গভূমির ক্রমশঃ জীর্ণাবস্থা উপস্থিত হইতেছে ; তন্নিবন্ধন তথায় ক্রমশঃ হীনবুদ্ধি ও হীনবীর্য্য লোক জন্মিতেছে, কেন না আধুনিক প্রাচীনেরা পিতৃপুরুষ অপেক্ষা হীনবীর্য্য ও হীনবুদ্ধি ; আবার সেই আধুনিক প্রাচীনদিগের অপেক্ষা তৎ সন্তানেরা /৪০/ আরও হীনবুদ্ধি ও নির্বীর্য্য, অতএব পূর্ব্বে অত্যল্পবয়স্ক মনুষ্যের যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

পাওয়া গিয়াছে, এক্ষণে অনেক সুশিক্ষিত সাত সন্তানের পিতা, তাহার শতাংশের একাংশ বুদ্ধি ধারণ করেন না। উক্ত সিদ্ধান্তটীকে আমরা প্রত্যয় করি না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রত্যয় করিবার যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই।

ইংরাজীশিক্ষিতদিগের উকীলপদ লাভের জন্য মনের বিষম বেগ; কিন্তু আধুনিক উকীলদিগের মধ্যে অনেকের যোগ্যতা ও উপার্জ্জন এত সামান্য যে, তদ্বারা তাঁহাদিগের বাহ্য আড়ম্বরের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। অধিক কি, তাঁহাদিগের অন্নকষ্ট বলিলেও দোষ হয় না। এই অবস্থায় আবার তাঁহারা অনেকে "আমরা উকীল" এই গরিমায় ব্রহ্মাণ্ডকে পোস্তদানার অপেক্ষা ক্ষুদ্রবোধ করেন; তাঁহারা আপনাদিগের অপেক্ষা সকল প্রকার পদস্থ লোককে হীনাবস্থ বিবেচনা করেন এবং কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলেন—"We are above the ordinary class of people" কিন্তু অন্য কোন ব্যবসায়ীদিগকে তাঁহাদিগের অপেক্ষা বিপন্ন দেখিতে পাই না। তাঁহারা কত উচ্চতর তাহার আলোচনা করিতে গিয়া একবার চীনেবাজারের দোকানদারদিগের অবস্থা স্মরণপথে আনিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম, কাটা কাপড় ও কাক বোতলের দোকানদার, বেনে বকালি সকলেই তাঁহাদিগের অপেক্ষা সম্পন্ন লোক ও অধিক উপার্জ্জন করে। সওদাগরি আফিসের গুজনসরকারী বাক্সে, অথবা দোকানদারদিগের কাটাবাক্সে যাহা জমা থাকে, অনেক উকীলের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাঁরা ফিটফাট থাকিবার জন্য গাড়োয়ান ও ধোপা নাপিতকে আহার দিয়া থাকেন; তাহারাই ইহাঁদিগকে মহা ধনী, মহা বাবু বলিয়া জানে।

সামলাধারী উকীল মহাশয়েরা কেহ কেহ এক দিনে নানা বিচারা-/৪১/ লয়ে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, বিলক্ষণ জানিয়াও অনেক স্থানীয় বিচারালয়ের বাদী প্রতিবাদীর নিকট ফি-র টাকা গ্রহণ করেন। আহা! কি বিদ্যা! কি নিষ্ঠা!

তখনকার উকীলদিগের বিলক্ষণ বক্তৃতা শক্তি ছিল, আধুনিক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকের বক্তৃতাপ্রবাহের কি পরিচয় দিব, ইহাঁরা যখন বিচারপতির সম্মুখে বক্তৃতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, দেখিলে ও শুনিলে জ্ঞান হয়, যেন বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকেরা, শিক্ষকের সমক্ষে সপ্তাহের পাঠ মুখস্থ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; শিক্ষকের ন্যায় বিচারপতি উকীলদিগের অপটুতা জন্য মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট তিরস্কার করিতেছেন।

দাসত্ব

বাবু রামগোপাল ঘোষের আত্মার উক্তি।

কেবল দাসত্ব অর্থাৎ চাকরী এক্ষণে বঙ্গবাসীদিগের কি যে গৌরবাস্পদ, তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। দাসত্ব আবার সম্মানের অবস্থা! দাসত্বে মানহানি ও দুঃসহ অধীনতা, উহা ঐহিক সুখসম্ভোগ ও পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশের বিরোধী হইয়া রহিয়াছে।

দাসত্ব একপ্রকার জীবন্মৃতের অবস্থা; তাহাতে লঘুতার একশেষ; এই দাসত্ব উপলক্ষে কত জ্ঞানবিমূঢ় প্রভুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। দাসত্বের ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ব নাই; সকল দাসই প্রভুর পদানত, কিন্তু পুত্রের অহঙ্কার আমার পিতা চাকরী করেন, মাতা- /৪২/ পিতার অহঙ্কার পুত্র চাকরী করে, ভগিনীর অহঙ্কার আমার ভ্রাতা চাকরী করেন, স্ত্রীর চূড়ান্ত অহঙ্কার আমার স্বামী চাকরী করেন; সে চাকরী যে কি তাহা তাঁহারা সহসা বুঝিতে পারেন না; যে করে সেই জানে, সেই তাহাতে জর্জ্জরিত আছে, সেই তাহাতে দগ্ধ আছে; গুরুতর চাটুকার ভিন্ন প্রায় প্রভুর প্রিয়পাত্র ও আশু নিজপদের উন্নতি করিতে পারেন না।

দাসদিগের মধ্যে কেবল বিচারপতিরা নহেন, উচ্চতর পদস্থ লোক মাত্রেই মনে করেন যে, "আমি অতিশয় যোগ্য; আমার সদৃশ উপযুক্ত লোক দুষ্প্রাপ্য," কিন্তু জানেন না যে, অনুসন্ধান করিলে মধুমক্ষিকার শ্রেণীর ন্যায় তাঁহার তুল্য বহু লোক যথায় তথায় মিলিতে পারে; সেই পদস্থ লোক, তাঁহার শিরোমণি তুল্য উপযুক্ত অধীনকে বুদ্ধি দান করিতে লজ্জা বোধ করেন না। তুলসী-সদৃশ অধীন অধমেরা তাঁহার মতের পোষকতা ও উত্তেজনা করাতে এতাদৃশ পদস্থ ব্যক্তির গুণগরিমা ও অহঙ্কার হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়।

কর্ম্মচারী দাসদিগের মধ্যে যাঁহার উপর সাহেব সদয়, তিনি অদ্বিতীয় উপযুক্ত লোক; তিনি সকল বাঙ্গালির বুদ্ধিদাতা; তিনি তাহাদিগের বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তিকারক; কিন্তু তাঁহাদিগের অনেকের বিদ্যাবুদ্ধি এত অসাধারণ যে, রামহরি আপন নাসা দংশন করিয়াছে, এ পর্য্যন্তও তাঁহারা কেহ কেহ প্রত্যয় করিয়া থাকেন।

দাসত্ব কার্য্যভুক্ত লোকদিগের মধ্যে আদালত, পুলিশ ও রেলওয়ের

কর্ম্মচারীরা, নিতান্ত সৌজন্ম ও হিতাচারশূন্য ; শুনা যায় ইহাঁদিগের আস্ফালন ও উপসর্গ ভয়াবহ, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইহাঁদিগের শ্রীকরে আমরা কদাচিৎ নিপতিত হই নাই।

এক্ষণকার বিচারপতি দাস মহাশয়েরা অনেকেই এমন বিচক্ষণ /৪৩/ যে, বিচারাসনচ্যুত করিয়া তুলনা করিলে বোধ হয় এমন কি তাঁহারা জেলা উকীলের মুহরীরও অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অযোগ্য ; সেই বিচারপতিদিগের অসীম ক্লেশ সংঘটনার অদ্যাপি অবসান হয় নাই। মুন্সেফ সব্ জজ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য হুগলীতে কার্য্য করিতেছেন, কল্য তাঁহাকে নিরপরাধে পদ্মা নদীর দুর্জ্জয় তরঙ্গমালা উত্তীর্ণ হইয়া রাজসাহী যাইতে হইল ; অদ্য মতিহারীতে আছেন, কল্য কক্সবাজার যাইতে হইল ; অদ্য মুঙ্গেরে কল্য রঙ্গপুর যাইতে হইল। কাহারও বনিতা পথিমধ্যে সন্তান প্রসব করিলেন, বিপদের সীমা নাই।

কোন মহাশয়, স্বয়ং কি তাঁহার শিশু সন্তান অস্বাস্থ্যকর কুস্থানে উৎকট রোগগ্রস্ত হইলেন, চিকিৎসাভাবে কালকবলিতও হইলেন ; কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কার্য্যক্রমে কাহাকে দস্যুমণ্ডলীর মধ্যদেশে জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া অবস্থিতি করিতে হয় ; কি দুঃসাহসিক কার্য্য! কোন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর সহিত বহুকাল সন্দর্শন হয় না, কি দুঃসহ দুঃখের বিষয়!

কোন বিচারপতি উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের গ্রাস ও ঝঞ্ঝাবায়ুর উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া, বিচার স্থান হইতে প্রাণ রক্ষার্থে স্থানান্তর গমন দোষে নিম্ন শ্রেণীস্থ হইলেন। রবিবার কার্য্যস্থানে না থাকা প্রমাণে সামান্য পরিচারকের ন্যায় কাহাকে বেতন কর্ত্তনের দণ্ডাধীন হইতে হইল।

ইহাঁদিগের এক জন্মের মধ্যে শত-জন্মের জনন-মরণ নিবন্ধন যন্ত্রণা ঘটিয়া থাকে ; এক জন্মের মধ্যে বারম্বার দেহান্ত হয় না, কিন্তু মরণের অন্তর্বিধ সমস্ত নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় ; মরণের লক্ষণ এই যে—"স্বদেশ স্বজন চিরবন্ধুর সহিত বিরহসংঘটন, ইচ্ছা হইলে তাঁহাদিগের সন্দর্শন লাভ হয় না।" স্থান পরিবর্ত্তন নিয়মের দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বদাই ইহা ঘটিয়া থাকে। /৪৪/

যাহাই হউক তাঁহারা মরণ সদৃশ যন্ত্রণা, কিছুকাল সহ্য করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চয় ও জীবনের শেষভাগ সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পারেন না। বিচারপতির পদে ত কাহাকে সচ্ছল হইতে দেখি নাই। বহুকাল কার্য্য করিলে

শেষদশায় নিতান্ত লঘুতা স্বীকার করিয়া তাঁহারা ভিক্ষাস্বরূপ রাজদ্বারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পেন্সন পাইয়া থাকেন।

ইঁহাদিগের কার্য্য দ্বারা অধর্ম্মের যেরূপ পুষ্টিবর্দ্ধন হয়, তাহা কি বলিব? বিবেচনাশক্তির অভাবে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের ভ্রম প্রকাশ পায়; সেই ভ্রম দ্বারা যদ্যপি সম্পূর্ণ না হউক, তৎকর্ত্তৃক লোকের আংশিক অপকার ও দণ্ড ঘটিয়া থাকে।

গ্রন্থকর্ত্তা ম্যাডিসন কহিয়াছেন "যে, যেরূপ ধীশক্তি সম্পন্ন সে সেইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইবে" সামান্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি চিকিৎসাকার্য্য, যাজক ও বিচার-কার্য্য বিধানে প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু অতি হীনবুদ্ধি লোকও অধুনা প্রধান লোকের আনুকূল্যে বিচারাসনে বসিয়া বহুতর আবালবৃদ্ধ বনিতার মুণ্ডপাত করিতে থাকেন। এই বিচারপতিরা প্রমাণের অনুগত হইয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়েন; প্রত্যয়ের অনুগামী হইয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন না; যেহেতু তাঁহাদিগের যৎসামান্য দিগ্‌দৃষ্টি, প্রমাণকে খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যয়ের অনুগামী হইতে দেয় না।

কেরাণী মহাশয়দিগের এক প্রকার নিরূপিত আলোচনা আছে। তাঁহাদিগের আয় যেরূপ পরিমিত, বুদ্ধিশক্তিও সেইরূপ পরিমিত। তাঁহারা অতিরেক কোন বিষয়ে বুদ্ধি চালনা করিতে পান না। তাঁহাদিগের ধৈর্য্যকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি। তাঁহারা বেলা দশটার সময় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই লেজরের মিল, সেই অঙ্কপাত, /৪৫/ সেই সঙ্কলন ব্যবকলন প্রভৃতি কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। উক্তরূপ চিন্তা দ্বারা তাঁহাদিগের জ্ঞানের কেমন জড়তা জন্মাইয়া যায় যে, তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ের সারদর্শী হইতে পারেন না, ইহা অনেক আলোচনা দ্বারা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে; তথাচ দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটী আখ্যায়িকা উত্থাপন করিতেছি। রঙ্গপুর জেলার একজন দেশীয় বিচারপতির অধিক নিষ্পত্তি, সদর আদালতের বিচারে পুনঃ পুনঃ অন্যথা হইলে, সদর জজেরা রঙ্গপুরের জজকে তাহার কারণ তদন্ত করিতে লেখেন। তিনি বহুদিন তদ্বিষয়ের বহুতর তদন্ত করণান্তে লিখিলেন যে,—এখানকার দেশীয় বিচারপতি, লোক সত্যনিষ্ঠ, পক্ষপাতশূন্য, উৎকোচাদি গ্রহণ করেন না, তদন্ত করিয়া জানিলাম। দোষের মধ্যে ইনি ইতঃপূর্ব্বে বহুদিন কেরাণীগিরি করিয়াছিলেন, তাহাতেই ইঁহার বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইঁহার নিকট সূক্ষ্ম বিচারের প্রত্যাশা করা যায় না। সদর

জজেরা পূর্ব্বাপর কেরাণীগণের বুদ্ধি বিচারের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন ; তদর্থে তাঁহারা রঙ্গপুর জজের এই বিবরণ, বিনা আপত্তিতে অনুমোদন করিলেন।

কোন কোন কেরাণীর পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ দ্বারা অনেক পরিবার স্বজনের প্রাণ রক্ষা পায়, সেই হেতু তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করা উচিত ; কিন্তু তাঁহারা কেহ কেহ পদগর্ব্বিত হইয়া বিবিধ প্রকার ভ্রূকুটি ও উপসর্গ প্রদর্শন করেন, সেইটী তাঁহাদিগের বিশেষ রোগ।

আমি একদা ককরেল সাহেবের[১] আত্মার নিকট শুনিয়াছি লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব সবডেপুটী নামক এক সম্প্রদায় কর্ম্মচারীর সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাঁহাদিগের কার্য্য, সাধ্য, প্রথা, পদ্ধতি সকলই অদ্ভুত, যাঁহারা লম্ফ ত্যাগ, দ্রুতপদে ধাবমান, সন্তরণ, অশ্ব ও বৃক্ষে আরোহণ, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ইত্যাকার বিপুল কষ্টকর কার্য্য করিতে /৪৬/ পারেন ও যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানেন, কেবল তাঁহারাই এই পদ লাভের যোগ্য পাত্র। এই স্থানে রামগোপাল বাবু বিশ্রামের ইচ্ছা করিলেন।

প্রিন্স্‌—

কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতুমি ভাষায় বঙ্গের দাসত্ব সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয় ; সিংহ কোন কার্য্যার্থে বর্ব্বর স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে তাহাকে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

তখন প্রিন্সের মানস পূর্ণ করিতে রামগোপাল বাবু একখানি পত্র লিখিয়া সিংহের নিকট পাঠাইলেন ; সিংহ পত্র পাঠ দুই ঘণ্টার মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া আপন ভাষাতে দাসত্বের বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের আত্মার উক্তি—

মহোদয়। চাক্‌রে মহলে বঙ্গের পর, যা দেখে এলেম, আজ্ঞা হলে বলি,—

বঙ্গের পর, স্কুল, আফিস, কাছারি খুলেছে, চাক্‌রেরা বড় ব্যস্ত, জেলা বজেলা থেকে কেউ গাড়ি কেউ পাল্কী কেউ পাল্সি চেপে, কেউ পায় চলে,

১ F. R. Cockrell

কেতো মুখে, হুগলী মুখে, আলিপুর পানে চলোচেন; দশটার ভেতর কাজে বস্‌তে হবে বলে, রেলওয়ের যাত্রীরা না খেয়ে হাঁটা দেচেন, অনেকে বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে বলে আসবার সময় পান নাই, ধোপার কাপড় যোগাতে পারে নাই, তাই সাদা, ময়লা আড়ময়লা দু তিন রকমের কাপড়ে সুট মিলিয়েছেন। গাড়িতে অতুত্তি জাতের কাছে বসে পান খেতে খেতে চলেচেন। কোন কোন কাবিল মনিবের কাছে সরফরাজি জানাবার জন্তে আফিসের দরজা খুল্‌তে না খুল্‌তে দরজায় দরোয়ানের খাটিয়াতে বসে আছেন; এঁরা অনেকেই মিয়াজীদের কাছ থেকে দুই একখান রুটী কিনে খান; পেটের জন্তে বড় ব্যস্ত নন। উকীলের বাড়ীর কেরাণীরা ডেস্কের সুমুকে বসে দিশ্‌ ইণ্ডেঞ্চর মেড ইন্‌ দি ইয়ার অফ ক্রাইষ্ট ইত্যাদি রকমের বয়ান ও /৪৭/ সওদাগরের বাড়ীর কেরাণীরা ইন্‌ভাইশ অফ্‌ থ্রি 'থাউজেন ব্যাগস্‌ অফ্‌ মুগি রাইস লিখতে সুরু ক'রেছেন, গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণীরা সাশীর ধারে কলমই কাটচেন। আর কোন কোন উমেদার, গুবুরে রঙের মুরুব্বিদের কাছে লম্বা সেলাম করে খাড়া রয়েছেন, তাঁরা বিলিতি ইংরেজের ঢঙে তাঁহাদিগকে বলছেন,—টো-মি সার্টিপিকেট আনতে পারে? টবে আসবে।

কোন মহাপুরুষের লাকো-টাকার জমীদারী আছে, তিনি চাকরী কল্লে ইজ্জত বাড়বে, এই ভেবে ইংরেজদিগের দ্বারে দ্বারে খোসামুদি করে বেড়াচ্চেন। অনেক চাকরে সেরেপ মনিবের লাভের জন্তে কতই সয়তানি কচ্চেন। আদালতের আমলারা আজ ব্রাদারে মাদারে পেছারে জওজে ওয়াফেজ সরেনাও আর আর কয়েকটা বেজেতে কথা লিখে আপনাদের নাএকির হদ্দ দেখাচ্চেন। বাঙ্গালি হাকিমেরা মুরব্বী সাহেবদের সেলাম দিতে যাবেন, তাই চাপকানের ওপর জোব্বা চাপিয়ে ব্যারিষ্টারদিগকে লজ্জা দিচ্চেন। গাড়ী পালকী চড়বের খরচের জো নাই, সোজা পেণ্টুলন ধূলায় ধূসর করে কোন কোন আফিসর আপনার মোরাত্তিবে জানাচ্চেন। কেউ হয় তো সাহেব বাড়ীর সিঁড়ির ঘরের নিচেতে একটু বসবার জায়গা পেয়েছেন, তাঁরও মদগর্ব্বের সীমা নাই, আর শিক্ষা ডিপার্টমেণ্টের কোন অহঙ্কেরে কেরাণী, চৌরঙ্গীর আফিসে ট্যাঁ ট্যাঁ কচ্চেন। তিনি আপনাকে ঠিক সৃষ্টিকর্ত্তা ভেবে বসে আছেন। পর্ম্মিটে ও ট্রেজরিতে কেউ নম্বর কেউ তারিখ কেউ এগজামিনের দাগ দে একজন কেরাণীর কাজে দশ বারজন দিন কাটাচ্চেন। রেজষ্টরি আফিসের কেরাণীরে দলিলের বজ্‌নিস নকল তুলছেন। বড়

আদালতের উকীলদের বিল সরকারেরা দাওয়াই থানার বিল সরকারদের মত বড়মানুষেদের দ্বারে দ্বারে টো টো কত্তে /৪৮/ সুরু করেচেন। কাল রঙের অনেক বাঙ্গালীরে মিস কালা রঙের আলপাকা চাপকান প'রে আপিসে বেরুচ্চেন্; দেকে অনেকে মনে কচ্চেন, এঁরা কেশে ভেঙ্গার গোর দিতে চলেচেন। আজকাল কলমবন্দ আম্লাদের মান ভারি! কি ব'লবো, তাঁবেদার জাৎ ব'লে গর্‌লাএক ইংরেজেরাও উপযুক্ত বাঙ্গালি আমলাকেও প্রায় খানসামার মত তোয়াজ কচ্চেন। মৃত্তিকা কোঁশ্‌ ভাণ্ডারা, সুযোগ পেলে পাঁচশ টাকা মাইনের কার্য্যদক্ষ বাঙ্গালিকে ষ্টুপিড বলে থাকেন। কোন কোন বাড়ীর ফেরোত কলমবন্দ আজ কেদারার গায়ে চাদর রেকে আফিসে আসবার চিহ্ন দেক্‌য়ে বাসার গে কানায়ে চাপাচ্চেন। বড় বড় চাকুরেরা আফিসের ছোট ছোট তাঁবেদারদের ওপর দুচোক রাঙা করে প্রভুত্ব গিরির ফৈজোত্‌ কচ্চেন ও হক্‌কুল্লো দাবি দিচ্ছেন। কোন কোন কেরাণী বাড়ীর ফেরত আজ পাড়দার কাপোড় ও শান্তিপুরে পোসাকি উড়ুনি বদলাবার সময় পান নাই সেই কাপড়েই আফিসে এসেচেন। কিন্তু প্রধানপক্ষ সাহেবদের কাছে ঐ পোসাকে যেতে বড়সড় হচ্চেন। পাড়া গাঁয়ের আম্‌লাদের কারু কারু গায় আতর বা ওডিকলমের গন্ধ ও ঠোঁটে পানের কস ইত্যাদি বিলাসের চিহ্ন দ্যাকা যাচ্চে। কুড়ি টাকার কেরাণীদের পাকেটে রেশমের রুমাল ও হাতে শিলআংটী আজ বাহার দিচ্চে, কোন কোন বাবু পল্লীগ্রামে থেকে আস্‌তে পথে ধামাখানেক জলপান চিব্‌য়ে এসেচেন। আজ ক-দিনের পর, দু-তিন দিনের মাইনের পয়সায় মেঠাই গিল্‌চেন। গৃহ-শূন্য যাঁদের হয়েচে, তাঁরা আজ পাটনা, মুঙ্গীর, কাশী, কানপুর, আগ্‌রা, তাজবিবীর গোর, লক্ষৌর খস্‌রুবাগ দেকে কোল্‌কেতায় জম্‌চেন। আপিস বন্দে তাঁদের বিশেষ আরাম্‌ বোদ হয় নাই, সর্ব্বদাই বোজাচ্চেন আমাদের আপিস খোলা থাকা আর বন্দ থাকা উভয়ই সমান; অন্ধ জাগরে, না কিবা রাত্রি-কিবা দিন! /৪৯/

হাইকোর্টের সামলা-অওলাদিগের আদালত খোলে নাই, তাঁহারা মক্কেলদের কাছে ওজুহাত্‌, প্লেন্ট, এলোকেটার, বার্ড বাই লিমিটেশন এই রকম গোটাকতক শব্দ শোনাচ্চেন। হাতে একটীও মোকর্দ্দমা না থাকিলেও এঁরা দশটা বাজলেই জজের সুমুকে ঘণ্টার গড়ুরের মত খাড়া হন, আপিলে মোকর্দ্দমা নিশ্চয় ফিরাবেন, এই আশা দিয়া মক্কেলকে টুইয়ে দ্যান। মোক্তারের খোসামুদি করেন, জজের মুখনাড়া খান, আদালত থেকে বেরিয়ে

এসে আপনার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রোফেসনের পোরচয় দ্যান। জেলা আদালতের রোখো উকীলেরা গাছতলায় বসে "আমি আসামীকে চিনি," লিখিয়া কেবল সনক্তের কাজে—দাদের জীবন কাটাচ্চেন।

নতুন চীনেবাজারে খুবরী খুবরী ঘরে কাপ্তিনি আপিস-ওয়ালারা, ডাইনের চাতরের মত আপিস সাজ্যে বসে আচেন। একধারে ছোট একটা টেপারে বা টেবিলে ব্রাণ্ডি বিয়ারের গ্লাস শোভা পাচ্চে। লাল মুকো কাপ্তেন এসে বসেচেন, হেড সরকার—যাঁক বিনয়ে মুচ্ছুদ্দি বলা যায়, তিনি ভাঙ্গা ইংরিজীতে বেধড়ক ইংরিজী জুড়ে দেচেন। আপিসের সুমুকে ধর্ম্মতলা টেরিটি বাজারের কসাইরা হল্লা কচ্চে। কেউ কেউ মুরগীর ঝুড়ি প্যাজের বোজা ও আলুর চুবড়ি নাব্য়েছে। প্রধান সরকার ও তাঁবেদারেরা খুব সকালে সন্ধ্যাবন্দনা কিছুই না ক'রে তোপের আগে ভাত গিলে বেরুয়েচেন। দুআনা জিনিসের দেড্‌টাকা দাম লিক্‌চেন। মাজে মাজে ধরা পড়ে ঘুসো ঘাসাটাও খাচ্চেন। জিনিস পত্র যোগানওয়ালাদের সঙ্গে হিসাবের ভারি গোলযোগ কচ্চেন। ছোট আদালতের ওয়ারিন্ পর্য্যন্ত না হ'লে অনেক হিসাব সহজে চুক্‌চেনা। সরকারেরা আপিসের নাম করে দোকান থেকে জিনিস নিয়ে ও কাপ্তেনের নাম ক'রে আফিস থেকে টাকা নিয়ে যখন তখন পালাচ্চে। কাপ্তিনি আফিস ওয়ালারা /৫০/ দশটা এগারোটা রাত্রে আপিস বন্দ ক'রে যান। রাত্রি বেশি হয় তখন আর লালদীঘির ধারে গাড়ী পাওয়া যায় না। সকলেই পায় চলে বাটী যান, কেউ কেউ, পাছে টাইম লাশ অর্থাৎ মিছে বিলম্ব হয় সেই ভয়ে পেচ্ছাব কত্তে কত্তেও চলে থাকেন।

হৌসের বিশলক্ষপতি মুচ্ছুদ্দিরা, হাতে বাঁদাপাকুড়ী বেঁদে বসে আছেন। এঁদের চাদ্দিকে দালালেরা চাল সোরা ও কুসুমফুলের নমুনো ধ'রেচেন। রেড়ো দালালেরা শেললাক ল্যাকডাই চাদরের খুঁটে বেঁদে এসেচেন। হিন্দুস্থানীরা চিনি সোরা কাঁচা পাকা সোয়াগার নমুনো এনেচেন। গাধা-বোটের দেড়ে মাজিরে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে, আমদানি রপ্তানির বোট দেবে বলে উমেদারি কচ্চে। মাজে মাজে সরকারদের সঙ্গে কথান্তর হয়ে তাদিগকে ব্যাটা ব্যাটা ব'লে সম্বোধন কচ্চে। বিলসাদা সরকারেরা সমস্ত দিন দোকানে কাল কাটিয়ে দশহাজার টাকার বিলের মধ্যে একশ টাকা আদায় করে এনে, ডণিল্দারের তেজার লাক কচ্চে। মুহুরীরা খাতায় সাড়ে তিনশ আইটেম টিক দিতে মাথায় ঘি গলাচ্চেন। কোন কোন হৌসের তিসি সরষে তিলের

ধূলাতে পাড়ার শত শত লোকের কাশরোগ জন্মাচ্চে। মুটে বস্তাবন্দ মার্কওয়ালা, তৌলদার, সরকার, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান পোর্মিটে কালেক্টর সাহেবের দেড়শত আমলাকে উপাসনা করে, এক একটী কর্ম্ম শেষ হচ্চে। কিন্তু গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার গতিকে সে সকল কাজ ঠিক সময়ে হচ্চে না। কোন কোন হৌসের কাজে সকাল বেলায় এলাহি কাণ্ড উপস্থিত। বোধ হয় এক বাড়ীতে একশ দুগ্‌গোচ্ছব হলেও য্যাতো গোল হয় না। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি অসময়ে শতেক ফরমাশ আঞ্জাম কত্তে হয়।

প্রিন্স –

(সহাস্যে) এ সকল আমার জানা আছে তবু "অমৃতং বালভাষিতং" তোমার মুখে ভাল শুনালো। /৫১/

ডাক্তার

কিশোরীচাঁদের আত্মার উক্তি।

ডাক্তারেরা নিতান্ত মন্দ লোক নয়। সকলেই এক স্থানে এক জনের নিকট এক রূপ উপদেশ পাইয়া থাকেন কিন্তু আশ্চর্য্য এই চিকিৎসা বিষয়ে প্রায় দুই জনের মত এক হয় না। ইঁহারা প্রত্যেকেই সমব্যবসায়ী হইতে শ্রেষ্ঠ এই বিবেচনা সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন রোগীর পীড়া নিশ্চয় করিতে না পারিলে অন্য ডাক্তারের সহিত একমতে চিকিৎসা করা ইঁহাদিগের পক্ষে দারুণ অসম্ভ্রম; কতকগুলিন ভারতীয় রোগের পক্ষে তাঁহাদিগের ডাক্তারি পুস্তকে উপশম দায়ক বিশেষ ঔষধ নাই। ইহা তাঁহারা সবিশেষ জানিয়াও তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানা আছে সেই অনুসারেই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কি নৃশংস! ইঁহারা উক্ত রোগের চিকিৎসা বিষয়ে অপারক এবং দেশীয় কবিরাজেরাই (সেই রোগের) প্রকৃত চিকিৎসক, ইহা তাঁহারা কাহার নিকট ভ্রমক্রমেও স্বীকার পান না। রোগী, তাঁহাদিগের চিকিৎসায় বিনষ্ট হয় হউক, তথাপি তাঁহারা আপনাদিগের ক্ষমতার ন্যূনতা স্বীকার পাইয়া বৈদ্য চিকিৎসার আদেশ প্রদান করেন না। ইঁহারা প্রায় অর্থ উপার্জ্জনে চক্ষুর্লজ্জা বিবর্জ্জিত; এই মহাপুরুষদিগের অর্থ-গ্রহণের করাল চেষ্টা হইতে দীন হীন জনেও পরিত্রাণ পায় না। মহাত্মারা সামান্য পীড়াকে উৎকট বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং তাহা আরোগ্য করিয়া আপনাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। যেমন হিংস্র জন্তু বিনাশ হেতু অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে জন্তুর পরিবর্ত্তে নরহত্যাও ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাশয়েরা অনেকে বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টে রোগ নির্ণয় /৫২/ করিতে না পারিয়া যে ঔষধ দেন তদ্দারা রোগ নষ্ট না হইয়া অতি সহজে রোগী নষ্ট হয়।

ইঁহাদিগের পুনঃ পুনঃ চরণবিন্যাসের আতিশয্যে পথে তৃণ জন্মাইতে পারে না, কিন্তু রোগী আহ্বান করিলেই উৎকৃষ্ট রূপ অশ্বযান চান্। মনুষ্যের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিয়া ইঁহা দিগের দয়া-বৃত্তি অন্তর্হিত, সুতরাং পীড়িত ব্যক্তি, মরুক বা বাঁচুক টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট থাকেন। কোন মহাত্মার ভিজিট চারি, কাহারও দশ, কাহারও ষোল টাকা; কি গুণে যে তাঁহারা এতাদৃশ মহামূল্য পাইবার পাত্র ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যদি বলেন, প্রাণের দায়ে মনুষ্যকে উক্ত মূল্য প্রদানে বাধ্য হইতে হয়। সে কথা অস্বীকার করিতে

পারি না,—স্থান বিশেষে প্রাণের দায়ে কোন উপকার না পাইয়াও যথা সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইতে হয়, যেমন নির্জ্জন-প্রান্তরস্থ অস্ত্রধারী দস্যু, পথিককে বলিয়া থাকে, "তোর নিকট যাহা আছে, আমাকে অর্পণ কর, নতুবা এই অস্ত্রাঘাতে প্রাণান্ত করিব।" পথিক কি করে, উপায় নাই, ভয়াবহ বাক্য শ্রবণে চাঁদমুখে যথাসর্ব্বস্ব তাহার হস্তে প্রদান করিয়া প্রস্থান করে, বোধ করি, ইহাও সেইরূপ।

ডাক্তারেরা সকলেই প্রত্যুৎপন্নমতি; রঞ্জকে অগ্নি দিলে যেমন বন্দুকে তৎক্ষণাৎ শব্দ হয়, ডাক্তারজিরা, সেইরূপ পীড়িত ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়াই নিমেষ মধ্যে তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া যান। এত সঙ্কিপ্ত কালের মধ্যে কি অলৌকিক সংকেতে ঐ দুরূহ ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন, কেহই জানেন না। বিলাতবাসীদিগকে যেরূপ অপরিমেয় ঔষধ সেবন করান হইয়া থাকে, অন্নজীবী বাঙ্গালিকে সেই পরিমাণে ঔষধ সেবন করাইয়া হিতে বিপরীত ঘটাইয়া থাকেন। আসন্ন মৃত্যু প্রায় ডাক্তার বাবুরা অনুমান করিতে পারেন না। রোগীর নিকট প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যাইতে হয়, তাঁহাদের ইহা বোধ নাই।/৫৩/ ইহাঁদিগের কালাচাপকান, চারকা প্যান্‌টুলন্ ও জলপানের খুঁচী মাথায় দেখিয়াই রোগী কালান্তকানুচর জ্ঞানে ভয়ে শঙ্কিত হয়। সকলে সময়ে আসিতে পারেন না; কাল বিলম্ব জন্য রোগীর রোগ বৃদ্ধি পায়। কেহ কেহ অজ্ঞ কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত রাখেন, কম্পাউণ্ডারের ঔষধ বিমিশ্রিত করিবার দোষে ও ডাক্তারদিগের কমিশন গ্রাহী ঔষধালয়ে মান্ধাতার আমলের ঔষধের দোষে, রোগী সুস্থ হইতে পারে না। ইহাঁদিগের মধ্যে দুই চারিজন উদার-স্বভাব ডাক্তার আছেন। তাঁহারা প্রাতে·বিনা মূল্যে দীন দুঃখীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন, এবং মৃতব্যক্তির স্বজন শ্মশান বা গোরস্থান হইতে প্রত্যাগমন না করিলে ভিজিটের বিল পাঠান না। ইহাঁরা রোগ নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিয়া বারংবার ঔষধের পরিবর্ত্তে ঔষধ প্রয়োগ করত রোগ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। যেমন পারসীনবিশ মুন্সীরা লেখা শিখাইবার জন্য তাঁহার ছাত্রদিগকে হরফ মস্ক করিবার নিমিত্ত একখণ্ড কাষ্ঠ দেন, (তাহার নাম তক্তিয়া মস্ক; ছাত্র পুনঃ পুনঃ তাহার উপরে লিখিয়া হস্ত বশ করেন) সেইরূপ ডাক্তারেরা রোগ না জানিয়া রকম রকম ঔষধ দিয়া রোগীকে তক্তিয়া মস্কের মত বানাইয়া আপন ব্যবসা অভ্যাস করিয়া থাকেন।

ইহারা লার্নেড প্রোফেসনের অনুবর্ত্তী বলিয়া দুর্জ্জয় অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকেন, ঐ যৎকিঞ্চিৎ ডাক্তারি পর্য্যন্ত ইহাদিগের বিদ্যা ;—অন্য কথার প্রসঙ্গ হইলে বদন-ব্যাদান করিয়া থাকেন। শুকদেব-তুল্য কোন ব্যক্তির অঙ্গে ক্ষত দেখিলে বলিয়া উঠেন,—এ তোমার পারার ক্ষত, কুসংসর্গে ইহা জন্মিয়াছে। তাঁহাদিগের রোগ নির্ণয় বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন, তথাচ দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতে বাধ্য হইলাম।

কিছুদিন গত হইল সভাবাজারনিবাসী আমাদিগের একজন /৫৪/ পরমাত্মীয় ধার্ম্মিকের উরুদেশে একটী ব্রণঘটিত ক্ষত হইয়াছিল। তাঁহাকে জনৈক মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালি ডাক্তার ঐ কালেজের হাসপিটলে লইয়া যাইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইংরাজ ডাক্তারেরা একত্রিত হইয়া কন্সল্‌ট দ্বারা কহিলেন, তোমার জানুদেশ পর্য্যন্ত ছেদন করিতে হইবে। নতুবা এই ক্ষত বিস্তৃত হইয়া তোমার মৃত্যু উপস্থিত করিবেক। রোগী কহিলেন বরং মৃত্যু শ্রেয় ; তথাপি আমি জানুদেশ ছেদন করিতে পারিব না।

অনন্তর তিনি গৃহে পুনরাগমন করিয়া অল্পদিন হলওয়ের মলম ব্যবহার করাতে রোগ শান্তি হইল। পুনরপি তিনি ঐ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহারা সকলে দেখিয়া কহিলেন, তুমি সংপ্রতি আরাম হইয়াছ বটে, কিন্তু পুনশ্চ তোমার ঐ পীড়া হইবে। অদ্য সাত বৎসর অতীত হইল তাঁহার সেই জানুদেশে একটী ব্রণও দেখা যায় নাই। রোগ নির্ণয় করিবার কি অদ্ভুত শক্তি !

আমড়াতলা নিবাসী কোন বাবু ধাতুঘটিত জ্বর ও প্রস্রাবের দোষ ঘটনায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তাঁহার ফ্যামেলি ইউরোপীয় ডাক্তার, আর দুই তিনজন দক্ষ বাঙ্গালি ডাক্তার যত পারিলেন, তাঁহার উপর ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। ঐ বাবুর নিজের ঔষধালয় থাকাতে একদণ্ডের নিমিত্ত ঔষধ আনাইতে কাল বিলম্ব হয় নাই। অবশেষে প্যান্‌টুলনওয়ালারা কহিলেন, বাবু তোমার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, ধনসম্পত্তি যথেষ্ট আছে, উইল করিবার সময় উপস্থিত ; আমরা ঔষধ ক্রমাগত দিলাম কোন প্রতিকার হইল না। এই বলিয়া তাঁহারা বিদায় হইলে, তাঁহার প্রতিবাসী রায় কবিরাজ, মধ্যাহ্নে আসিয়া সাক্ষাৎ করণান্তে কহিলেন,—বাবু শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে ডাক্তারেরা আপনার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক /৫৫/ আমি আপনাকে কিছু ঔষধ সেবন করাইতে চাই। বাবু কহিলেন, হানি কি।

কবিরাজ কহিলেন, ডাক্তারেরা শুনিলে আমার ঔষধ সেবন করিতে দিবেন না। বাবু কহিলেন, আপনার ঔষধ গোপনে ব্যবহার করিব। বৈদ্যের ঔষধ গোপনে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবুরা বোতল বোতল ঔষধ আনিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহা ব্যবহার না করিয়া সঞ্চিত রাখিলেন। বৈদ্যের ঔষধে অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরাম হইয়া মাপের ফিতা বাহির করিয়া, ডাক্তারদিগের চিকিৎসা বিদ্যার দৌড় মাপিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই একটী বিবরণ বলিয়া নিরস্ত হইলাম। প্রয়োজন হইলে ডাক্তারি বিচক্ষণতার শত শত প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিব।

আর একটী ডিফার্মিটি বিযুক্ত করিবার ইতি-বৃত্তান্ত মেডিকেল কালেজের ছাত্রদিগের এবং প্রায় সকল ডাক্তার বাবুদের গোচর থাকায় তদ্বিবরণ এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম না।

অনুরাগ-তত্ত্ব

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আত্মার উক্তি।

পূর্ব্বে কতকগুলি বিষয়ে বঙ্গসমাজের যে পরিমাণে অনুরাগ ছিল, এক্ষণে সে সকল বিষয়ে অনুরাগের অনেক আতিশয্য হইয়াছে। তাহা যৎকিঞ্চিৎ মহাশয়কে অবগত করিতেছি।

প্রথমতঃ সাহেবানুরাগের বৃত্তান্ত এই,—কোন সাহেবানুরাগী পুত্রকে উপদেশ দিয়া থাকেন, দেখ চারু! তুমি প্রণম্য বাঙ্গালিকে প্রণাম কর আর না কর, তাহাতে কিছু হানি নাই, তাহাতে কিছু ।৫৬/ আসে যায় না। কিন্তু সাহেব বা সাহেবাকার টুপিওয়ালা-সেলামককে, সেলাম করিতে যেন কখন ক্রটি না হয়। সাহেবানুরাগীরা যৎসামান্য কেরাণী ও জাহাজি খালাসি সাহেবদিগকে রাজা ও প্রভু মনে করেন, তাঁহাদিগের ধারণা, সাহেব মাত্রেই রূপে গুণে অতুল; সাহেবের নিন্দা শুনিলে তাঁহারা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগে উন্মত্ত হয়েন। সাহেবের চরণে পুনঃ পুনঃ মস্তক ঘর্ষণ করিয়া নিকেশ হওয়াও গৌরবের বিষয় বিবেচনা করেন।

সাহেবত্ব অনুরাগ।

একদিন চারু সাহেবত্ব অনুরাগীকে কহিয়াছিল, মহাশয়! এ-একতলা এঁদোঘরে ছেঁড়া কাপড়ের পরদা ঝুলাইয়া অনবরত স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ীর দুর্গন্ধ ভোগ অপেক্ষা সেই তরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী বায়ুহিল্লোলসংশোধিত নিবাসে বাস করিলে ভাল হয় না?

উত্তর হইল—তুমি বুঝ না, সেখানে নিগারদের সঙ্গে বাস করা ভাল নহে। বরঞ্চ চট্টগ্রাম, চন্দননগর, চুনোগলির নকল সাহেবদের অনুসারে চলিতে আমার উল্লাস হয়। কিন্তু কুবের সদৃশ বাঙ্গালির ভাবে চলিতে আমার দারুণ লজ্জা হয়। এই সাহেবানুরাগীদের বাস্ত বৃক্ষের উত্তম ফল ও পুষ্প, সর্ব্বাগ্রে সাহেবদিগের বাটীতে উপহার দেওয়া হইয়া থাকে।

কাহারও যানানুরাগ এত প্রবল যে, যান এবং অশ্ব ক্রয় কার্য্যে তাঁহার উপার্জ্জিত ধন নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন এবং অশ্বের যে গাত্রাবরণ দিয়া থাকেন তত্তুল্য উৎকৃষ্ট বস্ত্র তাঁহার পিতা শীত নিবারণার্থে পান কিনা সন্দেহ।

খাদ্যানুরাগীরা কর্ত্তব্য কার্য্য রহিত করিয়া সমস্ত মাসের উপার্জ্জন সন্দেশাদি

খাত ক্রমেই নিঃশেষ করিয়া থাকেন। জানি না আত্মা-/৫৭/বিহীন নির্জীব সন্দেশাদি কিরূপে তাঁহার পক্ষে পরকালে সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হইবে।

কেশানুরাগের প্রভাবে নব্যদিগের বহির্গমনে অন্যূন এক ঘণ্টাকাল বিলম্ব হয়। মস্তকের কেশের কিয়দংশ অহি-ফণার ন্যায় ঊর্দ্ধাভিমুখে, কিয়দংশ বামভাগে, কিয়দংশ দক্ষিণ ভাগে বিরাজিত থাকে; আর যে তাহা কিরূপ বিজাতীয় ভাবে বিন্যস্ত হয়, তাহা বর্ণন করা আমার ন্যায় জ্ঞানহীন লোকের সাধ্য নহে। কিন্তু উচ্চতর ভদ্রপরিবারস্থ যুবাদিগের তাদৃশ কেশানুরাগ নাই।

তত্ত্বানুরাগীরা, তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া উন্মত্ত। বধূর তত্ত্ব, জামাতার তত্ত্ব, শ্বশ্রূর তত্ত্ব এই সকল বাহুল্যরূপে নিষ্পন্ন করিতে পারিলেই তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব, খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থের সার্থকতা হইল। পিতা, মাতা, স্বজন, পরিজনের অভাব মোচন না হউক, পুত্রের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন না হউক, ঋণ পরিশোধ না হউক, দাস দাসীগণ বেতন না পাউক, রোগের চিকিৎসা না হউক, স্ত্রীপুত্র পর প্রত্যাশাপন্ন হউক, তাহাতে লক্ষ্যপাত নাই, কিন্তু ভূমি সম্পত্তি তৈজস অলঙ্কার বন্ধক দিয়াও বৈবাহিক ও বৈবাহিক-বনিতার সন্তোষ সাধনার্থ আড়ম্বর বিশিষ্ট তত্ত্ব করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের মানবজন্মের সার্থকতাই সম্পাদিত হইল না। তত্ত্বকার্য্য সুনিষ্পন্ন ও প্রশংসনীয় হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন, কিন্তু সেই সর্ব্বস্বাপহারক তত্ত্বের কিছুই ফল দেখিতে পাই না, তদ্দ্বারা কেবল ভূতভোজন হইয়া থাকে।

দম্ভানুরাগ।

শুনিয়াছি, দম্ভের সাক্ষাৎ ঔরস পুত্র স্বরূপ পাঁচটী ব্যক্তির আজ কাল সাতিশয় প্রাদুর্ভাব। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম, শাবক সমেত ভাইপোর খুড়া, দ্বিতীয়টী গোঁপধারী অধ্যাপক, তৃতীয়টী চটিধারী ডাক্তার, চতুর্থটী এঁদো একতলার বষ্ঠীপুত্র, পঞ্চমটী কাঁটালতলার কানাই। এই দাম্ভিক পঞ্চের প্রত্যেকের ধারণা যে, তাঁহা-/৫৮/দিগের তুল্য বিচক্ষণ লোক বঙ্গভূমিতে, শুদ্ধ বঙ্গভূমিতে কেন সমস্ত ভূমণ্ডলে বিদ্যমান নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে পণ্ডিত তাঁহার মনের ধারণা এই যে, তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত, তিনি যাহা শুনিয়াছেন, কি পড়িয়াছেন, তাহাই নিগূঢ়, তিনি যাহা তর্ক করেন, তাহাই অখণ্ডনীয়, তাঁহার রুচিতে যাহা ভাল লাগে, তাহাই উপাদেয়।

তিনি যাহা ঘৃণা করেন, তাহাই নিন্দিত, তিনি যাহা লেখেন, তাহাই অভ্রান্ত ও তাহাই অমৃতধারা।

যাহা হউক ইত্যাকার সিদ্ধান্ত করা, নিতান্ত বাদসাই বর্ব্বরের কার্য্য। কেন যে দত্তদেব তাঁহাদিগের উপর এতদূর অনুরাগী হইলেন, আবশ্যক হইলে তাহার বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। উপরি উক্ত মহাত্মাদিগকে দম্ভ সম্বন্ধে এক শ্রেণীভুক্ত করিলাম, কিন্তু গুণ সম্বন্ধে উহাঁদিগের পরস্পরে অতিশয় ইতর বিশেষ আছে।

পটলডাঙ্গা, হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বিখ্যাত গবর্ণমেণ্ট কালেজের উত্তীর্ণ যে সকল ক্ষেপণীচালক অর্থাৎ দাঁড়টানা ছাত্র আছেন, তাঁহারা অতি সামান্য তর্ক-তরঙ্গেই তরণী ডুবাইয়া ফেলেন; তথাচ উক্ত কালেজের ছাত্র বলিয়া তাঁহাদিগের অহঙ্কারে রস টস্ টস্ শব্দে নিপতিত হইতে থাকে। সেইটী সহ্য করা যায় না। কম্পিটিসন্ একজামিনেসন অর্থাৎ প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রথা প্রচলন না হইলে কেবল তাঁহারাই চিরকাল সরস্বতীর বরপুত্র নামে বিখ্যাত থাকিতেন। যেরূপ হাইকোর্টে দেশীয় বিচারপতি না হইলে দেশীয় লোকেরাও চিরদিন অনুপযুক্ত থাকিয়া যাইতেন, সেইরূপ অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষিতেরা চিরকাল অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেন।

অভিযোগ অথবা মোকদ্দমানুরাগ।

কতকগুলি অভিযোগানুরাগী অধুনা বঙ্গে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা অভিযোগ সংশ্রব ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না। কখন প্রজার নামে, কখন /৫৯/ প্রতিবাসীর নামে, কখন স্বজন পরিবারের নামে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। এইরূপ অভিযোগকাণ্ডে তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েন; জয়যুক্ত হইলে যৎসামান্য লাভ হয়। তথাচ অভিযোগানুরাগীর অভিযোগ উপস্থিত না থাকিলে তিনি এই সংসার শূন্যময় দেখেন। সংসারের প্রতি তাঁহার ঔদাস্য জন্মে, আপন দেহকে ভারভূত জ্ঞান হইতে থাকে, তিনি সময়কে কঠোর যন্ত্রণা উৎপাদক বিবেচনা করেন। উদরে অন্ন পরিপাক হয় না, নানাবিধ রোগ ও চিন্তা আসিয়া তাঁহার শরীরকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। তিনি বলেন,—মোকদ্দমা মামলা না করিলে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ অবহেলা নিবন্ধন যেরূপ চিত্তবিকার জন্মে, সেই-রূপ চিত্তবিকার তাঁহার অন্তরকেও যার পর নাই আকুল করিয়া তুলে। কোন

এক মোকদ্দমাপ্রয়াসীর পরম বন্ধু তাঁহাকে অকারণ অভিযোগ উপস্থিত করণে নিষেধ করাতে, তিনি উত্তর করিলেন,—আপনি জ্ঞাত নহেন, আমি আর পুনঃ পুনঃ সংসারের জনন-মরণ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না। সংপ্রতি ভূতভাবন ভগবান, কোন রজনীতে আমার নিদ্রাবস্থায় প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে,—"তোমাকে জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে আদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়া আত্মীয় অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী ও নিজ পরিবার সকলের নামে অভিযোগ উত্থাপন করিবে, অন্যথা হইলে, তোমাকে পুনশ্চ সত্বর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।" আমি পুনশ্চ আর জঠর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না। সেই হেতু সংসারের প্রায় সকল লোকের নামে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছি, কেবল সহধর্ম্মিণী বনিতা ও কনিষ্ঠ পুত্রটীর নামে কোন অভিযোগ করা হয় নাই। বনিতার নামে সত্বরেই নালীশ উপস্থিত করিব; কনিষ্ঠ পুত্রটীর বয়ঃপ্রাপ্তির বিলম্ব আছে। অধুনা তাহার নামে কোন মাম্‌লা উপস্থিত করা বে-আইনী, তাহাতেই চিন্তানলে আমার শরীর শুষ্ক ও হৃদয় তাপিত /৬০/ হইতেছে। কি জানি, তাহার নামে অভিযোগ করিবার পূর্ব্বে দেহান্ত হইলে ভগবানের প্রত্যাদেশ অনুসারে আমাকে পুনশ্চ জরায়ু-শয্যায় শয়ন করিতে হইবে। এই চিন্তায় যেন আমার শ্বাস অবরোধ করিতেছে।

বাবুত্বানুরাগ।

আধুনিক বাবুত্বের বিবরণ, নিবেদন কালে হাস্যার্ণব বেগবান হইতেছে। যখন দারুণ অপ্রতুল নিবন্ধন স্ত্রী পুত্রের অন্নাচ্ছাদন হইতেছে না, তখনও চারি টাকা মূল্যের ইংরাজী পাদুকা চাহি। নিকটস্থ কার্য্যালয়ে গমনাগমনের গাড়ী পাল্কীভাড়া ও শনিবার নাটকাভিনয় দর্শন লালসা পরিতৃপ্তের ব্যয় চাহি। ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা, বাবুত্ব জানিতেন না। অতিরেক সুখ-সেব্য বস্তুতে লালসা ছিল না। আপনাদিগের অর্জ্জিত অর্থে আবাসভূমি ও অট্টালিকা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার বাবুরা, ইংরাজদিগের ন্যায় অনেক টাকা বাটী ভাড়া দেন। মিতাচরণ দ্বারা কর্ম্মস্থানে একখানি বাটী করিবার ক্ষমতা হয় না। যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা সেই কার্য্যস্থলে নিঃশেষিত হয়। ভূমি সম্পত্তির পরিচয় দিতে হইলে সেই পিতৃপুরুষের ভূমিসম্পত্তির নামোল্লেখ করিতে হয়। এক্ষণকার উচ্চতর বাবুদের সকলই বাবুয়ানায় যায়; অথচ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহারা যাবজ্জীবনের মধ্যে

স্মরণের উপযুক্ত কোন কার্য্য করিয়াছেন, এম দেখা যায় না। সামান্য উপার্জ্জকদিগেরও বাবুত্ব অতি প্রশস্ত ; নিঃস্ব কেরাণী ও উকীল বাবুদের দুইটী হিন্দু ভৃত্য, একজন পাচক, একজন সরকার, গাড়ীর সইস কোচম্যান, নিত্য ক্ষৌরকার্য্যের নাপিত ইত্যাদি আপনার প্রতি শত প্রকার প্রতিদিনের ব্যয় : দরিদ্রকে দান, অভুক্তকে অন্ন ও আতুরের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিতে এখনকার বাবুদিগের প্রায় দেখা যায় না। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় চালাইবার দান অনুরোধক্রমে স্বাক্ষর করিয়া কি কৌশলে না দিতে হয়, /৬১/ বাবুরা পুত্রানুপুত্ররূপে স্বতঃ পরতঃ তাহার চেষ্টা পান ও সে দান রহিত করণান্তে নিশ্চিন্ত হয়েন। ইঁহারা প্রায় একমহল বাটীতে বাসা করিয়া থাকেন, সঙ্গে অন্য কোন পরিবার থাকিতে পান না। ইঁহাদিগের স্ত্রী সর্ব্বস্ব ; কোন আলাপী কি আত্মীয় লোক সাক্ষাৎ করিতে যাইলে সেই এক মহল বাটীর দ্বারদেশ ধারণ করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নিরুপায় আত্মীয় ভবানীপুর হইতে বেলা দশটার সময় বাগ্‌বাজারে আসিয়াছে। তৃষ্ণায় কণ্ঠ ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে। এক্ষণে কোথায় গিয়া বিশ্রাম করে! চিন্তায় নিস্পন্দ, অবশেষে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল।

কনিষ্ঠাঙ্গুলের অগ্রভাগ চর্ব্বণ বা লেহন করা, দন্ত বা অধরোষ্ঠ দ্বারা লেখনী ধারণ করা, উভয়পার্শ্বস্থ পকেটে হস্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া দণ্ডায়মান থাকা উচ্চতর বাবুত্বের লক্ষণ!! তপন-তাপে সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ; মস্তকের মস্তিষ্ক শুষ্ক হইতেছে তথাপি স্ব-হস্তে ছত্র ধারণ করা হয় না।

জাতীয় ভাবানুরাগ।

স্বদেশানুরাগী সুধীর মহাশয়গণের যত্নে জাতীয়ভাবের উন্নতি সাধনার্থে, জাতীয় সভা, জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় সম্বাদ পত্র, জাতীয় মেলা, ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকলের নাম জাতীয় ; কিন্তু অদ্যাবধি তত্তাবতের কার্য্যের অনেকাংশে জাতীয় ভাব নিবিষ্ট হইবার কাল বিলম্ব আছে। জাতীয় সভায় কেবল জাতীয় ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ হইয়া থাকে। কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ে ভিন্ন জাতীয় অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার আলোচনা হইয়া থাকে। তদর্থে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন ঐ বিদ্যালয়ে কেবল দেশীয় ভাষার আলোচনা হয়।

বিদেশীয় রীতিপদ্ধতির প্রতি কোন কোন জাতীয় ভাবানুরাগীদিগের এতদূর বিদ্বেষ যে তাঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের বেঞ্চ স্থানান্তরিত করিয়া কুশাসনে বসিয়া বালকদিগকে পড়িতে বলেন ও শঙ্খধ্বনি করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ ও ভঙ্গ হয়। বিদ্যালয়ে সাইন বোর্ড /৬২/ না থাকে। তৈলাক্ত সিন্দুর দ্বারা তাহার প্রাচীরে অথবা একটী ধ্বজপটে কি প্রস্তর ফলকে লেখা থাকে শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই বিদ্যালয় করিতেছি ও জাতীয় সম্বাদ পত্র, জাতীয় ভাষায় বিরচিত হয়। আর কেহ কেহ প্রস্তাব করেন জাতীয় মেলায় স্থানে দেশীয় উৎকৃষ্ট পদার্থ অর্থাৎ ঢাকাই মলমল, ঢাকাই অলঙ্কার, মির্জ্জাপুরের তুলিচা, কাশ্মীরী শাল, বারাণসী বস্ত্র, মুর্শিদাবাদের পট্টবস্ত্র, তসরালা ও শ্রীরামপুরের তসর এই সকল আইসে। ঔদরিকেরা বলেন, বাঙ্গালার নানাবিধ সূক্ষ্ম সুগন্ধি তণ্ডুল, জনায়ের রসকরা, ধনেখালির খইচুর, সিলহট্টের কম্‌লা নেবু, সুন্দর বনের মধু, ও অকালজাত-ফল সমুদায় মেলায় আনা হয়।

মেলার বিবরণ পত্রে যথাশ্রুত বঙ্গভাষা লেখকদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার অপকার করা না হয়। উৎকৃষ্ট লেখকদিগকে যথোপযুক্ত অনুরাগ করা হয়।

হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের যৎকুৎসিত ধিং ধিং নৃত্য ও বাউলের বিজাতীয় সঙ্গীত রহিত হয়। কবি, সংকীর্ত্তন, রামপ্রসাদী পদ ও কথকতার আলোচনা হয়। স্থূলতঃ কি কি উপায়ে জাতীয়ভাব রক্ষা পায় ও নিন্দিত বিজাতীয়ভাব দূরীভূত হয়, সুযোগ্য বঙ্গলেখক কর্ত্তৃক তাহার প্রবন্ধ নিচয়, বিরচিত হইয়া মেলা স্থানে পাঠ হয়। কেবল অসংখ্য স্বজাতি একত্র হইয়া এদিক্ ও ওদিক্ ছুটা ছুটী, রৈ রৈ নিনাদ ও দুম্ দাম্ বোমা বাজি শব্দায়মান করিলে জাতীয় মেলার অভিসন্ধি সফল হইতে পারে না। যাহা হউক ভরসা হয় ক্রমশঃ মেলার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা মুমূর্ষু জাতীয়-ভাবকে পুনরুদ্দীপন করিতে সক্ষম হইবেন। সংপ্রতি কি করিলে জাতীয় ভাবের রক্ষা হয়, কাহাকে জাতীয় ভাব বলে অধ্যক্ষেরা অদ্যাপি তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। /৬৩/

সাহেব

ইউরোপীয়ানেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ঘোর বাবু হইয়া পড়েন। তাঁহারা সকলেই মনে করেন, বাঙ্গালিরা সর্ব্বাংশে নীচ। কিন্তু হিমপ্রধান-দেশে বসতি বলিয়া তাঁহাদিগের অনেকেই স্থূলবুদ্ধি। বাঙ্গালিরা যেরূপ ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, তাঁহারা ভারতীয় ভাষা সেরূপ শিখিতে পারেন না। ইঁহারা অনেকেই "কৌচুলী, আমারবি, তেমারবি, পেটিয়ে, লুকাইয়াছিল আড়ালেতে গাছের" ও দুই একটা ইতর দুর্ব্বাক্য দেশীয় ফিরাঙ্গি ও যবন পরিচারকদিগের নিকট বহু কালে ও বহু কষ্টে শিখিয়া থাকেন। আপনাদিগকে সুশ্রী মনে করেন, কিন্তু বাঙ্গালির ন্যায় তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট গঠন নহে।

বিবিরা নিজ নিজ স্বাভাবিক স্বরে কথাবার্ত্তা কহেন না। তাঁহারা সকলেই এক প্রকার সরু সাধা স্বরে কথা কহেন। তাহা নিতান্ত কর্কশ বোধ হয়। হইবেই ত, কেন না অস্বাভাবিক কোন বস্তুই ভাল নহে।

ইউরোপীয়ানদিগের স্বভাব, ব্যবহার অন্য যে কোন জাতির সহিত অনৈক্য হয় তাঁহাদিগকে ইঁহারা স্যাভেজ বলেন। তাঁহাদিগের স্বভাব, ব্যবহার যে অনুকরণ করে, তাহাকে তাঁহারা সভ্য বলেন। কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বঙ্গদেশীয় লোকেরা কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসিলে আত্মীয়তা প্রকাশ করা হয়। ইংরাজদিগকে ঐ রূপ জিজ্ঞাসিলে তাঁহারা কি একটা কুটীল অর্থ করিয়া রুষ্ট হয়েন। ইঁহাদিগের স্বজনের মধ্যে কেবল আপনার স্ত্রী; অন্য দূরে থাকুক, পুত্রও কেহ নহে।

একবার একজন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ, তাঁহার মাতার নিমিত্ত /৬৪/ বিলাতে খরচ পাঠাইবার জন্য যখন পত্র লিখিতে ছিলেন, কোন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব তখন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া পত্রের মর্ম্মার্থ অবগতান্তে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মনে মনে কহিলেন যে, এ ব্যক্তি কি মহৎ! ইনি মাতার জন্য আপন পরিশ্রমের ধন পাঠাইতেছেন! সাহেব জানিতেন না, ভারতের অতি নিঃস্ব হেয় ব্যক্তিও ঐরূপ করিয়া থাকে। পরে সৈন্যাধ্যক্ষ সংবাদপত্রে সৈনিক পুরুষের ঐ পত্রের মর্ম্মার্থ ঘোষণা করিয়া দিলেন, এবং অনুরোধ করিলেন যে, সে ব্যক্তি অতি মহৎ. তাহার ন্যায় অন্যান্য ইংরাজেরা মহৎ হইয়া যেন অনাথিনী মাতার খরচ পাঠাইয়া দেন। ঐ ঘোষণা পত্র যে যে

ভারতবাসীর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের হাসিয়া হাসিয়া উভয় পার্শ্বে বেদনা জন্মিয়াছিল।

আবার কি অদ্ভুত ইংরাজী দয়া ; যে ঘোড়া বহুকালাবধি ইংরাজ প্রভুর কার্য্য করিয়া আসিতেছে, কালে সে অকর্ম্মণ্য কি প্রাচীন হইলে স্বহস্তে গুলি করিয়া তাহাকে সংহার ও আহারার্থে প্রতি দিন অসংখ্য পশু পক্ষী বধ করা হয়, অথচ পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারিণী সভার অর্থাৎ Prevention to the cruelty to animals বিষয়ে তিনি পোষকতা করিয়া থাকেন। ক্ষতযুক্ত পশুকে শকটে যোজনা ও চারি জনের অধিক তাহাতে আরোহণ করিতে দেন না।

রাগান্ধ হইলে মুখমণ্ডলে প্রহার করা ইংরাজী সভ্যতা।

ইংরাজের অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও বলকে আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করি।

বঙ্গবাসীদিগকে এই মহাপুরুষেরা কি কারণ অসভ্য বলেন, কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাঁহারা অপক্ক মাংস ভক্ষণ করেন, বঙ্গবাসীরা তাহা করেন না, ইহাঁরা মাংস পাক করিয়া ভোজন করেন। ইংরাজেরা আপন বিবিকে /৬৫/ পর-পুরুষের সহিত নির্জ্জন গমন ও ভ্রমণ করিতে দেন, আমরা তাহা দিই না। তাঁহারা মল মূত্র ত্যাগান্তে জল ব্যবহার না করিয়া কাগজ ব্যবহার করেন, আমরা তাহা করি না। তাহারা মৃত-দেহ দুর্গন্ধ যুক্ত ও প্রোথিত করেন, আমরা তাহা দগ্ধ করি। তাঁহাদিগের সহোদর ভ্রাতা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে পথের ভিখারী দেখিয়াও তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না, আমরা উহাতে নিতান্ত দয়ার্দ্র-চিত্তে যথাসাধ্য সাহায্য করি। তাঁহারা পিতা মাতার সহিত পার্থক্য ভাবাপন্ন হয়েন, আমরা একত্র থাকি। তাঁহারা not at home, very busy শব্দ দ্বারা অনেকের সহিত সন্দর্শন ও কথোপকথন কষ্টের নিবারণ করেন, আমরা তাহা করি না। তাঁহারা স্ববংশীয় স্ত্রীকে এমন কি পিতৃব্য কন্যাকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারেন, আমরা তাহা পারি না। তাঁহারা পত্নীস্বসাকে বিবাহ করিতে পারেন না, আমরা তাহা পারি। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের স্ত্রী পুরুষের সহবাসের প্রথা আছে, আমাদিগের তাহা নাই। তাঁহাদিগের স্ত্রীজাতি নির্লজ্জ, আমাদিগের তাহা নহে। ইনি আমার ভ্রাতা, ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার কন্যা, ইত্যাদি সম্পর্ক নিবন্ধন যে দৃঢ় ভরসা আমাদিগের মধ্যে ছিল, তাহা ঐ সভ্যতম ইংরাজদিগের

আদর্শেই এককালে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত কারণেই কি তাঁহারা সভ্যজাতি? আর আমরা অসভ্যজাতি? উল্লিখিত সমুদায় কার্য্য যদ্যপি তাঁহাদিগের সভ্যতার প্রতি কারণ হয়, তবে তাঁহারা তাঁহাদিগের সভ্যতা লইয়া থাকুন, ঐরূপ সভ্যতাতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। ঐ সমস্ত সভ্যতাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া আমরা বিদায় লইতে চাহি। /৬৬/

আদিম কলিকাতাবাসী

প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আবির্ভূত হইয়াছেন। যাঁহারা পল্লী হইতে না আসিয়া স্মরণাতীত পূর্ব্বকাল হইতে কলিকাতায় বাস করিতেছেন, ইঁহারা অপ্রসিদ্ধ লোক। ইঁহারা মনে মনে বিবেচনা করেন, আদিমকাল হইতে কলিকাতাবাসী হইলেই প্রধান লোক বুঝায়। সেই হেতু অনেকেই এক্ষণে ঐরূপ কলিকাতাবাসী প্রকাশ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ হইবার আশা করেন, কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিলে আদিম কলিকাতা-বাসীরা তাহা নহে। এই নগরবাসীরা নানা প্রকার উপাদেয় পদার্থ ভোগ বিবর্জ্জিত থাকিয়া মনে করেন, তাঁহারা নগরে কি অনুপম স্বচ্ছন্দই ভোগ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের রসনা ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র, ইহা হৃদয়ঙ্গম নাই। সুস্বাদু দুগ্ধ, নানাবিধ সদ্যোলব্ধ ফল মূল, মৎস্য, মধু, মাংস, অবদ্ধ বায়ু, মনোহর লতা-বিতান, পক্ষিগণের অমৃতময় স্বর, অনাবৃত হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রের রমণীয়তা, তাঁহাদিগের যাবজ্জীবনের মধ্যে দুই একবার ভক্ষণ ও সেবন হওয়া দুষ্কর।

সেই আদিম কলিকাতাবাসীদিগের ভাষা ও তাহার অর্থ সঙ্কলন।

ভাষা	অর্থ
নোংরা	ম্লেচ্ছ।
বত্ত	ব্রত।
টাকাশ-পাঁচ	পাঁচ শ টাকা। /৬৭/
কেঁকাল	কাঁকাল।
ক্যাওরা	কাওরা।
কঁ্যাটাল	কাঁঠাল।
ট্যাকা	টাকা।
ঢোকে	প্রবেশ করে।
আমাদের ঘরে	আমাদিগের।
কালী ঠাকুর	কালী ঠাকুরণ।
দুগ্‌গা ঠাকুর	দুর্গা ঠাকুরণ।
দকিন	দক্ষিণ।

গেনু	যাইলাম।
খেনু	খাইলাম।
দিনু	দিলাম।
নিনু	লইয়াছিলাম।
ছেরকাল	চিরকাল।
পকুর	পুকুর।
পদ্দীম	প্রদীপ।
বামুন	ব্রাহ্মণ।
চাঁড়িয্যে	চাটুয্যে।
হাঁসি	হাসি।
এনাদের	ইহাঁদের।
ওনাদের	উহাঁদের।
শেঁকারি	শাঁকারি।
নোনোদ	ননদ।
চৌত্রিশ	চৌত্রিশ।
চারিশ	চল্লিশ। /৬৮/
গ্যাড়া স্থান	খর্ব্বাকার।
কোব্‌রেজ	কবিরাজ।
গ্যাঁজা	গাঁজা।
ইকুন	উকুন।
মালিচন্নন	মাল্য চন্দন।
বের করা	বাহির করা।
ক্যাঁকড়া	কাঁকড়া।
বাসাতা	বাতাসা।
বাসাত	বাতাস।
সম্‌বার	সোমবার।
কিরেট	কৃপণ।
কোঞ্জুস	কৃপণ।
ফোঁটা	ফোটা।
সোন্দোর	সুন্দর।

প্রাচিত্তি	প্রায়শ্চিত্ত।
ভাগ্‌না	ভাগিনেয়।
পুঁতি	পুঁথি।
পরিবার*	স্ত্রী।
আশদ গাছ	অশ্বত্থ গাছ।
দেবলা	দেবালয়।
দেদার	পুনঃ পুনঃ।
অসুদ	অশৌচ। /৬১/

* পত্নী, জায়া, ভার্য্যা, স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, বনিতা, দারা, ইত্যাদি সত্ত্বে কোন্ মহাপুরুষ পরিবার শব্দ দিলেন? পরিবার শব্দে কেবল স্ত্রী নহে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির সমষ্টি। [গ্রন্থকার]

ব্যক্তিবৃন্দের সমাগম স্থান

সংপ্রতি প্রায় অধিকাংশ মনুষ্য নিতান্ত অভিমানের বশবর্ত্তী। কোন সমাগম স্থলে প্রবেশমাত্র, প্রায় ইহাঁদিগের অনেকের মনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আত্মাভিমান উপস্থিত হয়; তাঁহারা কেহ কোন অংশে আপনাকে উৎকৃষ্ট ভাবেন। কোন ধনী আপনার অর্থাভিমানে স্ফীত হইয়া সমাগম স্থলে উদয় হয়েন। কিন্তু সামান্য লোকের ধনে, যেরূপ সাধারণের উপকার হইয়াছে, তাঁহার ধনে কখন তাহা হয় নাই। সুতরাং তাঁহার সে ধনাভিমানকে কেহই গ্রাহ্য করে না। কেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদের অভিমানের সহিত তথায় প্রবেশ করেন। কেহ সেই অকিঞ্চিৎকর পরিচ্ছদের নিমিত্ত তাঁহাকে সম্মান করে না। কোন ব্যক্তি নিজে যাহা হউন, বিখ্যাত লোকের সন্তান, মান্য ব্যক্তির জামাতা, সম্ভ্রান্ত লোকের ভাগিনেয় বা দৌহিত্র এই অভিমানের সহিত তথায় প্রবেশ করেন। কিন্তু কেহ তাঁহার সে অভিমানের অনুমোদন করে না। স্বয়ং বিশেষ কার্য্য না করিলে কেহ কাহাকে মান্য করে না। বিখ্যাত পুরুষের সন্তান বলিয়া অভিমান করার অর্থ কি? মনুষ্য মাত্রেই ত সেই বিশ্ব পূজ্য প্রজাপতির সন্তান। যিনি হীন বর্ণের কার্য্য দ্বারা কালাতিপাত করিয়া থাকেন, তিনিও বর্ণাভিমানের সহিত উপস্থিত হয়েন। কেহ কেহ পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য লইয়া উদয় হয়েন; কিন্তু যাঁহারা স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিবলে, এই বিশাল পৃথ্বীপত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সেরূপ বিদ্বানকে উৎকৃষ্ট ভাবেন না। কেহ কেহ উচ্চতর দাসত্বের অভিমানের সহিত প্রবেশ করেন, বাস্তবিক তিনি দাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন। সেই কথা মনে হইলে কেহ /৭০/ তাঁহার অভিমানানুযায়ী মান্য মনোমধ্যে আনয়ন করেন না। কেহ কেহ কৌলীন্যাভিমানের সহিত উদয় হয়েন। এক্ষণকার নিষ্ঠাবৃত্তি-বিবর্জ্জিত কুলীনকে কেহ অন্তঃকরণের সহিত শ্রদ্ধা করে না। বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সহিত আলাপ পরিচয় আছে সেই অভিমানের সহিত অনেকে তথায় আগমন করেন, সে অভিমানের কোন কার্য্য কারণ নাই বলিয়া সকলেই অগ্রাহ্য করেন। কেহ কেহ যৌবনাবস্থার অভিমান বলবৎ করিয়া, কেহ বা প্রাচীনাবস্থার পরিপক্কতাভিমান উপলক্ষ করিয়া উদয় হইয়া থাকেন। তথায় যুবারা, বৃদ্ধদিগকে নির্ব্বোধ অনুমান করিয়া তাচ্ছিল্য করেন এবং প্রাচীনেরাও যুবাদিগকে জ্ঞান শূন্য জানিয়া অবহেলা করিয়া থাকেন। রাজা, রায় বাহাদুর ইত্যাদি উপাধিযুক্ত মহাপুরুষেরা সমাগমস্থলে অভিমানের বিজাতীয় অবতার

লইয়া প্রবেশ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের অন্যের হিতার্থে কোন কার্য্য করিতে ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাঁহারা গ্রাম্যদেবতা ও ভিক্ষুকদিগের প্রতিষ্ঠিত দেবতার ন্যায় যথায় তথায় গড়াগড়ি যান। কেহ তাঁহাদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য দ্বারা পূজা প্রদান করেন না।

অতিপুরাকালে গায়ক বাদকের নাম উল্লেখ করিলে, সরস্বতী, মহাদেব, নারদ প্রভৃতি পরম জ্ঞানিগণের কথা স্মরণ হইয়া লোকের অচলা ভক্তি জন্মিত। এক্ষণে গায়ক বাদক বলিলে প্রায় মনে হইতে থাকে, ইঁহারা অবশ্যই বিদ্যাশূন্য ইয়ার হট্টলোক হইবেন। এই গায়ক বাদকেরা সমাগম স্থলে যে কতদূর অভিমানের সহিত প্রবেশ করেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ ব্যাপার। তাঁহারা মনে করেন, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাঁহারা যেরূপ সম্মান ও সোহাগের পদার্থ, তেমন আর কেহ নাই।

কেহ কেহ দশ বিঘা বাস্তভূমি, উদ্যানের সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষ, চণ্ডীমণ্ডপে কাঁঠাল কাষ্ঠের সারবান থামের অভিমান আন্দোলন করিতে /৭১/ করিতে সমাগম স্থলে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু কেহ তাঁহার সে অভিমানের পদানত হয় না। স্থূলতঃ সম্মান লাভের উপযুক্ত কার্য্য না করিয়া সম্মানের জন্য লালায়িত হইলে সম্মান লাভ হয় না। জানি না, আধুনিক সম্মানলোভীরা কেন মিথ্যা সম্মানের আশা করেন? কেহ কেহ সম্বাদপত্রের সম্পাদক বলিয়া কেহ বা গ্রন্থকার বলিয়া অভিমানের সহিত আইসেন। তাঁহারা প্রায় অনেকেই ছাই ভস্ম গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন এবং সম্মান চান।

একটা চন্দ্রাতপ, একখান ছাগবলির খড়্গা, একটা মৃগয়ার উপযুক্ত বন্দুক, একটা দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, একটা আকবর বাদসাহের নামাঙ্কিত মোহর ইত্যাদি দ্রব্যের দুই একটী কোন কোন পুরাতন লোকের বাটীতে আছে, সেই হেতু দর্পে তাঁহাদিগের চরণ, পৃথিবী স্পর্শ করে না। কেহ কেহ পুরাতন ঘৃত, তেঁতুল, রসসিন্দূর, বহুদিনের সুক্তাপত্র ইত্যাদির অধিকারী বলিয়া সদর্পে সমাগম স্থলে প্রবিষ্ট হয়েন।

প্রিন্স—

এক্ষণকার অনেক ব্যক্তির অভিমানের উপকরণ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা সাতিশয় কৌতুকাবহ।

অনন্তর এই সকল উল্লেখ করিয়া বাবু প্রসন্নকুমারের আত্মা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এইরূপ নানা-প্রসঙ্গ উত্থিত হইতেছে, ইত্যবসরে সেই স্বর্গীয়-স্রোতস্বতী-কূলে এক তরণী আসিয়া উপস্থিত হইল। উহা হইতে দুইটী পরম-রূপসী রমণী অবতরণ করিলেন। তাঁহাদিগের পবিত্র প্রশান্তভাব সকলকে মোহিত ও অঙ্গ-সৌরভে উপবন আমোদিত /১২/ করিল। কল্পতরু তলস্থিত মহাপুরুষ-গণের আত্মা তাঁহাদিগের প্রতি বিশুদ্ধ চিত্তে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রমণীদ্বয় বিশ্রামার্থ তৎপ্রদেশের অনতিদূরে এক মরকতময় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন তত্রস্থ সকলের নির্দ্দেশানুসারে তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাদিগকে সরল সম্বোধন ও বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, আপনাদিগের মুখকমলের অলৌকিক শ্রীদর্শনে, আমরা আপনাদিগকে দেবকন্যা অনুমান করিতেছি। এ সুকুমার দেবশরীরে ক্লেশ সহ্য করিয়া কোথা হইতে আগমন করিলেন? কোথায় কি উদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছিল; উভয়ের নাম কি? অকাপট্যে সমস্ত প্রকাশিলে আমরা পরমাপ্যায়িত হই। প্রথমা কহিলেন, আমার নাম প্রমদা, আমার এই সঙ্গিনীর নাম প্রিয়বাদিনী। আমরা উভয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা কমলযোনির নিবাসে থাকি, বিঘ্ন বিপদের শান্তি করিতে মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে গমন করি, সম্প্রতি আমাদিগের তথায় যাইবার কারণ এই,—কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে এক আবেদন পত্র বিধাতার নিকট আইসে, তাহাতে নরগণ বর্ণনা করিয়াছেন, বঙ্গের স্ত্রীজাতি এক্ষণে অবশ্য-কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে বিমুখ হইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরাই সংসার বন্ধনের মূলীভূত, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের কি ব্যতিক্রম হইয়াছে, তত্ত্বাবতের তত্ত্বাবধান করিতে কমলযোনি আমাদিগকে বঙ্গভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা সেই সমস্ত তদন্ত করিয়া আসিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া, সভাস্থ সকলেই প্রিন্সের নিকট নিবেদন করিলেন, ইঁহারা আধুনিক বঙ্গ-মহিলাদিগের ইতিবৃত্তান্ত সবিশেষ কহিতে পারিবেন, অতএব সে পক্ষে যত্ন করা অত্যাবশ্যক; তদনুসারে প্রিন্স্ যত্ন করাতে প্রিয়বাদিনী, বঙ্গরমনীগণের যথাযথ বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা দেখিয়া আসিলাম বঙ্গদেশের অনেক স্ত্রী, এক্ষণে স্নেহ ও ভক্তিশূন্য; গৃহকার্য্য, রন্ধনকার্য্য ও সন্তান প্রতিপালনে নিতান্ত অপটু; /১৩/ ইঁহারা পক্ষপাত, পরনিন্দা ও কুটুম্বজনের সহিত কলহে বিশেষ নিপুণ; ইঁহাদিগের লজ্জা ও নীতি জ্ঞানের মূলে নাটক ও নভেল লেখকেরা পুনঃ পুনঃ কুঠারাঘাত করিতেছেন।

বঙ্গদেশের স্ত্রীদিগের ধর্ম্মতরুর স্কন্ধদেশের আয়তন বৃহৎ, নতুবা এতদিনে ঐ কুঠারাঘাতে নিপতিত হইত। এই স্ত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমতী, তাঁহারা পতিকুলাবলম্বিনী।

এক্ষণে বঙ্গের নারীরা স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিলে সন্তুষ্ট হয়েন না। পূর্ব্বে প্রাচীনা স্ত্রীরা তীর্থস্থানে যাইতেন, যুবতীরা অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার যুবতীরা না গমন করেন এমন স্থানই নাই। ইহাঁরা পূর্ব্বকালের ন্যায় ভগিনীপতিদিগের প্রতি সাংঘাতিক পরিহাস করেন না। যাতৃ, ননন্দৃ ও ভ্রাতৃ-জায়ার সহিত পূর্ব্ববৎ মনান্তরের কার্য্য করিয়া থাকেন। অসার স্বামীর কর্ণে এ, ও, তা বলিয়া অন্য পরিজনের প্রতি দ্বেষ জন্মাইয়া দেন। ইহাঁরা বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে কেবল নভেল নাটক প্রভৃতি সামান্য পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানোন্নতির পরিবর্ত্তে দুর্ম্মতি, কদাচার, ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি করিতেছেন। রমণীর নাম অবলা ও সরলা ছিল, এক্ষণকার স্ত্রীরা মুখরা ও কুটীলা হইয়াছেন। ইহাঁরা পরিবারের মধ্যে কেবল স্বামী, পুত্র, কন্যাদিগকে আপন বলিয়া জানেন। কেহ কেহ মাতা ও ভ্রাতাকে কি জামাতাকে প্রতিবেশীর ন্যায় ঘনিষ্ঠ দেখেন, অপরের প্রতি তাঁহাদিগের দয়া দাক্ষিণ্য কিছুই নাই।

একত্র সহবাস জন্য নিঃসম্বন্ধীয় লোককে আপদগ্রস্ত ও সন্তাপিত দেখিলে তখনকার স্ত্রীলোকের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইত, সে সময় আর নাই। পিসী, মাসী, ভগিনী, যাতৃ, ননন্দৃ, ভ্রাতৃ-জায়া সকলে এক্ষণকার স্ত্রীলোকের সমক্ষে পীড়িতা হইতেছে, লোকান্তর হইতেছে; চাক্ষুষ দেখিলেও তাঁহাদিগের কিছুমাত্র করুণার উদয় হয় না। তুল্য /৭৪' সম্বন্ধ স্বজনের প্রতি ইতরবিশেষ ও পক্ষপাত করা ইহাঁদিগের নূতন একটী স্বভাব হইয়াছে, ইহা নিতান্ত নীচ কার্য্য। যে হেতু ঐ পক্ষপাতিত্ব পাপে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর স্বর্গারোহণ কালে অধঃপতন হইয়াছিল। আবার জিজ্ঞাসিলে স্পষ্টাক্ষরে বলেন, এরূপ ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে গাভী অধিক দুগ্ধ দেয়, তাহাকে অধিক যত্ন করা যায়। হা! একথা উল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। তাঁহারা সকলেই আশা করেন যে সকলে তাঁহাদিগকে ভাল বাসেন, কিন্তু আজ কাল ভাল বাসার কাজ তাঁহারা কিছুই করেন না। ইহাঁরা কোন অলঙ্কারই ব্যবহার করেন না। অথচ স্বামীকে দায়গ্রস্ত করিয়া নানা প্রকার অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া থাকেন। অলঙ্কার সংগ্রহের ফল কি কহিব, তাহা প্রস্তুত উপলক্ষে যত টাকা ব্যয় হয়, অর্দ্ধেকেরও অধিক প্রতারক স্বর্ণকারের ভোগে আসে। স্বামীর ধন এরূপ অনর্থক নষ্ট

করিয়াও তাঁহারা সোহাগিনী হইতে চাহেন। আগন্তুককে আদর আহ্বান ও যত্ন করা ইহাঁদিগের ইচ্ছা নয়। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ এত নির্ব্বোধ যে, পতি পুত্রের উপর যেরূপ বিক্রম প্রকাশ চলে, অপরের প্রতিও সেই রূপ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হয়েন। ইহাঁরা অনেকেই অর্দ্ধেকের অধিক মিথ্যা কথা কহেন এবং নিজের স্বভাব জানেন, সেই জন্ম অন্যের কথায় প্রত্যয় করেন না। ইহাঁদিগের খেলা ও হাসির ইচ্ছা কখন পরিপূর্ণ হয় না। ইহাঁরা উড়ে বেহারার ন্যায় শান্ত লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করেন ও অশান্ত লোকের নিকট বিনীত থাকেন। বিনয় করিলে বক্র এবং তাড়নায় সরল হয়েন।

এক্ষণের স্ত্রীলোকেরা অতি সুবোধ শোনা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার কিছুই দেখিলাম না। সুবুদ্ধির মধ্যে আপনাদিগের সুখবিস্তারের চেষ্টাই অধিক। ইহাঁরা অদ্যাপি পুরুষের সম্মুখে বিচরণ ও ভোজন করেন না, করিলেই বা দোষ কি, এই আন্দোলন চলিতেছে। পতি /৭৫/ পুত্র গুরুজন সত্ত্বেও ইহাঁরা জামাতা ও বধূ মনোনীত করিয়া কন্যা পুত্রের বিবাহ দিবার কর্ত্রী হইয়াছেন। ইহাঁরা অনেকে সংসার চালাইবার সমস্ত মাসের ব্যয় স্বামীর নিকট হইতে বুঝিয়া লইয়া সংস্থান জন্য সকল পরিবার ও পরিচারকদিগকে অন্নকষ্ট দেন। আপনারা যতই রূপ গুণ মাধুর্য্য বিবর্জ্জিতা হউন, অপর নারীর যৎকিঞ্চিৎ রূপ গুণ মাধুর্য্যের ব্যতিক্রম দেখিলেই তাহার প্রতি কটাক্ষ করিতে ত্রুটি করেন না।

এক্ষণকার স্ত্রীলোকেরা সোদামিনী বসু, কৃষ্ণকামিনী দত্ত, শরৎসুন্দরী মুখোপাধ্যায় এইরূপে আপনাদিগের নাম লিখিয়া থাকেন। শুনিলে ঐরূপ নাম স্ত্রী কি পুরুষের এমন কোন মতে বুঝা যায় না। সোদামিনী বসু শুনিলেই সহসা বোধ হয় যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ জাতির গুণ, ধর্ম্ম, ও মূর্ত্তি বিশিষ্ট এক প্রকার অলৌকিক জন্তু; সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে থাকে, ইহাঁদিগের বাস স্থান পিঞ্জর ও খাদ্য তৃণ পত্রাদি হইতে পারে।

ইহাঁরা রোগ গোপন রাখেন, তাহা উৎকট না হইলে প্রকাশ করেন না। দ্বেষ হিংসা সম্বন্ধে কেবল আপনার সপত্নীর প্রতি ইহাঁদিগের সপত্নী ভাব নহে, প্রায় স্ত্রীলোক মাত্রেরই প্রতি ইহাঁদিগের সপত্নী ভাব। ইহাঁরা যৎসামান্য কারণে ক্রন্দন করেন। প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা তত্তৎ নবীনাবস্থার মনের গতি এককালে বিস্মৃত হওয়াতে নবীনারা আপনাদিগের বয়সের উপযুক্ত সন্তোষজনক কার্য্য করিলে তাঁহারা নিতান্ত তীব্র ভাব প্রকাশ করেন। স্ত্রীলোকেরা যখন যাহার সমক্ষে থাকেন, তখন তাঁহারই আপনার জন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু

অসাক্ষাতে ইহাঁদিগের মনের ভাব অন্যরূপ ; স্ত্রীদিগের অর্থ প্রায় নিঃসম্পর্কীয় লোকের ভোগজাত হয়।

স্ত্রীলোকেরা কতকগুলি স্নানের ঘাটে একত্রিত হইলে অনেক পুরুষের /৭৬/ কথা উত্থাপন করিয়া, তাঁহারা কে উত্তম, কে অধম, তৎসম্বন্ধে একটা মীমাংসা না করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন না। ইহাঁদিগের মধ্যে ঘোর পাপীয়সীরা অনায়াসে পতিকে নিন্দা ও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। পরিবারস্থ পুরুষ পক্ষ সকলের আহার হইবার অগ্রে তখনকার স্ত্রীলোকেরা জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না। এক্ষণে যার পর নাই স্বামীর আহারের পূর্ব্বেও অনেক স্ত্রী উদর শীতল করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে থাকেন।

স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুঃখভাগিনী, ইহাঁরা যে পুত্রাদিকে স্তন্যপান করান, যাহাকে প্রাণপণ-যত্নে লালন পালন করেন, হায়! কালক্রমে তাঁহাদিগকে সেই পুত্রাদির ভ্রূকুটির অনুবর্ত্তিনী হইতে হয়। ভদ্র বংশজ রমণীরা, পুরুষ পরিবারের পরিচর্য্যায় দিনযাপন করেন। পুরুষদিগের প্রাণ রক্ষার প্রতি লোকে যতদূর যত্ন পান, নারীদিগের রক্ষার্থে কেহ ততদূর যত্ন করেন না। হিন্দু স্ত্রী যে দুঃখ সহ্য ও সম্বরণ করেন, তাহার শতাংশের একাংশও সহ্য করিতে হইলে পুরুষেরা উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন।

হিন্দু গৃহস্থের গৃহিণীরা নানাবিধ পরিচারকের কার্য্য করেন, তথাপি নিষ্ঠুর স্বামীরা তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। অনেকানেক মহাপুরুষ আপনার আমোদ প্রমোদ সুখ সম্ভোগেই নিয়ত রত থাকেন। পূজনীয়া জননী, কি সহধর্ম্মিণী বনিতার ক্লেশ নিবারণ করা দূরে থাকুক, মাসান্তরেও একবার তাঁহাদিগের দুঃখের কথা স্মরণ পথে আনেন না।

"ব্যঞ্জন অধিক লবণাক্ত হইয়াছে, দুগ্ধ ঘনীভূত করা হয় নাই, অন্ন উষ্ণ নাই, আলোকাধার পরিষ্কার হয় নাই, মশারিতে মশা প্রবেশ করিয়াছে, পানীয় জল শীতল হয় নাই," ইত্যাদি উপলক্ষ করিয়া অনেক পুরুষ অন্তঃপুরবাসিনী-দিগের প্রতি কর্কশবাক্য ও বিকৃত বিজাতীয় বদনভঙ্গী দ্বারা অশেষ প্রকার বিভীষিকা দেখান। স্ত্রীরা যেন /৭৭/ পাষাণময়ী ; সমস্ত দিন সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহাদিগের শ্রম অথবা আলস্য হয়, ইহা নিষ্ঠুর পুরুষদিগের মনে সংস্কার নাই। জননীর পীড়া হইয়াছে, পিতা মরণাপন্ন, পিত্রালয়ে যাইয়া তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করা কন্যার অবশ্য কর্ত্তব্য ; অনেক মহাপুরুষ স্বামী হাকিমি ফলাইয়া স্ত্রীকে পিত্রালয়ে যাইতে দেন না। স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত

উপদ্রব করাতে অনেক পুরুষ পরে তাহার প্রতিফল ভোগ করেন, তথাপি তাঁহাদিগের চৈতন্য জন্মে না। স্ত্রীদিগের ইতিবৃত্তান্ত কমলযোনির নিকট এই রূপ সবিস্তর কহিব, তিনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

বর্ব্বর-স্থান

অতঃপর কালীপ্রসন্ন সিংহ কিশোরীচাঁদকে সযত্নে বর্ব্বর-স্থানে লইয়া চলিলেন।

কিশোরীচাঁদ বর্ব্বর-স্থানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্কন্ধে গুরুভার দ্রব্য, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন। বহুমূল্য মুক্তা ভস্ম করিয়া তাম্বুলের জন্য চূর্ণ প্রস্তুত হইতেছে। কেহ কেহ পা'ড় ছিঁড়িয়া ঢাকাই বস্ত্র পরিয়াছে, কারণ পা'ড়ের কাঠিন্য কটিদেশ সহ্য করিতে পারে নাই। এক স্থানে কুটুম্ব-ভবনে তত্ত্ব যাইবে, তদর্থে স্তূপাকার মূল্যবান বস্ত্র ও খাদ্য আসিয়াছে। এক এক জন পিতৃতুল্য মান্য লোকের সম্মুখে ধূম পান করিতেছে। কেহ কেহ অকারণে দিবাবসানে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে। কেহ কেহ অল্পবুদ্ধি স্ত্রীর সহিত সংসার নির্ব্বাহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা স্থির /৭৮/ করিতেছে। কেহ বা কলকণ্ঠ পক্ষী সমূহ গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ রাখিয়া তাহার স্বরে শ্রবণ রঞ্জন করিতে বৃথা চেষ্টা পাইতেছে, যে হেতু তাহারা বনের স্বরে গৃহে ডাকিতেছে না। পরিশোধ করিবার কোন উপায় নাই জানিয়াও, কেহ কেহ অলঙ্কার বিক্রয় না করিয়া বন্ধক দিতে চলিতেছে। কেহ কেহ ভোগ বিবর্জ্জিত হইয়া কঠিন পরিশ্রমার্জ্জিত ধন পরের ভোগের জন্য সঞ্চয় করিতেছে। কেহ কেহ উকীলের করাল হস্তে পড়িবার উদ্যোগে আছে। কেহ কেহ বা মিথ্যা ভয় ও চিন্তার অনুগত হইয়া ক্লেশে কাল যাপন করিতেছে। কেহ অপরীক্ষিত নিয়মাবলম্বন, অজ্ঞাত ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন ও দেহের প্রতি নানা প্রকার স্বাধীনতা ব্যবহার দ্বারা রুগ্ন হইতেছে। কোন ব্যক্তি অনায়ত্ত ও পরকীয় স্থানে পরের সহিত দ্বন্দ্ব কলহ করিয়া অবমানিত হইতেছে। কেহ বা যাকে তাকে প্রত্যয় করিয়া বিষম বিপদে পড়িতেছে।

অবস্থানুযায়ী ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া কোন স্থানে কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা পত্তন দিয়া অসম্পূর্ণাবস্থায় রাখিয়াছে। অর্থাভাবে কেহ ছাদ, কেহ বা দ্বার ও বাতায়ন প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং চূর্ণ বালুকার কার্য্য করিতে পারে নাই, ব্যবহারের যোগ্যও হয় নাই, স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট বৃক্ষ মূল সঞ্চার করিতেছে, ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অথচ কোন প্রকোষ্ঠে, বাতায়নে কাচ বসিতেছে, প্রাচীর নানা বর্ণে রঞ্জিত হইতেছে।

কেহ কেহ পিতার কায়ক্লেশের উপার্জ্জিত সঞ্চিতধনে অশ্ব, যান ক্রয়, অলভ্য বাণিজ্য ও গো-কুল-খণ্ড সদৃশ সহচরদিগের উদরপূর্ত্তি করিয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। কেহ কেহ অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া রাজস্ব দিতে অপারক হওয়াতে পৈতৃক সম্পত্তি অপচয় করিতেছেন। তাঁহাদিগের অনেকের বর্ণজ্ঞান নাই, ইংরাজী সংবাদপত্রের বিপরীত /৭৯/ দিক নয়নাগ্রে ধরিয়া পাঠ করা ছলে প্রকাণ্ড শকটারোহণে গমন করিতেছেন।

কেহ কেহ দিগন্তব্যাপী এক এক উদ্যান বহু সহস্র মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে শত শত উদ্যানপাল কার্য্য করিতেছে, দেশ দেশান্তর হইতে ফল ফুলের বৃক্ষ আনাইয়া তাহাতে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী যাহা জন্মিতেছে, তাহা উদ্যানপালেরা গোপনে আত্মসাৎ করিতেছে, কেবল দুই একটা পুষ্পগুচ্ছ, দুই একটা অপক্ব কদলী তাহারা বাবুর বাটীতে আনিতেছে। বাবু তাহা পাইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া দর্শনান্তে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইতেছেন।

কেহ কেহ প্রতিবেশী অথবা স্বজন পরিবারের সহিত কলহ জনিত ক্রোধ চরিতার্থ হেতু আপন গৃহের তৈজস পত্র ভাঙ্গিয়া ও বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া স্তূপাকার করিতেছে। কোন স্থানে অনেকে বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া কার্য্যের প্রার্থনায় কায়মনের সহিত ক্ষমতাবিহীন পদাভিষিক্ত লোকের উপাসনা করিতেছে। অকিঞ্চিৎকর সুখসেব্য মুষ্টিযোগ ঔষধে অল্পকালে রোগমুক্ত হইবেন, আশা করিয়া অনেকে অল্পকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছেন।

আর এক জন বাবু দিবাভাগে বাইনাচ ভাল লাগে না, অথচ দিবা ভিন্ন তাঁহার নাচ দেখিবার সাবকাশ না থাকায়, তিন চারিটা চন্দ্রাতপ উপর্য্যুপরি তুলিয়া দিবাকে যামিনীতুল্যা তামসী করিয়া প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা সংস্থাপন পূর্ব্বক নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তিনিই সত্বর জোয়ার আনাইবার জন্য নাবিকের উপর বিষম ধুমধাম্ করিয়াছিলেন। তিনিই কর্দ্দের পরপৃষ্ঠায় যে ইজা শব্দ লেখা থাকে, তাহার অর্থ কি না জানিয়া তাঁহার অধিকার সম্বন্ধীয় প্রজার রাজস্ব বক্রির কর্দ্দ দৃষ্টে ইজাকে হাজির করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। /৮০/

আর একজন বাবুর নিকট তাঁহার কর্ম্মচারী আসিয়া কহিল,—ধর্ম্ম অবতার! মৃত কর্ত্তামহাশয়ের শ্রাদ্ধদ্রব্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, একবার আসিয়া দৃষ্টিপাত করুন। ধর্ম্মাবতার হস্তে শ্রাদ্ধের তালিকা লইয়া আগমন করিলেন। সমস্ত দ্রব্যাদি মিলাইয়া লইলেন, অবশেষে দক্ষিণা ছ-টাকা লেখা

ছিল, তাহা দেখিয়া কর্ম্মচারীকে কহিলেন,—ওহে! দক্ষিণা ক্রয় করিতে বিস্মৃত হইয়াছ? দেখ, যেন দক্ষিণা মূল্যময় না করিতে হয়!

কোন স্থানে গোলায় আগুণ লাগার দিবসের রিপোর্ট, তাহার দুই মাস পরে বিচারপতিরা শুনিবার সাবকাশ পাইয়া আজ্ঞা-লিপিতে অধীনকে লিখিতেছেন,—অগ্নি নিভাইয়া দিবে।

কোন বিলাতীয় বণিক্‌কে তাঁহার বঙ্গবাসী কর্ম্মচারী বুঝাইয়া দিতেছেন, আমদানীর ডাঁবা রৌদ্রে শুখাইয়া ভার লাঘব হইয়াছে।

এক স্থানে একখান পতিত বোল্‌তার চাকের চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিয়া শত শত লোক দণ্ডায়মান, উহা কি বস্তু কেহই স্থির করিতে পারিতেছে না। বর্ব্বর-দিগের মধ্যে লালবিচক্ক নামে এক প্রাচীন তাহা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া কহিলেন,—

"লালবিচক্ক সবকুচ জানে আর না জানে কই।
পুরাণচাঁদ গেরপড়া হায় ওছমে ধরা হায় উই॥"

বাদী চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে টাকা দিয়াছিল শুনিয়া, বর্ব্বর-স্থানের কোন বিচারপতি সাক্ষ্য হেতু চণ্ডীমণ্ডপকে হাজির করণার্থে হুকুম দিলেন—"চণ্ডীমণ্ডপকো বোলাও।"

একজন বিদেশে কর্ম্ম করিতেন। পাঁচ-সাত বৎসর পরে এক এক বার বাটীতে আসিতেন। ইতঃপূর্ব্বে যে সময়ে বাটীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বনিতার গর্ভ-লক্ষণ দেখিয়া যান এবং স্ত্রীকে অনুমতি করিয়া যান, গর্ভে সন্তান হইলে যেন তাহার রামজয় নাম /৮১/ রাখা হয়। উক্ত গৃহস্থ এক্ষণে পাঁচ বৎসর পরে বাটীতে আসিয়াছেন; তাঁহার বনিতার সেই গর্ভে যে সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, তাহার তত্ত্ব তল্লাস কিছুই না লইয়া বাটীতে আসিয়া আমার রামজয় কোথায় রামজয় কোথায় এই অন্বেষণেই ব্যস্ত হইলেন। পরে রামজয়কে দেখিতে না পাইয়া রামজয় রামজয় বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল।

বর্ব্বর স্থানের এক মহাত্মা অতি প্রত্যুষাবধি স্নানের ঘাটে বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব রাত্রে চোরে তাঁহার গৃহ হইতে দ্রব্য লইয়া স্নেচ্ছ স্থান দিয়া প্রস্থান করিয়াছিল, সে শুদ্ধ হইবার জন্ম সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিলেই সেই সুযোগে তিনি তাহাকে ধৃত করিবেন।

কোন স্থানে রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মযাজকেরা উচ্চৈঃস্বরে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন ও অপরকে সেই ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে যত্ন পাইতেছেন।

সুস্বাদ লাউ জন্মিবে এই আশা করিয়া তাহার বীজ কেহ কেহ দুগ্ধে ভিজাইয়া রোপণ করিতেছে।

আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই এমন ব্যক্তিরা স্ত্রীদিগকে স্বাধীনতা দিবার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত আছেন।

কেহ কেহ কার্য্য সুলভ জন্য পূর্ব্বদিন গাভীকে অম্ল পান করাইয়া দিতেছেন, যেহেতু পর দিবস দোহন করিলে এক কালেই দধি নির্গত হইবে।

কোন কৃষকের একান্ত বাসনা ছিল যে, সে সময় পাইলে ও বিষয়াপন্ন হইলে সোণার কাস্তে গড়াইয়া তাহাতে ধান্যচ্ছেদন করিবে, এক্ষণে সেই সময় পাইয়া সে এক সোণার কাস্তে হস্তে করিয়া ধান্যচ্ছেদনার্থে চলিয়াছে।

এই স্থানে একজন প্রাচীন বর্ব্বর তাহার চতুর্দ্দিগে কতকগুলি /৮২/ যুবাকে আহ্বান করিয়া কহিতেছেন—ওহে যুবাগণ! তোমরা কিছুই দেখিলে না, কিছুই শুনিলে না. আমি লোকান্তর গত হইলে তোমাদিগের যে কি দশা হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। এই বেলা মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ কর, সকলে স্মরণ রাখিও।—

কন্দর্প এক গৌরবর্ণ রূপবান্ পুরুষ ছিলেন; দ্রৌপদীর স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ ছিল; কর্ণ ভীষ্মদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র হিড়িম্বা রাক্ষসীকে সংহার করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ও বভ্রুবাহনে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। বঙ্গবাসীরা ইংরাজদিগের নিকট নাটকাভিনয় শিক্ষা পাইয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের শাপে গঙ্গা দ্রবময়ী হয়েন। ভগবতীর গর্ভে কার্ত্তিক গণেশের জন্ম হইয়াছিল। বানর লাঙ্গুলভ্রষ্ট হইয়া নরজাতি হইয়াছে। উত্তরাঞ্চলের ধাতুবৃক্ষে প্রকাণ্ড পরিসর তক্তা প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের ভীষণ কল্লোলের শব্দে ভীতা হওয়াতে পুরীতে সুভদ্রা দেবীর হস্তদ্বয় তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়াছে। বিষ্ণু ও মহাদেবে বিবাদ হইয়াছিল, তদুপলক্ষে বিষ্ণুর করনিষ্পীড়নে মহাদেবের নীলকণ্ঠ হইয়াছে। রাবণের শাপে গণেশের গজমুখ হইয়াছে। অধিক কথা তোমরা স্মরণ রাখিতে পারিবে না, সে সকল বলা বৃথা। ভারতের আর কিছু নিগূঢ় জানিবার ইচ্ছা হইলে আধুনিক এক ইংরাজের ভারত-ইতিহাস পাঠ করিবে, তাঁহার নাম আমি গোপনে তোমাদিগকে বলিয়া দিব।

কালীপ্রসন্ন ও কিশোরীচাঁদ বর্ব্বর-স্থানে গমন করিলে প্রিন্স দুঃখিত মনে বলিলেন ;— /৮৩/

বঙ্গের উন্নতি হইতেছে,—বঙ্গের উন্নতি হইতেছে ! এ উনবিংশ শতাব্দী,—এ অদ্ভুত উন্নতির সময়। ইত্যাকার চীৎকার বহুদিনাবধি আকাশ ভেদ করিয়া সুরলোকে উত্থিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি ইউরোপ খণ্ডে হইতেছে, বঙ্গের সহিত তাহার কোন সংস্রবই দেখিতে পাই না। আপনাদের নিকট বঙ্গের যৎকিঞ্চিৎ উন্নতির পরিচয় পাইলাম, তদ্ভিন্ন সকলই ত তাহার অবনতির চিহ্ন, ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহা উন্নতি বলিয়া মানিতেছেন, তাহা উন্নতি নহে। তাঁহারা বারিভ্রমে মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ করিতেছেন,—রত্নভ্রমে জলন্ত অঙ্গারে হস্ত প্রদান করিতে যাইতেছেন। বারি নহে, উত্তাপের শিখা,—রত্ন নহে, জলন্ত অঙ্গার, তাহা বোধ হইতেছে না।

বিশুদ্ধভাবাপন্ন, বিদ্বান্, রাজা রাধাকান্ত[১], হিন্দুহিতার্থী করুণানিধান রামগোপাল[২], অপ্রতিহত-সাহসযুক্ত হরিশ্চন্দ্র[৩], ধন্বন্তরী তুল্য ডাক্তার দুর্গাচরণ[৪], সদানন্দ আশুতোষবাবু[৫], উদারস্বভাব দানশীল প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও মতিলাল শীল, পরমজ্ঞানাপন্ন শ্রীরাম[৬], জয়নারায়ণ[৭], কাশীনাথ[৮], গোলোকচন্দ্র[৯], গঙ্গাধর[১০], হলধর[১১], প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দ যখন বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তখন তাহার মঙ্গল, তাহার উন্নতির আশা আর কি আছে ! সদাশয় ডেবিড্ হেয়ার সাহেব, সর্ লরেন্স পীল, ডাক্তার জ্যাকশন, বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন ; কোলব্রুক, জোন্স ও উইলসন বঙ্গে বর্ত্তমান নাই ; কে বাস্তবিক উন্নতি, কে বঙ্গের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন, কে বিঘ্ন শান্তি করিতে এক্ষণে অগ্রসর হইবেন। শুনিতেছি পীল মর্টন টর্টন ডিকেন্স অভাবে বিচার সংক্রান্ত বিপদ নিবারণের পথ এক প্রকার রোধ হইয়াছে ; বঙ্গের উন্নতি হইবার হইলে নিদারুণ নিষ্ঠুরদিগের হস্তে গিয়া অত অর্থ আবদ্ধ হইত না। বঙ্গের বিদ্যোন্নতি হইবার হইলে বঙ্গবাসীরা কেবল ইংরাজীভাষা আলোচনা

১ রাধাকান্ত দেব ২ রামগোপাল ঘোষ ৩ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ আশুতোষ দেব ৬ শ্রীরাম তর্কালঙ্কার / শ্রীরাম তর্কবাগীশ (?) ৭ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ৮ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ৯ গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১০ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ১১ হলধর তর্কচূড়ামণি / হলধর ন্যায়রত্ন (?)

করিয়া ক্লান্ত হইতেন না, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সংক্ষিপ্ত /৮৪/ গ্রন্থাংশ পাঠের নিয়ম বলবৎ হইত না; বঙ্গের মঙ্গল চিহ্ন হইলে পিতা মাতা গুরুজনকে অবহেলা ও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে নিদারুণ ক্লেশ দিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিত না; কৃষি বাণিজ্যের প্রতি অনুৎসাহ ও দাসত্বের প্রতি বিষম আগ্রহতা হইত না; কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও সম্বন্ধ সংক্রান্ত প্রণয়ের ক্রমশঃ অভাব ও স্ত্রী-জাতিতে মমতার অপ্রতুল হইত না; গুরুতর সুখ ভোগের লালসা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বদাই অর্থাভাব হইত না। কোথায় বঙ্গদেশের মঙ্গল, কোথায় উন্নতি? শুনিয়াছি বঙ্গ এতদূর দুঃখের স্থান হইয়াছে যে, ত্রিংশত বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ করিতে না করিতে লোক শীর্ণ জীর্ণ ও সংসারের বিঘ্ন বিপত্তিতে বিপন্ন হইয়া মৃত্যু প্রার্থনা করে; উল্লাসের আনন্দের চিহ্ন আধুনিক বঙ্গীয়লোকের মুখমণ্ডলে দেখা যায় না; তাঁহাদের সর্ব্বদাই নিরানন্দ, সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধচিত্ত।

কোথায় বঙ্গের গুণগৌরব বঙ্গের যশঃ সৌরভ বিবরণ শুনিয়া হৃদয় প্রফুল্ল হইবে, কোথায় আজ তাহার সন্তানগণের দাসত্বকার্য্য, নীচত্ব স্বীকার, হেয় অনুকরণ কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহাদিগের দেহ, শক্তি, আয়ু, স্বজন স্বজাতির প্রতি প্রকৃত প্রণয়ের হ্রাস ইত্যাদির পরিচয় পাইয়া এমন চিত্তবিনোদন সুরলোকের উদ্যানেও আমার বিপুল মনস্তাপ উদয় হইল, তাঁহাদিগের শরীরে আর্য্যজাতির রুধির সত্ত্বে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পিতৃ মাতৃ ভক্তি স্বদেশ স্বজনের প্রতি কি প্রকারে ঔদাস্য জন্মিল, হে বিশ্বেশ্বর! সকলই তোমার ইচ্ছা, যেমন তুমি আমাকে অদ্য কয়েকজন পরম প্রীতিভাজন ব্যক্তির আত্মার সহিত সন্দর্শন করাইয়া চিত্ত পরিতৃপ্ত করিলে, সেইরূপ যদ্যপি আমি ইঁহাদিগের নিকট বাস্তবিক বঙ্গের উন্নতির পরিচয় পাইতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না, তাদৃশ আনন্দের অধিকারী হইব, আমার এমন সৌভাগ্য নহে; হে পরমাত্মা! একবার তোমার /৮৫/ করুণাপূর্ণ দৃষ্টি অনাথিনী বঙ্গভূমির প্রতি নিক্ষেপ কর, আমরা তাঁহাকে অপ্রমত্ত সরল সুধীর সুসন্তান-বৃন্দে পরিবেষ্টিতা, তাঁহাকে সেই প্রৌঢ়াবস্থায় বিমল বেশবিন্যাসে বিভূষিতা দেখিয়া পরমানন্দ-নীরে নিমগ্ন হই।

অতঃপর দ্বিতীয় অধিবেশনের দিন স্থির ও পরস্পর উপযুক্ত সদালাপ হইয়া সুরলোকের সভা ভঙ্গ হইল। /৮৬/

সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ড

বিজ্ঞাপন

এক্ষণে বঙ্গসমাজে যে সকল অনুচিত রীতি পদ্ধতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কিয়দংশ প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করায় সারদর্শী বিজ্ঞগণ যথেষ্ট অনুরাগের সহিত তাহা পাঠ করিয়া বলেন, "মধ্যে মধ্যে ঐরূপ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় বিপথস্থ জনগণের অনুচিত রীতি পদ্ধতি নিবারণের যত্ন করা উচিত।" লণ্ডন নগরের বিখ্যাত লেখকেরা সমাজ সম্বন্ধে ঐরূপ বহু-সংখ্যক পুস্তক লিখিয়া সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। অনেক ব্যক্তির অনুচিত রীতি পদ্ধতি দূরে প্রস্থান করিয়াছে। আমারদিগের দেশে ঐরূপ পুস্তক উপকারী হইবে আশা করিয়া এই দ্বিতীয় খণ্ডেও সমস্ত স্বরূপ বিবরণ প্রকাশ, ও সুচারু গদ্য পদ্য লেখক মহাত্মাগণকে যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে ত্রুটি করি নাই, তাহাতে তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন হইতে পারে। যাঁহারা স্বরূপ বর্ণনাতেও বিরক্ত হয়েন, তাঁহাদিগের নিকট অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক এই গ্রন্থের আখ্যা পত্রে উদ্ধৃত মহাজন বাক্যসহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। "হিতকারী বচন সাধু বা অসাধু হউক তাহা ক্ষমার যোগ্য, যে হেতু হিতকারী অথচ মনোহারী বচন দুর্লভ।"

মহোদয়গণ আরো এই মনে করিয়া লেখকের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন যে আমি বিদেশীয় ব্যক্তি নহি, তাঁহারা যে বঙ্গমাতার সন্তান আমিও তাঁহারই সন্তান। তাঁহারদিগের ভ্রাতা, ভ্রাতাগণের অনুচিত রীতি পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমি লেখনী ধারণ করিয়াছি, সেই হেতু যেন তাঁহারা আমার প্রতি অসন্তোষ ও অস্নেহ প্রকাশ না করেন, আমি তাঁহারদিগের অত্যাজ্য বন্ধু ও তাঁহারদিগের নিকট অশেষবিধ প্রশ্রয় পাইবার অধিকারী।

দ্বিতীয়-সভাধিবেশন

অদ্য শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের রজতবর্ণ বিমল জ্যোতিঃ, প্রিন্সের স্বর্গীয়-উদ্যান আনন্দময় করিল। উপবনের পীযূষবাহিনী কল্লোলিনীতে হংসমালা শোভমান হইল। তরুপল্লবের সঞ্চালন শব্দ, পক্ষীগণের মধুর-কণ্ঠ-স্বর, শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিল। স্বর্গবাসিনী সুন্দরী কামিনীদিগের চরণালঙ্কারধ্বনি, ত্রিতন্ত্রীবীণাবাদনশব্দ, সুরলোকস্থ সভাসীনজনের চিত্ত হরণ করিল। এই সময়ে প্রিন্স্, রমণীয়-পরিচ্ছদে পরিশোভিত হইয়া, কল্প-বৃক্ষ-তলস্থিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সভ্যগণ সকলেই সমাগত হইয়া, তৃষ্ণাতুর যেমন ব্যগ্রভাবে জলধারা প্রতীক্ষা করিতে থাকে, প্রবাসীর /১/ গৃহাগমনের সম্বাদ পাইয়া যেমন তাহার পুত্র কলত্র পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর আত্মার স্বর্গারোহণ সংবাদে পরমাহ্লাদিত হইয়া সন্দর্শনার্থে অতিমাত্র ব্যগ্র হইতে লাগিলেন। ইহাঁদিগের উভয়ের আত্মা, দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তিময়ী শক্তির রসমাধুরী উপভোগ করিতে করিতে স্বর্গপথে আগমন কালে প্রিন্সের হৃদয়-রঞ্জন উপবনের উজ্জ্বল প্রভা দূর হইতে দেখিতে পাইলেন। যেমন সাত্ত্বিক মহাপুরুষেরা দূর হইতে দেবমন্দিরের ধ্বজপট দেখিয়া প্রফুল্ল হয়েন, ইহাঁরাও সেইরূপ হইলেন। শ্রান্তি দূর হইলে, এই উভয় মহাত্মা, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, বাবু রামগোপাল ঘোষ, জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতির আত্মার অনুরোধে, বঙ্গভূমির আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী দণ্ডায়মান হইয়া প্রিন্‌্কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাত্মন্! অধুনা পূর্ব্বকালের ন্যায় আত্মীয় ও অতিথিকে সময়ে সময়ে আহ্বান করিয়া আহা- /২/ রাদি করাইবার প্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। আতিথ্য কাহাকে বলে তাহা অনেকেই অবগত নহেন। পূর্ব্বে আতিথ্য এত প্রবল ছিল যে, পল্লীতে কোন অতিথির আগমন হইলে, প্রতিবাসীরা সকলে একত্র হইয়া তাহাকে কে নিজ নিবাসে লইয়া যাইবেন এ নিমিত্ত পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহ করিতেন। এক্ষণে কেহ কোন স্থানে অতিথি হয় না; যদ্যপি কাহাকেও অগত্যা অতিথি হইতে হয়, প্রতিবাসীরা তাহাকে দেখিয়া কেহ দ্বার রুদ্ধ করেন, কেহ বা তাহার দৃষ্টি পথ হইতে অন্তর্হিত হয়েন। অনেক সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিশালী ব্যক্তি মুষ্টি ভিক্ষা প্রদানে কাতর হয়েন। ভিক্ষুকের প্রতি কুপিত হইয়া বলেন "তোরা গিয়া পরিশ্রম করিয়া দিনপাত কর্"; তাহা·দিগকে যে পরিশ্রম করাইয়া আহারাদি দিবার লোক নাই তাঁহারা জানিয়াও জানেন না। কোন কোন তর্কবাগীশ বলেন পরমেশ্বর ভিক্ষুকদিগকে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন আমরা জগদীশ্বরের সেই ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য কি কারণ অবলম্বন করিব। কেহ কেহ বলেন ইংরাজেরা ভিক্ষা দেন না আমরা কেন দিব; কিন্তু ইংরাজেরা যে চেরিটেবিল সোসাইটীতে (দাতব্যশালায়) বিপুল ধন দান করিয়া ভিক্ষুকদিগকে চিরদিন ভিক্ষা দিবার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন বঙ্গবাসীরা তাহা কিছু করেন নাই তাঁহারা হঠাৎ বলিয়া উঠেন ইংরাজেরা ভিক্ষা দেন না আমরা কেন দিব? ইত্যাদি নানা কার্য্য দ্বারা আধুনিক বঙ্গবাসীরা এক প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইতেছেন; তবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের নিকট হইতে রোড্‌শেষ নামে যে কর বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহাতে ব্যক্তি সাধা- /৩/ রণের গমনাগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দেন সেই অর্থে ঐ অর্থ সঞ্চয়ীদিগের ইহ-কালের গমন সুলভ ও পরকালের পুণ্যের পথ কিছু পরিসর হয়। রোড্‌শেষ নামক কর গ্রহণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনেকে নিন্দা করেন, আমরা তাহাতে নিন্দা না করিয়া প্রশংসা করি, যেহেতু অনেক মূঢ় ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক শক্তি সত্বে লোকের কোন উপকার করেন না; কিন্তু ঐ কর সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অর্থ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পথ প্রস্তুত হইয়া সাধারণের যে উপকার দর্শে ইহাতে তাঁহাদিগের অর্থের সার্থকতা হয়। লোকে আতিথ্য বর্জ্জিত হইয়াছে ও ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেন না

ইত্যাদি নিষ্ঠুরাচারের কথা শুনিয়া দুঃখে করুণ স্বভাব প্রিন্সের দরদরিত অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। হইবেইত তাহার সন্দেহ কি, কেন না মানবদেহ ধারণ কালে তিনি দুঃখীর দুঃখ নিবারণার্থ ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবিল সোসাইটীতে এক লক্ষ টাকা সমর্পণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণকার মহাশয়েরা অনেকেই পীড়াদায়ক খাদ্যবস্তু ব্যবহার করেন; এবং প্রায় আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান মনে করেন। ইহাঁরা, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদানে একান্ত প্রোৎসাহী, প্রাপ্তযৌবনা না হইলে কন্যাগণের বিবাহদানে ইচ্ছুক নহেন। কামিনীগণকে প্রকাশ্যস্থানে লইয়া পরিভ্রমণ করাই ইহাঁদিগের প্রিয় প্রধানতম কার্য্য; এই প্রিয়কার্য্য সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা, আপনাদিগকে অবগত করাইতেছি শ্রবণ করুন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন বঙ্গদেশীয় যুবক বাবু, দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে শকটে সস্ত্রীক কলিকাতাভিমুখে /৪/ আসিতেছিলেন। প্রথমে ঐ শকটে একজন ভদ্র ইংরাজ ছিল কিছু পথ আসিতে আসিতে কোন ষ্টেসন হইতে এক দুর্ব্বৃত্ত ইংরাজ উল্লিখিত শকটে আরোহণ করিয়া বাবুর সহধর্ম্মিণীর সহিত নানাপ্রকার ধৃষ্টতা করিতে লাগিল। ভদ্র ইংরাজ, বহু কৌশলে তাদৃশ ধৃষ্টতা নিবারণ করিয়া দুর্ব্বৃত্ত ইংরাজকে এক ষ্টেসনে, শকট হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ভদ্র ইংরাজ হুগলি ষ্টেসনে শকট হইতে অবতরণ কালে ঐ বাবুর উভয় কর্ণ সবলে মর্দ্দন করিলেন এবং গমন কালে বলিলেন, "Nonsense native, you must not venture to accompany your wife in Railway carriage until you are competent enough to protect her." (নির্ব্বোধ বঙ্গবাসী, যতদিন তোমরা স্ব-বলে স্ত্রী রক্ষা করিতে সক্ষম না হইবে ততদিন এরূপ অবস্থায় গমনাগমন করিও না)।

এক্ষণকার লোকের পিতামাতার প্রতি ভক্তির, প্রতিবাসী ও জ্ঞাতি জনগণের প্রতি প্রীতি ও স্নেহের হ্রাস হইয়াছে। কুক্কুর সহবাসে, তাহার প্রতিপালন ও দাসত্ব কার্য্যার্থে অনেকেরই প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে। পরমার্থতত্বে ইদানীন্তন লোকের শ্রদ্ধার ব্যতিক্রম হইয়াছে। অনেকেই জাতিভেদের বিদ্বেষী; ইহাঁরা স্বজাতির স্বরূপ বিবরণ না জানিয়া ভিন্ন জাতির নিকট, তাহার নিন্দাবাদ করেন। স্বজাতির ধর্ম্মরক্ষা অবহেলা করিয়া কার্য্য করেন। হিন্দু-সামাজিক কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধান হেতু, ইংরাজ-সিদ্ধান্তের অনুগত হয়েন। দেশাচার, কুলাচার প্রায় আর কেহই গ্রাহ্য করেন না। /৫/

পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের মত মান্য করা, যদিও এক্ষণকার ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অযৌক্তিক কার্য্য জ্ঞান হয়, তথাপি তদ্দ্বারা পিতামাতার প্রতি যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়, তাহা অনেক আধুনিক মহাশয়দিগের ধারণাতেই আইসে না।

ইদানীং স্ত্রী-জাতিকে অনুচিত-প্রশ্রয়-প্রদান করা তাঁহাদিগের পরমব্রত, পূর্ব্বকালের ন্যায় কেহ আকস্মিক ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারেন না। এক্ষণে পূর্ব্ববৎ পরস্পরের মধ্যে পরম-পবিত্র-বন্ধুতা নাই। কেহ কাহাকে উচ্চপদস্থ করিতে যত্নবান হয়েন না।

বিলাতীয় মহাশয়েরা, পূর্ব্বে বঙ্গবাসীগণের প্রতি যেরূপ সদয় ছিলেন, এক্ষণে সেরূপ নাই।

যুবারা, প্রাচীনদিগের নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

এক্ষণে অনেক বঙ্গীয় যুবা, যেমন ইংরাজদিগের নিকট বিদ্যা লাভ করিতে-ছেন তেমনই তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের ন্যায় অহংকারিতা, নির্লজ্জতা, অমমতা, রূঢ়তা, পান দোষিতা, বিলক্ষণ রূপে শিক্ষা পাইতেছেন। যাঁহারা এইরূপ শিক্ষা পাইতেছেন, পশ্চিমদেশীয় হিন্দুরা, তাঁহাদিগকে নিতান্ত অশ্রদ্ধা করেন। ইংরাজ ভাবাপন্ন বাঙ্গালি মহাশয়দিগের এত নীচ প্রবৃত্তি হইয়াছে যে তাহা দর্শন করিলে তাঁহাদিগকে আর্য্য-বংশোদ্ভব পূজনীয় বলিয়া গণনা করা যায় না। হায়! যে জাতির রীতি, নীতি, কার্য্য কলাপ দেখিয়া, সর্ব্ব দেশের লোক, তদনুকরণে ব্যগ্র হইতেন, এক্ষণে /৬/ তাঁহারা ভিন্ন দেশীয় রীতি নীতি ক্রিয়া কলাপ অবলম্বন করিতে ব্যগ্র!

যাঁহাদিগের মন ক্ষুদ্র, কিছুমাত্র প্রশস্ত হয় নাই তাঁহাদিগের আয় বৃদ্ধি হইলে অনর্থক আপনাদিগকে প্রধান মনে করেন। মনের ভাব যাঁহার প্রশস্ত ও পবিত্র নহে, অতিরিক্ত ধনাধিকারী হইলেও কেহ তাঁহাকে প্রধান মধ্যে পরিগণিত করেন না। কিন্তু এক্ষণে অনেকে ক্ষুদ্র মনা হইয়া ধনবলে আপনাদিগকে প্রধান ভাবিয়া হাস্যাস্পদ হয়েন।

পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিবার সময় বঙ্গবাসীদিগের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ভক্তিভাবে ঈশ্বরের নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন। এক্ষণে বিপৎপাত হইলেও প্রায় কেহ ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করেন না।

পূর্ব্বে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী বণিক ও অন্যবিধ সাহেবেরা বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গবাসীর সহিত যুক্তি পরামর্শ ও তাঁহাদিগের সাহায্য লইয়া নিজ নিজ কার্য্য

নির্ব্বাহ করিতেন, সেই হেতু তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান, সুখ্যাতি ও সম্পত্তি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতেন। এক্ষণকার ইউরোপীয় সাহেবেরা বঙ্গে আসিয়া বঙ্গবাসীর পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণের পরিবর্ত্তে ইউরোপীয়দিগের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যাবজ্জীবন বঙ্গে বাস করত বঙ্গের সবিশেষ জানিতে সক্ষম হয়েন না। এই হেতু তাঁহারা অনেকেই যথেষ্ট অপমান ও অখ্যাতি লাভের সহিত ধনক্ষয় করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন।

কলিকাতায় মেও হসপিটল (চিকিৎসা-বাস), ক্যাম্বেল /৭/ চিকিৎসা বিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ান লিগ্, ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েসন, সায়েন্স য়্যাসোসিয়েসন্, আলবার্ট হাল প্রভৃতি নানা বিষয় আন্দোলনের স্থান, সম্প্রতি সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই বৎসর রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভারত দর্শন ও ভ্রমণার্থে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনোপলক্ষে অপরিমেয় মুদ্রা অগ্নি শিখায় বিনষ্ট হইয়াছে। হিন্দুকুল স্ত্রীদিগকে তাঁহার নেত্রপথে আনিয়া এক মহাপুরুষ আপন মাহাত্ম্য দিগ্দেশে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন।[১] রাজপুত্রের আগমনে কলিকাতা নগরী রাজা, নবাব, রাজ্ঞী, ভূস্বামী এবং বৈভবশালী বর্গিকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। গত খৃঃ ১৮৭৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বরে প্রিন্সের নগর প্রদক্ষিণ রজনীতে রাজপথের আলোক মালা যামিনীকে এরূপ ঔজ্জ্বল্যশালিনী করিয়াছিল যে তাহার সহিত দিবসের কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না।

প্রিন্স্, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি এল উপাধি পাইয়াছেন। সেই সময় বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভট্টমোক্ষমূলর মিত্রবাবুর উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত পাঠে চমৎকৃত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

জিরাটে পশু সংগ্রহের এক উদ্যান[২] প্রস্তুত হইতেছে। বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা, উহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক আলেখ্য ও নানাবিধ শিল্প কার্য্যের আদর্শ প্রদর্শনার্থে এক শিল্পশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তর পাড়া গ্রামে ভূস্বামী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছেন,

১ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়

২ আলিপুরের চিড়িয়াখানা (Zoological gardens)। প্রিন্স্ অফ ওয়েলস্ কর্তৃক ১লা জানুয়ারি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চিড়িয়াখানার দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

/৮/ তথায় যেরূপ বহুসংখ্যক পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্গবাসী কোন মহাশয়ের গ্রন্থালয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট কালেক্টরীতে সামান্য বেতনভুক্ কর্ম্মচারীরা, যে কোষাধ্যক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে সেই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ডেপুটী কালেক্টর মহাশয়েরা নিযুক্ত হইয়াছেন।

এক্ষণকার বিচারপতি ও ভূস্বামীরা অনেকে এতদূর ভ্রমাচ্ছন্ন যে তাঁহাদিগের বিচারালয়ের কিম্বা ভূম্যধিকারের সহিত যে যে ভদ্রজনের কোন সংস্রব না থাকে তাহাদিগের সহিত তাঁহারা বিচারপতিত্ব ও ভূম্যধিকারিত্ব প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হয়েন না।

আর এক অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর সংস্কৃত শাস্ত্রে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন তাহা প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। কলিকাতার কোন স্কুল শুস্ত বিশিষ্ট প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের প্রতি অনেক কারণ বশতঃ দেব বাহাদুরের শ্রদ্ধা না থাকাতে এক্ষণে সেই মহামতি শিক্ষকগণ প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে রাজা রাধাকান্তদেবের হিন্দু-শাস্ত্রে যৎসামান্য জ্ঞান ছিল।

উক্ত শিক্ষক মহাশয়গণের ছাত্র ও অনুগত জনেরা ঐ প্রচারকে সত্যজ্ঞান করিয়া কথাপ্রসঙ্গে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন "রাধাকান্তদেব শাস্ত্রের কি জানিতেন? তিনি একজন সামান্য শাস্ত্রব্যবসায়ীর অনুরূপ ছিলেন না।" হায়! মূঢ়দিগের কি ভয়ঙ্কর প্রলাপ!! /৯/

পূর্ব্বে প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য মহাশয়েরা কেহ কেহ কলিকাতার বাণিজ্য কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারী হইতেন। কিন্তু অধুনা প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ কোন ব্যক্তি বাণিজ্য কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারী হইতে প্রার্থনা করেন না। যেহেতু তাঁহারা নিশ্চিত জানেন, যে বিলাতীয় বণিকেরা প্রায় সকলেই বিদ্যাশূন্য ও তাঁহারা ধনগর্ব্বে কোন কৃতবিদ্য লোকের গুণের বিচার অথবা সম্মান করেন না। বিলাতীয় অর্দ্ধশিক্ষিত সাহেবেরা ও কলিকাতার ডব্‌টন ও সেন্টজেবিয়র্ কালেজ বিনেভোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন্ ও লা মার্টিনিয়র স্কুলের সামান্যরূপ শিক্ষিত দেশজ সাহেবেরা, বাণিজ্য কার্য্যালয়ের প্রধান প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহের ভার পান। তাঁহাদিগের অধীনত্ব স্বীকার করিতে হয় ইত্যাদি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ কোন ব্যক্তির বাণিজ্য কার্য্যালয়ের দিকে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না।

নবাব গণিমিঞা ঢাকানগরে স্বচ্ছ-জল-প্রদায়িনী লৌহ প্রণালী-নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় অর্থাৎ লক্ষাধিক মুদ্রা নিজ কোষ হইতে অকাতরে দান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়া হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

বঙ্গবাসীদিগের অপ্রতিহত যত্ন, গবর্ণমেণ্টের দয়া ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করাতে, স্ত্রীবধাপরাধে দ্বীপান্তরিত নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়[১] নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল কমিটীর চ্যায়ারম্যান মাজিষ্ট্রেট্ কার্কুড্ সাহেব[২], তদ্দেশীয় মান্যতম মিউনিসিপাল কমিসনর বাবু /১০/ লালচাঁদ চৌধুরীর প্রতি অতি জঘন্য আচরণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন।

কালভীন ঘাটের সম্মুখে রয়াল ইঞ্জিনিয়ার হ্যারিসন সাহেবের অনবধানতায় বারুদাগারে অগ্নিসংযোগ হইয়া স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার বিশ পঁচিশ জন ব্যক্তির সহিত দগ্ধ ও শতধা হইয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন।

দুর্গোৎসবোপলক্ষে চারিদিনের অধিক কার্য্যালয় রুদ্ধ না থাকে, এই প্রার্থনায় কলিকাতাস্থ ইংরাজ বণিকেরা, গবর্ণমেণ্টে আবেদন পত্র প্রদান করেন; কিন্তু বঙ্গবাসীদিগের প্রিয়বর সর্ রিচার্ড টেম্পল সাহেব সে প্রার্থনায় অনুমোদন না করাতে আবেদনকারীরা নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছেন।

লর্ড সেলিস্‌বরি, উপযুক্ত বঙ্গবাসী লোককে, জিলায় জজ ও মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিতে যত্নবান হইয়াছেন শুনিয়া ইংরাজ মহাপুরুষেরা এরূপ অসন্তোষ সূচক চীৎকার ও আস্ফালন করিতেছেন যে দেখিলে অনুভব হইতে থাকে যেন মেষশালায় অগ্ন্যুৎপাত হওয়াতে মেষগণ চকিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বজাতীয় শব্দের সহিত চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কোলাহল উৎপন্ন করিতেছে।

বঙ্গবাসীদিগের সহিত প্রণয় সংস্থাপন না করিলে রাজপুরুষদিগের বঙ্গদেশে কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বিচক্ষণ সর্ রিচার্ড টেম্পল তাহার লক্ষণ বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়া প্রণয় সংস্থাপন জন্য সর্ব্বদাই প্রধান প্রধান বঙ্গবাসীদিগের নিবাসে গমনাগমন করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যের বিশেষ সুখ্যাতি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। /১১/

১ দ্র. 'Nobin Chandra Banerjea and Madhav Giri Mahant', *The Hindoo Patriot*, November 1, 1873. 'The Mahant of Tarakeswar', *ibid.*, December 6, 1873.

২ Mr. Kirkwood.

দ্র. 'The Chittagong Case', *The Hindoo Patriot*, August 28, 1876.

অনরেবল বাবু দিগম্বর মিত্র সি এস্ আই, গতবর্ষে[১] উচ্চতম আদালতের সেরিফ হইয়া ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশের কেহ কোনকালে উক্ত পদাভিষিক্ত হয়েন নাই।

কাশিমবাজারবাসিনী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর দয়া দাক্ষিণ্য ও অপর্য্যাপ্ত দান, দিন দিন তাঁহার যশ, পুণ্য, সুখ্যাতি, ও রাজদত্ত সম্মান জগদ্বিখ্যাত করিতেছে। পুটীয়ার রাণী শরৎসুন্দরীর দান ধর্ম্মও অসাধারণ সকলেই স্বীকার করেন।

প্রিন্স্ আলবর্টের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে তাঁহাকে দর্শনার্থে পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতা রাজধানীতে যে যে রাজ্যাধিপতি ও নবাবের শুভাগমন হইয়াছিল তাঁহারা কেবল নিজ নিজ বৈভব প্রদর্শনার্থে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া ও বহুতর সহচর ও দাস দাসী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতার লোক বাহাড়ম্বরের স্তুতিবাদক নহে। রাজ্যেশ্বরেরা যদ্যপি দীন দুঃখী প্রত্যাশাপন্ন দিগকে কিছু আনুকূল্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাঁদিগের যশ-গৌরব প্রচার হইতে পারিত। ইহাঁদিগের মধ্যে ইন্দোরা-ধিপতি হলকার[২] শিক্ষা বিষয়ে কিছু দান করিয়া প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। অবশিষ্ট মহাশয়েরা সে পক্ষে অতি ব্যয়কুণ্ঠের ন্যায় কর্ম্ম করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। বরঞ্চ টেরিটিবাজারে যে ভিক্ষোপজীবী চটসাঁই ছিল সে ব্যক্তিও উপরি-উক্ত রাজ্যাধিপতিদিগের অপেক্ষা দান শীলতায় চিরকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছে।

সম্বাদাবলী শেষ হইলে প্রিন্স্, পণ্ডিত বেদান্তবাগীশ ও সুশীল নন্দীকে উপবেশন ও বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। পরে বাবু প্যারীচরণ সরকারের আত্মাকে সভাস্থ দেখিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বিগত সভাধি-

১ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

দ্র. 'We regard the appointment of Babu Degumber Mitter to the shrievalty of Calcutta, the first Bengali, who has been honored with the distinction, as an event of no less social than political importance. It is a noteworthy evidence of improved feeling between the ruler and ruled.' 'Retrospect of 1874', *The Hindoo Patriot*, January 4, 1875.

২ স্যার তুকোজি রাও হোলকার, দ্বিতীয় (১৮৩২-১৮৮৬), ইন্দোরের মহারাজা

বেশনে বঙ্গের আধুনিক দাসত্ব সম্বন্ধে আমি যে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি তাহা অতীব বিচিত্র, সম্প্রতি আপনি বঙ্গের আধুনিক প্রভুত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ আপনার মধুময় বাক্যাবলিতে প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয় রঞ্জন করুন।"

প্যারীচরণ বাবু প্রিন্স্ মহোদয়ের অভিলাষ পরিপূর্ণ হেতু এইরূপ কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন ;—মহাশয় শ্রবণ করুন—বলিব কি বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয় ! এক্ষণকার প্রভু মহাশয়েরা, অধীনের প্রতি প্রায় অনুকূল নহেন। তাঁহারা অনবরত তাহাদিগের প্রতি উগ্রভাব ধারণ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধনে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। অধীনেরা, সুখে কালযাপন করে, তাহাদিগের অপ্রতুল না থাকে, পীড়িতাবস্থায় পরিশ্রম করিতে /১৩/ না হয়, প্রভুদিগের এই নিয়ম ছিল। দয়াবৃত্তি তাঁহাদিগকে ঐরূপ নিয়মাবলম্বনে বাধ্য করিত। অধীন পরলোক গত হইলে তদীয় পুত্রকে কি তৎপরিবারের কোন ব্যক্তিকে কার্য্য দিয়া প্রভুরা তাহার সংসার নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিতেন, আর সেরূপ নাই। এক্ষণে যে ব্যক্তি স্বয়ং প্রভুকার্য্য নির্ব্বাহ দ্বারা শরীর জীর্ণ করিয়াছে সে অশক্ত হইলে প্রভু তাহাকে কার্য্যচ্যুত করেন , অথচ দিনপাতের কোন উপায় করিয়া দেন না। স্ত্রী পুত্রের সহিত একত্র বাস করিয়া কার্য্যস্থলে সুখে কালাতিপাত করিবে তদর্থে কলুটোলার কোন প্রভু অধীনদিগকে নগরে অবস্থিতি জন্য গৃহ নির্ম্মাণ ও গৃহ নির্ম্মাণের উপযুক্ত ভূমিদান করিতেন, কি অপরিসীম দয়ার কার্য্য !! কিন্তু ইদানীং কত লোক বৎসরের মধ্যে দুই তিন দিনের জন্য, স্ত্রী পুত্র দর্শনাভিলাষে স্বদেশ গমনবশতঃ মহামতি প্রভুদিগের নিকটে কর্ম্মচ্যুত হইতেছেন। প্রভুরা, অধীনকে স্থাবর-সম্পত্তি দান করিয়া তাহাকে ও তদীয় উত্তরাধিকারীগণকে যাবজ্জীবন জন্য প্রতিপালন করিতেন। সে সকল বিবরণ এক্ষণে উপন্যাসের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। অধীন সুখে আছে শুনিলে প্রভুরা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতেন, কিন্তু আধুনিক বিচিত্র প্রভুরা উহা শুনিলে বিমর্ষ হইয়া মনে করেন আমার সর্ব্বনাশ করিয়া এই রূপ অবস্থায় আছে। ক্রিয়া-কলাপ উপলক্ষে অধীন ব্যক্তি, জনগণকে উৎকৃষ্টরূপে ভোজন করায় সে জন্য প্রভুর বিশেষ আকিঞ্চন দেখা যাইত এবং তৎকার্য্য সুপ্রতুল জন্য তিনি অর্থের সাহায্য করিতেন। এক্ষণে সেরূপ সাহায্য /১৪/ দেখা যায় না। অধীন সপরিবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসনাভরণে বিভূষিত না থাকিলে প্রভু ক্ষুব্ধ হইতেন, এক্ষণকার প্রভুরা অধীনের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিলে অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কতই কল্পনার সৃষ্টি করেন।

অধুনা বঙ্গবাসীরাও কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে তাহাকে পূর্ব্ব প্রভুর

প্রশংসাপত্র দর্শাইতে কহেন। যে ব্যক্তি দুরাচার প্রভুর কার্য্য করিয়াছে সে তাহা দেখাইতে পারে না, এমতস্থলে তাহাকে অযোগ্য ও অপ্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী মীমাংসা করিয়া নব্য প্রভুরা স্বকীয় বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে ইংরাজী প্রথা প্রচলিত হইয়া এইরূপে কর্ম্মচারী মনোনীত করিবার নিয়ম হইয়াছে। অধীন পীড়িত হইলে, পূর্ব্ব প্রভুরা চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া তাহার বাটীতে তত্ত্বাবধান করিতে যাইতেন এবং সে ব্যক্তির যতদিন আরোগ্য লাভ না হইত ততদিনের নিমিত্ত চিকিৎসক ও পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিতেন।

মহোদয় অবগত আছেন যে স্নানের পরে দীর্ঘ কেশ শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইত এবং শুষ্ক না হইলে পীড়া জন্মিত সেই হেতু দয়ার সাগর বণিক ব্রাটু সাহেব দশম ঘটিকার পরিবর্ত্তে তাঁহার কর্ম্মচারী মৃত মহাত্মা বিশ্বম্ভর মল্লিককে কেশ শুষ্ক করিয়া দ্বাদশ ঘটিকার পরে কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে অধীন, প্রভুর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইলে আধুনিক প্রভু মহাশয়েরা ভ্রূক্ষেপ করেন না। মহোদয়! বলিব কি—এক্ষণকার প্রভুত্বের প্রলাপই বা কত? দেখিয়াছি একজন কর্ম্মচারী, প্রভুত্ব গরিমায় আলিপুরে উগ্র- /১৫/ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কার্য্যস্থলে অনড্বানের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন। বিল ছিন্ন করিতেন, আর কোন কোন বিল দূরে নিক্ষেপ করত বিকটাকার মুখ ভঙ্গী প্রকাশ পূর্ব্বক অঞ্জনা হৃদয় নন্দনের মনোহর বদনকে পরাভব করিয়া দিতেন।

অধীন সাক্ষাৎ করিতে যাইলে অনেক সামান্য-কর্ম্মচারীরাও, ডাক্তার জ্যাকশন্ ও কৌন্সিলি ডয়েন, অথবা জজ পিককের ন্যায় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার বা কথা কহিবার অবকাশ পান না। যদি দৈবাৎ কাহারও ভাগ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে তবে প্রভু দুই একটী বাক্য প্রয়োগ করিয়াই কহেন "আমার সময় অতি অল্প আর বিরক্ত করিও না—স্বস্থানে প্রস্থান কর।" ধন্যরে প্রভুত্ব! তোর পদে নমস্কার! এক্ষণে প্রভুরা যে পরিমাণে অধীনদিগের উপকার করেন তদপেক্ষা শতগুণ দম্ভ করিয়া থাকেন। প্রভুরা প্রভুত্ব করিলে কথঞ্চিৎ শোভা পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রভুত্ব-প্রিয় অধীনেরা অপর-অধীন কর্ম্মচারীর উপর এরূপ অসহ্য ও অসঙ্গত প্রভুত্ব প্রদর্শন করেন যে তাহা কাহারও সহ্য হইবার নহে। প্রভুরা অনেকে এমন নির্লজ্জ যে অধীনের প্রতি পক্ষপাতের কার্য্য ও নিষ্ঠুর নির্দ্দয়ের ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। তাঁহাদিগের উচিত যে উৎকৃষ্ট

কার্য্যবিধান করিয়া অধীন জনের ভক্তিভাজন হয়েন। তাহা অনেকে করেন না। এক্ষণকার প্রভু মাত্রেই প্রায় অধীনের ঘৃণাস্পদ, ইহাঁরা বেতন দিয়া থাকেন এই প্রশ্রয়ে অধীনের প্রতি সর্ব্বদাই অহঙ্কারের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন। অসময়ে অসুস্থ অনাহারী /১৬/ অধীনকে দুর্গম স্থানে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বৈধ বোধ করেন না।

বিলাতীয় প্রভুরা অসঙ্গত-দ্রুতভাবাপন্ন। ইহাঁদিগের মন বুঝিয়া অতি দ্রুতকার্য্য নির্ব্বাহ করা কঠিন কর্ম্ম। পুরাতন রাম যাত্রার হনুমানেরা কখন কোন দিকে লম্ফ প্রদান করেন, তাহা দর্শকদিগকে দেখাইতে আলোক সংস্থাপন করা যেমন আলোকধারীর পক্ষে দুরূহ ব্যাপার, সেইরূপ দ্রুতবেগী প্রভুদিগের কার্য্যের অনুগামী হওয়া, অধীনের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে প্রভুরা উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সামান্য কিঙ্করের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অনুমতি করিতেন না। যদি কোন প্রধান কর্ম্মচারী প্রভুর সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত সামান্য কিঙ্করের কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেন, প্রভু তাহা দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। আমরা অবগত আছি কোন স্থানে একবার এক প্রভু ভৃত্যকে ডাকিয়া কহেন "ওরে—দর্পণ খান আন্" সে কিঞ্চিৎ দূরে ছিল শুনিতে পায় নাই, একজন প্রধান কর্ম্মচারী তাহা শুনিতে পাইয়া দর্পণ হস্তে লইয়া প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। প্রভু তাহা দেখিয়া কোপের বশীভূত হইয়া আরক্ত লোচনে কহিলেন "তোমার নীচ প্রবৃত্তি দেখিয়া আমি তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করিলাম। তোমার দ্বারা আমার কার্য্য চলিবে না। তুমি আমার সন্তোষার্থে সামান্য ভৃত্যের কার্য্য করিলে কেন? অতঃপর আমার অধীনস্থ কোন লোক তোমাকে মান্য কিম্বা গ্রাহ্য করিবে না। তুমি অদ্যই স্বস্থানে প্রস্থান কর।"

এক্ষণকার প্রভুদিগের সে ভাব নাই। প্রধান কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত /১৭/ হীনকার্য্য করিতে স্বীকার না পাইলে তাঁহারা তাহাদিগকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে আদেশ করেন। এই প্রভুরা নিতান্ত সত্যবাদী কর্ম্মচারী চাহেন। কর্ম্মচারীরা ভ্রম ক্রমে, বা গল্পচ্ছলে মিথ্যা কথা কহিলে তাহাদিগের প্রতি প্রচণ্ড কোপ-প্রকাশ করেন। কিন্তু বিচারালয়ে সেই প্রভুদিগের কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাঁহারা কর্ম্মচারীদিগকে আদ্যোপান্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন।

প্রভুত্বাভিমানীরা অধীনের সহিত স্পষ্টরূপে কথা কহেন না। তাহাদিগের

অস্ফুট ভাষা অধীনকে অনুভবে বুঝিয়া লইতে হয়। প্রধান প্রধান প্রভুবর্গের এখনই ধারণাশক্তি ও এমনই স্মরণশক্তি যে তাঁহারা পাঁচ সাত বৎসর রক্ষিত অধীনের নাম স্মরণে রাখিতে পারেন না ও তাহাদিগের গুণ দোষের নিরূপণ করিতে মনোযোগী হয়েন না। অধিক কি সময়ে সময়ে অধীনদিগকে চিনিতেও পারেন না।

অধীনেরা নিতান্ত নির্ব্বোধ—তাঁহাদিগের দৃঢ় সংস্কার বদ্ধমূল থাকে, ফলতঃ অধীন ব্যক্তি প্রভু অপেক্ষা শতগুণ উৎকৃষ্ট—ইহা অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে। জাতি, বংশ, সদ্গুণ ইত্যাদি বিষয়ের গৌরব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রভুদিগের নিকটে অধীনেরা সে গৌরবের অধিকারী হইতে পারে না।

অধীনের সম্মানের প্রতি এক্ষণকার প্রভুদিগের প্রায় কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি নাই। অধীন নির্গুণ, অপদার্থ, হীনবংশজাত, হীনবুদ্ধি বলিয়া অনেক মহামতি প্রভুর ধারণা আছে। কি আক্ষেপের বিষয় বঙ্গবাসী অধীনেরা সত্যবাদী নহে। তাহারা /১৮/ প্রভুর ধনক্ষয় করে ইত্যাকার সংস্কার ইংরাজ-উপাসক বর্দ্ধিষ্ণু বাবুরা, সাহেব প্রভুদিগকে জন্মাইয়া দেন। সে প্রভুরা, অধীনদিগের গুণের পরিচয় চাহেন না। অধীন, নির্গুণ হইলে হানি নাই। সে উপাসনা-পরায়ণ হইলেই প্রভুর প্রিয়পাত্র ও অধিক বেতন পাইবার অধিকারী হইতে পারে।

প্রভুত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে এক্ষণে কেহই নিরস্ত থাকিতে পারেন না। এমন কি অনেককে জ্যেষ্ঠ সহোদর, পিতৃব্য, পিতা প্রভৃতি গুরুজনের উপরে প্রভুত্ব করিতে দেখা যায়। নিরুপায় গুরুজনেরা কি করেন! উপযুক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র ও আত্মজের সন্তোষ সাধনার্থে নিম্নতলস্থ গৃহে, শকটের সম্মুখস্থ স্থানে উপবেশন করেন। কিঙ্করের অভাবে বিপণি হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিতে বাধ্য হয়েন। লোকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র ও নিজ পুত্রের জন্য সেই সকল হীন কার্য্য স্বীকার করিতে দেখিয়া কিছু মনে করিবেন সেই জন্য গুরুজনেরা সর্ব্বদাই পরিচয় দেন আমরা স্নেহবশত ও বাৎসল্যভাব প্রযুক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য উক্ত কার্য্য না করিয়া স্থির থাকিতে পারি না। কিন্তু প্রভুত্বের ভয়ে ঐ সমস্ত কার্য্য না করিলে তাঁহাদিগের নিস্তার নাই তাহা তাঁহারা জন সমাজে ব্যক্ত করেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান বলা উচিত। /১৯/

পাঠক ও শ্রোতা

প্যারীচরণ বাবু আধুনিক প্রভুদিগের ইতিবৃত্ত সমাপ্ত করিলে, সুর সভাস্থ পবিত্র আত্মাদিগের অভিলাষানুসারে পরম পণ্ডিত চন্দ্রমোহন — পাঠক ও শ্রোতাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মন্! অধুনা আমি বঙ্গদেশে যত পরিমাণে কুৎসিত রুচির পাঠক নয়ন গোচর করিয়া আসিয়াছি বোধ হয় অন্য কোন দেশের কোন মহাত্মাই তত দর্শন করেন নাই। সেই মহানুভব পাঠক মহাশয়দিগের গুণের পরিচয় কি দিব তাঁহারা বাস্তবিক কিছুই জানেন না অথচ তাঁহারা না জানেন এমন শাস্ত্র নাই, না পড়েন এমন বিষয় নাই, না আস্বাদন করেন এমন রসই নাই এবং না বলেন এমন কথাই নাই। যেমন তর বেতর আধুনিক গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হইতেছে এবং তর বেতর গ্রন্থ বাহির হইতেছে তেমনই সর্ব্বভুক্ সদৃশ অসংখ্য পাঠক মহাশয়েরা সেই সকল গ্রন্থ অম্লান বদনে উদরসাৎ করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই কিছুতেই ক্ষুধার শান্তি হইতেছে না। তাঁহাদিগের সহায়তায় গ্রন্থকারগণের সম্মান রক্ষা হইয়া থাকে।

পাঠকগণের গুণের প্রশ্রয়ে অনেকেই কবি বলিয়া অবিজ্ঞ সমাজে গণ্য হইয়া প্রাচীন কবি মহাশয়গণের পবিত্র নামে কলঙ্কার্পণ করিতেছেন। এই পাঠকগণের সহৃদয়তার কথা /২০/ কি কহিব উক্ত অশ্লীল গ্রন্থ নিচয়ের রসিকতা শিক্ষা ও রস মাধুরী পান করিয়া সানন্দে শৃগালবৎ সমস্বরে সেই সেই গ্রন্থকর্ত্তার গুণ গান করিয়া বেড়ান। কোন পণ্ডিত অথবা সুবিজ্ঞ পাঠক কি শ্রোতা যদি তৎ প্রতিকূলে কোন কথার উল্লেখ করেন তবে ক্রোধের সীমা থাকে না। যাহা মুখে আইসে তাহাই কহিয়া থাকেন, স্বমত রক্ষা জন্য পূজ্যতম বিচক্ষণ গুরুগণের মান হানি করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না। তাঁহারা বাল্যকাল হইতে প্রাপ্ত যৌবন পর্য্যন্ত যে কিছু জ্ঞানোপার্জ্জন করেন তাহা ও আপনার বহুমূল্য জীবনের একাংশ কুৎসিত নভেল নাটকাদিতে সংলগ্ন করিয়া স্বজন পরজনের উন্নতির পথে কণ্টকার্পণ করেন। অধিক কি কহিব, অনেক পাঠক নূতন পুস্তক দেখিলেই তাহা নভেল কিনা, তাহা নাটক ও ইতর ভাষাতে পরিপূরিত কিনা এই অনুসন্ধান করেন, যদি হয়, তাহা মনোযোগের সহিত পড়িতে থাকেন, না হইলে বিরক্ত ভাবে পুস্তক এক পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া রাখেন। ইহাঁরা প্রায় বাস্তবিক বিষয় পড়িতে ইচ্ছুক নহেন, মিথ্যা

ও কল্পিত আখ্যায়িকা পড়িতে পাইলে সন্তুষ্ট হয়েন। ইহাদিগের বনিতা ঠাকুরাণীরা যে পুস্তক বুঝিতে কি পড়িতে পারেন সেই পুস্তককে তাঁহারা অগ্রগণ্য করিয়া মানেন, যে পুস্তকে অনীতি ও ব্যভিচার দোষের আন্দোলন আছে পাঠকজীরা উক্তরূপ পুস্তক নিজ নিজ সহধর্ম্মিণীদিগকে পাঠ করিতে নিষেধ না করিয়া বরং প্রবৃত্তি প্রদান করেন। নাটক পাঠকেরা অনেকে আবার নীতি ও ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার উত্তমতা ও অধমতার সিদ্ধান্ত করেন। যে /২১/ পাঠকেরা পল্লীগ্রামে কৃষক মণ্ডলীর মধ্যে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারাও গ্রন্থকারের লিখন প্রণালীর বিচার করিতে উদ্যত হয়েন ও কোন পুস্তককে সমাদর ও কোন পুস্তককে অনাদর করেন। অনেক পাঠকের ভাষা জ্ঞান নাই, উৎকৃষ্ট ভাষার পুস্তক অনুধাবন করিতে সক্ষম নহেন, তদর্থে যৎসামান্য ভাষার পুস্তক পড়িতে তাঁহারা অতিশয় ভাল বাসেন, কৃষকসন্তানদিগের সহিত বাল্যকালে ক্রীড়া উপলক্ষে যে সকল ইতর শব্দ শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে উল্লিখিত গ্রন্থে সেই সকল পূর্ব্ব পরিচিত শব্দ দেখিয়া তাঁহারা পুলকে পরিপূর্ণ হয়েন। আমরা শুনিয়াছি উক্তরূপ বীভৎসরুচি পাঠকেরা কখন কখন বলেন বিদ্যাসাগরের পুস্তকে কোপাবেশ পরতন্ত্র, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় প্রভৃতি কেবল ঢেঁকির কচ্‌কচি; রাগিয়া উঠিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল ইত্যাদি কি সরল ভাষা!

মাইকেলের যেরূপ রচনার প্রণালী, যে সে পাঠক কি শ্রোতা তাহার অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু ঐরূপ পাঠক ও শ্রোতাগণের সেই রচনা পাঠ করিলে যে কি ভাবের উদয় হইয়া অশ্রুধারা বহিতে থাকে তাহা বলা যায় না। সেই অশ্রুবর্ষণ দেখিয়া আমার একটি আখ্যায়িকা স্মরণ হইল। এক দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী যবন কোন ধর্ম্মশালায় বসিয়া প্রত্যহ প্রাতে প্রায় এক ঘণ্টা কাল পারস্য পুস্তক হইতে ঈশ্বর প্রসঙ্গ পাঠ করিতেন, তাহা শ্রবণ বাসনায় তথায় শতাধিক বালবৃদ্ধ বনিতার সমাগম হইত, সকলে সেই প্রসঙ্গ, ভক্তিভাবে শ্রবণ করিত। সেই শ্রোতা /২২/ দিগের মধ্যে দশ বৎসর বয়ঃক্রমের দুইটী বালক তাহা শুনিতে শুনতে অশ্রুবর্ষণ করিত। ধর্ম্মযাজক তাহা দুই চারি দিন দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন এই বালকেরা আমার ধর্ম্ম পুস্তকের নিগূঢ় মর্ম্ম কি উপায়ে বুঝিতে পারিয়া ভক্তিভাবে অশ্রুবর্ষণ করে জিজ্ঞাসিতে হইল। পরে তাহাদিগকে ডাকিয়া যাজক জিজ্ঞাসিলেন তোমরা শিশু, আমার ধর্ম্ম পুস্তক পাঠের কি ভাব বুঝিয়া

রোদন কর। তাহারা প্রত্যুত্তর করিল মহাশয়ের পাঠ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না তবে কি জানেন, আমাদিগের একটী বৃহৎ শ্মশ্রুধারী ছাগ পশু ছিল। আপনি যে সময় শ্মশ্রু বিকম্পিত করিয়া পাঠ করেন, তৎকালে আমাদিগের সেই ছাগ পশুর কথা স্মরণ হয়, সে তৃণ ভক্ষণ কালে অবিকল আপনার ন্যায় শ্মশ্রু নাড়িয়া তৃণ ভক্ষণ করিত। আহা! অদ্য দুই মাস হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আপনার দাড়ী দোলান দেখিয়া আমাদিগের হৃদয়ে সেই ছাগ পশুর প্রতিমূর্ত্তির উদয় হয় ও তাহার মৃত্যুনিবন্ধন শোকে আমাদিগের অশ্রু সম্বরণ হয় না। আমাদিগের রোদনের কারণ এই—অন্য কিছুই নহে। মাইকেলের পুস্তক পড়িয়া অনেক পাঠক ও শ্রোতা বাবুর সেই যবন শিশুদিগের ন্যায় ভাবের উদ্রেক হইতে থাকে এবং তাঁহারা তদ্দ্বারা আর্দ্র হইয়া পড়েন। ফলতঃ মাইকেলের যেরূপ রচনা প্রণালী তাহা পড়িয়া সহসা ভাবে বিমোহিত হওয়া প্রায় অনেকের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে।

যে যে বিষয়ে জ্ঞানের অভাব আছে সেই সেই বিষয় /২৩/ পাঠ করা উচিত—তাহা না করিয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় পাঠে নিমগ্ন থাকিয়া এক্ষণে অনেক অদূরদর্শী পাঠকেরা কালক্ষেপ করেন। যে সকল বিষয় অবগত না থাকিলে নির্ব্বিঘ্ন দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না তাহা অন্তরে রাখিয়া বঙ্গদেশীয় স্ত্রীপুরুষ উভয়ই কেবল নভেল, নাটক ও উপন্যাস পাঠে এক্ষণে নিয়ত নিযুক্ত আছেন। দেহযাত্রা নির্ব্বাহ বিষয়ক পুস্তকাদি নিরন্তর পাঠে মনুষ্যের অন্তঃকরণ দুর্ব্বল হইলে নাটকাদি পাঠ করাতে মনের স্ফূর্ত্তি হইয়া বৃত্তি সকল তেজস্বিনী হয়, সেই হেতু লোকে মধ্যে মধ্যে নাটকাদি পাঠ প্রয়োজনীয় মনে করেন। এক্ষণে তাহা নহে, নাটকাদি পড়িয়া সময় থাকিলেও তাঁহারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী পুস্তকাদি পাঠও প্রয়োজনীয় মনে করেন না; ইঁহারা নাটক ও নভেলের প্রসঙ্গ পাঠ করিতে না পাইলে যথোচিত মনঃপীড়া উৎপাদন করেন। যেমন সুরা বিপণির দ্বার উদ্ঘাটিত না থাকিলে মদ্যাভাবে মদ্যপায়ীদিগের নিদারুণ মনস্তাপ জন্মিতে থাকে, নাটক পাঠের ব্যাঘাত হইলে তত্তৎ-পাঠকেরা অধুনা সেইরূপ মনস্তাপ পান। এক্ষণকার সাংসারিক মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাব সিদ্ধ একপ্রকার মনোবৃত্তি হইয়াছে যে, তাঁহারা প্রায়ই নিন্দনীয় কর্ম্মে রত হয়েন, ইত্যাকার মনোবৃত্তি সত্বেও নাটকাদি পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের সেই হীন মনোবৃত্তির উত্তেজনা কেন আরো বৃদ্ধি করিয়া দেন ভাবিয়া স্থির হয় না।

যেমন অতি উপাদেয় ফলেরও সমস্ত ভাগ খাদ্য নহে /২৪/ তাহার ত্বক্ ও বীজ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়, সেইরূপ অতি বিখ্যাত গ্রন্থেরও (সর্ব্বাংশ জ্ঞানপ্রদ নহে) যে যে ভাগ জ্ঞানদায়ক নহে, তাহা ত্যাগ করিয়া পড়িতে হয়; জ্ঞানিলোকের সহিত পাঠ্য পুস্তক আলোচনা না করিলে তাহার নিগূঢ়ার্থ উদ্ভাবন করা যায় না।

ঈশ্বরের কি বিড়ম্বনা যে পুস্তক পাঠে লোককে কুপথগামী করে, সেই পুস্তক পাঠার্থ আধুনিক অনেক লোকের প্রবৃত্তি অতি প্রবল; যে পুস্তক পাঠে সৎপথ গামী করে সে সকলের পাঠ অতি বিরল হইয়াছে।

কোন কোন গ্রন্থকার দুই এক খান পুস্তক সুচারুরূপে লিখিয়া আপনাদিগের নাম সুবিখ্যাত করিয়াছেন, আর সে প্রকার লিখিতে সক্ষম হইতেছেন না। পূর্ব্ব লিখিত পুস্তকের যশোগৌরবের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা অবশেষে যাহা মনে করিতেছেন, তাহাই লিখিয়া নির্গত করিতেছেন, যদ্যপি দীর্ঘকাল পরে এক এক পুস্তক লিখিয়া বাহির করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পুস্তক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইত; লোকেরা অনেকে, তাহা না করাতে তাঁহাদিগের লেখা উৎকৃষ্ট হয় না, যেমন যে ভূমিতে পুনঃ পুনঃ শস্য বপন করা হয় সে ভূমির ফলোৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়, ভূমি পতিত রাখিয়া দীর্ঘকাল কৃষিকার্য্য না করিলে তাহাতে উৎকৃষ্টরূপ শস্য উৎপন্ন হয় সেইরূপ বঙ্গদেশের যে লেখক একবার লিখিয়া দীর্ঘকাল হৃদয়ক্ষেত্রে আর কিছু উদ্ভাবন না করেন, পরে লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহারই লেখা /২৫/ সুচারু হয়, পাঠকেরা অনেকে সে সন্ধান জানেন না, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা লেখেন আর যে ব্যক্তি একবার উত্তম লিখিয়াছেন পাঠকেরা তাঁহারই লেখা পড়িয়া কালক্ষয় করেন। কিন্তু তাহাতে কিছু উপাদেয় বস্তু প্রাপ্ত হয়েন না। তবে কেবল দুই এক মহাত্মার হৃদয় ক্ষেত্র এত উর্ব্বর, যে তাঁহারা যখন তখন পুনঃ পুনঃ লিখিলেও তাহা অত্যুত্তম হয়। যাহা হউক পাঠক ও শ্রোতা মহাশয়েরা এক বারের সুখ্যাতি লব্ধ লেখকের লেখা পাঠে নিমগ্ন হইয়া যেন সময়কে নষ্ট ও জ্ঞানোন্নতি করিতে বঞ্চিত না হয়েন। তাঁহারা যেন বিচার করিয়া পুস্তক পড়িতে অভ্যাস করেন।

এক্ষণকার বঙ্গীয় গ্রন্থকারেরা প্রায় সকলেই অনুবাদক, ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা ভাষান্তর অথবা পুস্তকান্তরের আদ্যোপান্ত অবিকল অনুবাদ পূর্ব্বক নিজ নিজ পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগকে অনেক

পাঠকেই অনুবাদক বলেন কিন্তু উক্ত পুস্তক লেখকের মধ্যে যাহারা ভাষান্তরের অথবা পুস্তকান্তরের স্থানে স্থানের লিখন কৌশল ক্রমে অনুবাদ করিয়া আদর্শ পুস্তককে গোপনে রাখিয়া আদ্যোপান্ত স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই সেই গ্রন্থকারকে আদি রচয়িতা ভাবিয়া অনেক পাঠক স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা প্রায় সকলেই অনুবাদক, কেহই আদি রচয়িতা নহেন। /২৬/

চন্দ্রমোহন প্রিন্সের অনুমতি লইয়া কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন—মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিষয়ক পুস্তক প্রণেতা[1], বোধ হয় ইদানীন্তন কালের লেখকদিগের মধ্যে কেবল আপনার পরিচিত আত্মীয় কএক জনের রচনা বাহুল্য রূপে সমালোচন করিয়াছেন। অনেক অগ্রগণ্য লেখকের সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। আমি সেরূপ না করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত অগ্রগণ্য সুলেখক ও কুলেখকের গ্রন্থ রচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। এ সুরলোক, এ স্থানীয় সকলেরই, মনুষ্য জাতির প্রত্যেকের সহিত সমান সম্বন্ধ, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় কেহ তাঁহাদিগের আত্মীয় অনাত্মীয় নহে। ইহাঁরা কোন কোন লেখককে ভয় অথবা কোন কোন লেখকের নিকট কোন বিষয়ের নিমিত্ত প্রত্যাশাপন্ন নহেন।

লেখকের বিবরণ কত বলিব। সরস্বতী দেবীর ইচ্ছায় এক্ষণে কতকগুলি বীভৎসরুচি লেখক উদয় হইয়া তাঁহার সন্তান—বিকলাঙ্গ ও কুৎসিত ভাবযুক্ত ভাষার সম্মান রক্ষা করিতেছেন। বীভৎসরুচি লেখক, পাঠক ও শ্রোতাদিগের অন্তঃকরণে তিনি যে কি এক প্রকার বিজাতীয় প্রবৃত্তির সংঘটন করিয় দিয়াছেন যে, তাঁহারা ঐরূপ ভাষা পাইলে যথেষ্ট সমাদর করেন। অতএব দেবীর সে ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিতে কাহারও সাহস জন্মে না। /২৭/

দেবলোকে এই সকল বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে এমন সময়ে বোপদেব, পাণিনি, অমর সিংহ, হলায়ুধ ও সাহিত্যদর্পণ-কারের[2] আত্মা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন মহোদয়গণ আমরা সরস্বতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ নিবাসে দেখিতে পাইলাম না। এই দেবলোকের কোন স্থানে এক্ষণে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করিলে আমরা তাঁহার সন্নিধানে গমন করি।

প্রিন্স—

তিনি, আপাততঃ এই স্বর্গ রাজ্যের কোন নির্জ্জন প্রদেশে সরোবর কূলস্থ লতামণ্ডপে শ্বেতপদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। আপনারা অনুসন্ধান

১ রামগতি ন্যায়রত্ন

২ বিশ্বনাথ কবিরাজ

করিয়া সহসা তথায় গমন করিবেন না। কেন না—তাঁহার স্নেহাস্পদ অত্যজ্য পুত্র বিকলাঙ্গ ইতর ভাষাকে বঙ্গে প্রচলন করণ জন্য মহাশয়দিগের চির প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ সূত্র, অভিধানিক শব্দ ও অলঙ্কার বিবর্জ্জিত রচনা প্রকাশের নিমিত্ত, তিনি অনেক আধুনিক লেখককে আদেশ করাতে আপনাদিগের যথেষ্ট মান হানি হইয়াছে। সেই হেতু তাঁহার নিতান্ত লজ্জা জন্মিয়াছে। এ কারণ সরস্বতী নির্জ্জন স্থান আশ্রয় করিয়া আপনাদিগের হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন।

তাঁহার এ প্রকার করিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তৎপক্ষে উভয় সঙ্কট। এক দিকে ইতর শব্দের রচনা প্রচলিত না করিলে তাঁহার বৎসলতার অন্যথা করা হয়। অন্য দিকে আপনাদিগের ব্যাকরণ, অভিধান ও অলঙ্কার শাস্ত্রের চিরপ্রসিদ্ধ /২৮/ বিধিবদ্ধ নিয়ম অন্যথা করিতে বাধ্য হইয়া আপনাদিগের অমর্য্যাদা করিয়াছেন। যাহা হউক অবশেষে তিনি আমাকে কহিয়াছেন—"যে নীচ ভাষার শব্দগণ কহিয়াছিল বঙ্গদেশের কোন প্রকার প্রবন্ধে তাহারা স্থান পায় নাই। তদর্থে গ্রন্থাদিপ্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনাতে তাহাদিগকে স্থান দিবার নিমিত্ত অনেক লেখককে প্রত্যাদেশ করিয়াছি। পরে জানিলাম তাহারা মিথ্যা কহিয়াছে যে হেতু বহুকালাবধি বঙ্গদেশের বিচারালয়ে শ্রীরামপুরের সংবাদ পত্রে ও কিতাবতী লেখায় তাহাদিগের অধিকার হইয়াছে। সব্ জজ্, মুন্সেফ, ডেপুটীকলেক্টর, মেজিষ্ট্রেট বাহাদুরদিগের মধ্যে, যাঁহারা বঙ্গভাষায় রায় ফয়শালা নটীশ রোবকারী রোয়দাদ লিখিয়া থাকেন ঐ সকলের সমস্ত স্থানই বিকলাঙ্গ ইতর শব্দে পরিপূরিত থাকে। তাঁহারা, যে যেমন ব্যক্তি তাঁহার সেইরূপ মান রক্ষা করিয়া বঙ্গভাষা লিখিতে আভাস করেন এরূপ বিকলাঙ্গ পুত্রের ইচ্ছা নয়। এমন কি বিচারপতিরা কোন ধনবান মান্যমান ভূস্বামী প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রভুতুল্য লোক তাঁহাদিগের প্রতি কোন কথার উক্তি করিবার সময়ে সে-দেয়, সে-করে, সে উপস্থিত হয়, সে-যায়, তাহারা ইত্যাদি ইতর অবিনয়ী শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা দেখিয়া পুত্রের আনন্দের সীমা নাই। ইতর শব্দদিগের অধিকার এইরূপে অনেক দূর পর্য্যন্ত পরিসৃত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বিচারপতিদিগের অর্ব্বাচীনতা ও অসভ্যতাও বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সভ্য গবর্ণমেণ্টও ঐরূপ ইতর ভাষা লিখন প্রণালীকে /২৯/ বিচারালয় হইতে দূরীভূত করিতেছেন না। সুতরাং আমাকেই তাহার প্রতিকার করিতে হইবে যাহাতে বঙ্গদেশীয় সকলে মনোযোগী হইয়া গবর্ণমেণ্ট সন্নিধানে এ বিষয়ের আন্দোলন করেন ও বঙ্গের

বিচক্ষণ সম্রান্ত লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বিচারালয়ে ঐরূপ লিখন প্রণালী রহিত করেন, আমি সত্বর এমন প্রত্যাদেশ করিব।

এতদ্ভিন্ন ইতর বিকলাঙ্গ ভাষা অস্ত কএক বৎসর নভেল নাটকাদিতে অধিকার করিয়া আসিতেছে যথেষ্ট হইয়াছে আর কেন এক্ষণে উহাদিগকে অধিকার চ্যুত করাই উচিত কেন না আমি লজ্জা ভয়ে অভিধান ও অলঙ্কারাদি গ্রন্থ কর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছি না, নিন্দিত ভাষাকে নিন্দিত বলিয়া প্রকাশিয়া সকলের চৈতন্য সম্পাদন করিতে সম্প্রতি কতিপয় লেখককে বঙ্গে ঘোষণা করিতে প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে শুনিয়াছি তাঁহারা ঐ ঘোষণাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।”

আমি এ সকল বৃত্তান্ত সরস্বতী দেবীর নিকট শুনিয়াছি আপনাদিগের গ্রন্থ নিয়ম সমুদয়ের প্রতি আর অধিক দিন নব্য লেখকেরা অবহেলা করিতে পারিবেন না। আপনারা এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া প্রতিগমন করুন, সরস্বতী দেবীকে লজ্জিতা করিতে আর তাঁহার সন্নিধানে গমন করিবেন না। কিছুদিন দেখুন বর্ত্তমান কালের ওরূপ লেখা বঙ্গে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বোপদেব অমরসিংহ হলায়ুধ প্রভৃতি সকলে বলিলেন “বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীতে আধুনিক লেখকেরা রচনা কার্য্য /৩০/ নির্ব্বাহ করিতেছেন না তাহাতে আমরা কিছুই ক্ষোভ করি না, কেবল লম্পট কুলটা, জারজ ও তস্কর প্রভৃতি দুশ্চরিত্র লোকের ইতিবৃত্তান্ত রচনা বদ্ধ করিয়া পুস্তক প্রকাশ করাতে বঙ্গদেশের অনেক পাঠক শ্রোতা শিশু ও মহিলাগণের কোমলান্তঃকরণ, অসৎপথগামী হইতেছে। তাহা নিবারণের উপায় কি আছে আপনি দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে অতঃপর অবগত করিবেন। সরস্বতী নিতান্ত লজ্জিতা হইয়াছেন শুনিয়া এ সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া আমরা এক্ষণে স্বস্ব স্থানে গমন করিলাম।

অতঃপর চন্দ্রমোহন পুনশ্চ বলিতে আরম্ভ করিলেন এক্ষণকার অনেক লেখক ভাষান্তরের ভাব ও দেশান্তরের রুচি বঙ্গভাষার পুস্তকে আনয়ন করিয়া বঙ্গবাসীদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিতেছেন না তাঁহারা ভারতবাসিনী স্ত্রীজাতিতে বীররসের উদ্ভাবন করিয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অবাস্তবিক বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। সে বর্ণনার প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা হয় না, তবে যে

দেবী কালী ও দুর্গা কোন্ কালে কি বীরত্বভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন সে এক স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিয়া বঙ্গবাসীদিগের সংস্কার আছে ; ভারতের স্ত্রীরা সলজ্জ প্রকৃতি না হইলে তাহাদিগের মুখ দর্শন করিতে ভারতীয় লোকের ইচ্ছা হয় না, সেই স্ত্রীলোক অসি হস্তে লইয়া অশ্বারোহণ করিলে কোন বঙ্গবাসী তাহাকে পাংশুরাশির উপরে সংস্থাপন করিয়া ছেদন করিতে ইচ্ছা না করেন ? লেখকেরা বিলাতীয় ভাবের পুষ্পকানন /৩১/ বর্ণনা অনুবাদ করিয়া বঙ্গজাতির তৃপ্তি জন্মাইতে পারেন না সৌগন্ধযুক্ত কুসুম কাননের বর্ণনা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ভারত রাজ্যের দিগে আসিতে হয়। সেই সময় কিছু বিলাতীয় কিছু ভারতীয় দুই ভাবে সংলগ্ন হইয়া যে এক মিশ্রময়ী ভাবের মূর্তির আবির্ভাব হয়, তাহা অদ্ভুত মূর্তি।—না হরিহর না কৃষ্ণকালী না হরগৌরী—

শুভের ভাগ এই যে এক্ষণে বহুজন বঙ্গ ভাষাতে পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাঁরা অপক্ষপাতী সমালোচকদিগের কটাক্ষ লক্ষ্য রাখিয়া রচনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে উত্তরকালে ভাষার উন্নতি করিতে পারিবেন এমন প্রত্যাশা হইতেছে, কিন্তু অনেক আত্মীয়-রঞ্জন সমালোচক আছেন তাঁহাদিগের প্রতি নির্ভর করিলে লেখকেরা ভাষার উন্নতি পক্ষে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

পরমেশ্বরের করুণার সীমা নাই তিনি বঙ্গের সেই অপবিত্র অসরল অসংলগ্ন অব্যবস্থিত লেখকগণের রচনা প্রপীড়িত জনের মনোদুঃখ নিবারণার্থে পশ্চাল্লিখিত কএকজন পবিত্র সরল সংলগ্ন স্বাভাবিক ভাবসংযুক্ত জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ রচয়িতার সৃষ্টি করিয়াছেন যাঁহাদিগের গুণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

রাজা রামমোহন রায়, স্যার রাজা রাধাকান্তদেব, বাবু নীলরত্ন হালদার ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অতিশয় প্রশংসিত লেখক ছিলেন, ইহাঁরদিগের রচনা শক্তির পরিচয় মহোদয় নরলোকে বিদ্যমান থাকিয়া পাইয়াছেন, সে সকল বিবরণ এক্ষণে উত্থাপনের অনাবশ্যক। /৩২/

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক সুসাধু বঙ্গ ভাষার জনক, তাঁহার লেখনী হইতে যেরূপ ভাষা নিঃসৃত হয় তদনুরূপ দ্বিতীয় কাহার লেখনী হইতে নিঃসরণ হয় না। বিদ্যাসাগর তাঁহার মধুময় রচনা রস বর্ষণ করিয়া কাহার হৃদয় না প্রফুল্ল করিয়াছেন ?

অধুনাতন কালের যত সম্বাদ পত্র সম্পাদক কিম্বা গ্রন্থ রচয়িতা থাকুন বাবু

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ পাঠ করিয়া যতদূর জ্ঞান উন্নত হয়, দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তির প্রবন্ধ পাঠ তাদৃশ জ্ঞান উন্নত করিতে পারক নহে।

দক্ষিণ মজীলপুর নিবাসী হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার এতাদৃশ অনুকরণ করিয়াছেন যে স্থানে স্থানে অতিশয় মনঃসংযোগ করিয়া পড়িলেও তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা নহে এমন অনুভব করা যায় না, উক্ত লেখার কএক পংক্তি এখানে উত্থাপন করিতেছি "অরণি কাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে সেইরূপ তাঁহার (সীতার) নেত্র হইতে বহুকাল সঞ্চিত অশ্রু উদ্গত হইল; কমল দল হইতে যেমন নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ ঐ সময় স্ফটিক ধবল জলধারা দরদরিত ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রবল শোকানলে সেই বিশাললোচনার পূর্ণচন্দ্র সুন্দর বদনমণ্ডল বৃন্তচ্ছিন্ন পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল।

ধর্ম্মশীলা সুমিত্রা কৌশল্যাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া এইরূপ কহিয়াছিলেন সূর্য্য তাঁহার (রামের) পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া কঠোর কিরণে তাঁহাকে পরিতপ্ত করিতে সাহসী /৩৩/ হইবেন না। সর্ব্বকালে শুভ সুখস্পর্শ সমীরণ কানন হইতে নিঃসৃত হইয়া অনতিশীত ও অনতিউষ্ণ ভাবে তাঁহার সেবা করিবেন। রজনীতে চন্দ্র তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া পিতার ন্যায় সন্তাপহারক করজাল দ্বারা আলিঙ্গন ও আনন্দিত করিবেন। সেই মহাবীর স্বভুজ বীর্য্যে নির্ভয় হইয়া, অরণ্যে গৃহের ন্যায় বাস করিতে সমর্থ হইবেন। দেবি, রামের কি আশ্চর্য্য মঙ্গল ভাব! কি সৌন্দর্য্য! কি শৌর্য্য! তিনি সূর্য্যের সূর্য্য, অগ্নির অগ্নি, প্রভুর প্রভু, কীর্ত্তির কীর্ত্তি, ক্ষমার ক্ষমা, দেবতার দেবতা এবং ভূত সমুদয়ের মহাভূত তিনি বনে বা নগরে থাকুন তাঁহার কোন দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি পৃথিবী ও জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিক্ত হইবেন।"

দক্ষিণ দেশীয় যে কএক ব্যক্তি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত রচনা করিয়াছেন, ইঁহারা প্রত্যেকেই বিখ্যাত লেখক। কালসংক্ষেপ জন্য ইঁহারদিগের সকলের নাম সম্প্রতি উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তাঁহার কাদম্বরীর ভাষা এত মধুর এত ললিত করিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা দূরে রাখিয়া কখন কখন ঐ কাদম্বরী পাঠার্থে মন ধাবমান হইতে থাকে। তাঁহার লেখার এই সকল ভাগ কি মনোহর 'একদা মধুমাসের সমাগমে কমলবন বিকসিত হইলে, চ্যুত কলিকা অঙ্কুরিত

হইলে, মলয়মারুতের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত হইয়া কোকিল সহকার শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক সুস্বরে কুহুরব করিলে অশোক কিংশুক প্রস্ফুটিত, বকুল, মুকুল উদগত /৩৪/ এবং ভ্রমরের ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক প্রতিশব্দিত হইলে আমি মাতার সহিত এই অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম।"

"সখে একবার আমার কথার উত্তর দেও। একবার নয়ন উন্মীলন কর। আমি তোমার প্রফুল্ল মুখকমল একবার অবলোকন করিয়া, জন্মের মত বিদায় হই, আমার সহিত তোমার সেই অকৃত্রিম প্রণয় ও অকপট সৌহার্দ্দ্য কোথায় গেল? তোমার সেই অমৃতময় বাক্য ও স্নেহময় দৃষ্টি স্মরণ করিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে কপিঞ্জল আর্ত্তস্বরে মুক্তকণ্ঠে এইরূপ ও অন্যরূপ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন।"

"প্রভাত সমীরণ মালতী কুসুমের পরিমল গ্রহণ করিয়া, সুপ্তোত্থিত মানবগণের মনে আহ্লাদ বিতরণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বহিতে লাগিল। প্রদীপের প্রভার আর প্রভাব রহিল না। পল্লবের অগ্র হইতে নিশার শিশির মুক্তার ন্যায় ভূতলে পড়িতে লাগিল।"

"চন্দ্রাপীড় নগরে আসিতেছেন শুনিয়া রমণীগণ অতিশয় উৎসুক হইল আপন আপন আরব্ধ কর্ম্ম সমাপন না করিয়াই কেহ বা অলক্তক পরিতে পরিতে কেহ বা কেশ বাঁধিতে বাঁধিতে বাটীর বহির্গত হইয়া কেহ বা প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া এক দৃষ্টিতে পথ পানে চাহিয়া রহিল একবারে সোপান পরম্পরায় শত শত কামিনীজনের সসম্ভ্রমে পাদ নিঃক্ষেপ করায় প্রাসাদমধ্যে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ভূষণ শব্দ সমুৎপন্ন হইল, গবাক্ষ জালের নিকটে কামিনীগণের মুখ পরম্পরা /৩৫/ বিকসিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল স্ত্রীগণের চরণ হইতে আর্দ্র অলক্ত পতিত হওয়াতে ক্ষিতিতল পল্লবময় বোধ হইল। তাঁহাদিগের অঙ্গশোভায় নগর লাবণ্যময়, অলঙ্কার প্রভায় দিঙ্মণ্ডল ইন্দ্রায়ুধময় মুখমণ্ডলে ও লোচন পরম্পরায় গগনমণ্ডল চন্দ্রময় পথ নীলোৎপলময় বোধ হইতে লাগিল।"

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বর প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা অতি সরল সুধাময় এমন কি পাঠ করিলে নিতান্ত নাস্তিকের নীরস অন্তঃকরণেও ভক্তি রসের সঞ্চার হয়। আপনাদিগের শ্রবণার্থে তাহার যৎকিঞ্চিৎ উত্থাপন করিতেছি "অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র তাঁহাতে (পরমেশ্বরে) প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর।

যদি কখন প্রলোভনের মলিন পঙ্কিল কর্দ্দমে পতিত হইয়া ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হও, তবে বার বার বলিতেছি যে ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও; তিনি তোমাদের হস্তধারণ পূর্ব্বক সেই পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া দেবতাদিগের পুণ্য পদবিতে লইয়া যাইবেন। ঈশ্বর আমাদের আত্মার ভেষজ। যখন আমরা পাপ বিকারে বিকৃত হইয়া স্বাধীনতাকে নষ্ট করি অজ্ঞানান্ধ হইয়া কার্য্য করিতে থাকি তখন তিনি আমাদিগকে সহস্র প্রকার দণ্ড দ্বারা স্বপথে লইবার যত্ন করেন, উপযুক্ত হইলে সে সময়েও আমাদের হৃদয়ে বিন্দু বিন্দু অমৃতবারি প্রেরণ করেন দেখ ঈশ্বরের কি করুণা আমরা ঘোর পাপেতে জড়ীভূত থাকিলেও তিনি আমাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতেছেন।" /৩৭/

বাবু নীলমণি বসাক যেরূপ সরল সুসাধু ভাষায় ভাব সংলগ্ন রাখিয়া পুস্তক লিখিয়া আসিয়াছেন ঐরূপ কিছু লিখিতে পারিলে এক্ষণকার অনেক লেখক বাবুরা হস্তে মস্তক ছেদন করিতেন সন্দেহ নাই।

বাবু রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ও অন্যান্য পুস্তকের এক চমৎকারিণী শক্তি আছে। ঐ সকলের বর্ণনা যতদূর ভক্তিরসশীলতা, যতদূর সংসারের অনিত্যতা, যতদূর স্নেহ মমতা প্রভৃতি বৃত্তির উত্তেজনা করিতে পারে, অধুনা দ্বিতীয় কোন লেখকের—লেখনী ঐরূপ পারে এমন প্রত্যয় হয় না; তন্মধ্যে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে "অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রেম অনেক যন্ত্রণা দায়ক, কারণ অনিত্য বস্তুর কোন স্থিরতা নাই। অদ্য রাজা কল্য দরিদ্র, অদ্য মহোল্লাস কল্য হাহাকার, অদ্য অভিনব বিকসিত পুষ্পতুল্য লাবণ্য যুক্ত, কল্য ব্যাধি দ্বারা শুষ্ক ও শীর্ণ; অদ্য পুত্রের সুচারু বদন দর্শন করিয়া আনন্দিত হওয়া, কল্য তাহার মৃত শরীরোপরি অশ্রুবর্ষণ করা; অদ্য পুণ্যবতী রূপবতী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যার সহবাসে সুখেতে দ্রব হওয়া, কল্য তাঁহার—লোকান্তর গমনে তাঁহার—প্রতিমা মাত্র রহিল, ইহাতে হৃদয় বিদীর্ণ করা; হায়! হায়! কিছুই স্থির নাই।"

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সন্দর্ভ-রচনার চাতুর্য্য সাতিশয় প্রশংসনীয়, তিনি অতি গুরুতর প্রস্তাব সমস্ত যেরূপ আশুবোধক সরল ভাষায় লিখিয়াছেন ঐরূপ গুরুতর প্রস্তাব অদ্যাবধি তাদৃশ সরল ভাষায় প্রায় কেহ লিখিতে সক্ষম হয়েন নাই; তাঁহার সন্দর্ভ কি জ্ঞানগর্ভ! /৩৭/

যথা—"তোমরা বিদ্যাবান ও ধর্ম্মশীল বট; কিন্তু এ প্রকার গুণ সম্পন্ন হইয়া আলস্যের বশীভূত থাকা উচিত নহে। কতকগুলি পুস্তক সম্মতি-

ব্যাহারে বিরলে কাল-যাপনার্থে বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, এবং সংসারের শুভা-শুভ তাবত বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া অনুৎসাহে কাল ক্ষেপণ করাও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সংসারের কার্য্যই না করিলে, তবে জীবন ধারণের ফল কি? শিক্ষিত বিদ্যা যদি জগতের উপকারার্থে নিয়োগ না করিলে, তবে সে বিদ্যার প্রয়োজন কি? যদি সকলেই তোমাদের ন্যায় বৃথা কাল হরণ করে, তবে এক দিবসেই লোক যাত্রার উচ্ছেদ দশা উপস্থিত হয়।"

"বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনি মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাপিত চিত্ত শীতল হয়, এবং বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয় পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত, শোক সন্তপ্ত দুঃখিত ব্যক্তিরও অধর-যুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপন তাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে অঙ্গ সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ লাভ হয়, সেইরূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষ সহ প্রবোধ সুধার সঞ্চার হয়।—" /৩৮/

দোষের মধ্যে তিনি তাদৃশ সংস্কৃতজ্ঞ না হইয়া মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রীয় মীমাংসাদির খণ্ডন ও নিন্দাবাদ করিয়াছেন, সেইটী তাঁহার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ কর্ম্ম হয় নাই। ফলতঃ অক্ষয় বাবুর রচনা যত প্রশংসনীয় তাঁহার অনেক বিষয়ের সিদ্ধান্ত তত প্রশংসনীয় নহে; যেহেতু তিনি লিখিয়াছেন—"শুভাশুভ দিন-ক্ষণ তাঁহার (অশিক্ষিতের) কতই আশঙ্কা কতই উদ্বেগ উৎপাদন করে" এই আশঙ্কা কেবল অশিক্ষিতের হইয়া থাকে এমন নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্র-নিপুণ সুশিক্ষিতদিগেরই ঐরূপ আশঙ্কা হইয়া থাকে, যে দিনক্ষণ বার তিথির সংযোগ মাহাত্ম্যে চিরদিন চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, তারানক্ষত্রের উদয়াস্ত, প্রবল বাত্যার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে সেইরূপ তিথিনক্ষত্রের সংযোগ মাহাত্ম্যে কোন কর্ম্ম করিলে অনিষ্ট ঘটনা হইবার বাধা কি আছে? এমত স্থলে শুভাশুভ দিনক্ষণ গ্রাহ্য না করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এক স্থানে লিখিয়াছেন "ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি অবাস্তবিক পদার্থ তাঁহার (অশিক্ষিতের) হৃদয়ক্ষেত্রে নিরন্তর

বিচরণ করে" ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিকে অসংখ্য সুশিক্ষিত লোক বাস্তবিক বলিয়া মানেন। সুশিক্ষিতেরা বহু জনেও ভূত প্রেতাদি যে অবাস্তবিক অদ্যাবধি তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। এমন স্থলে কোন প্রমাণ না দেখাইয়া চারুপাঠ লেখকের ভূত প্রেতাদিকে অবাস্তবিক ও কেবল অশিক্ষিতেরা ভূতাদি মানে, ইহা বলা অনর্থক হইয়াছে। পুনশ্চ তিনি লিখিয়াছেন "অশিক্ষিতদিগের বিহঙ্গ বিশেষের স্বর বিষয়েই বা কত ত্রাস ও কত উৎকণ্ঠাই উপস্থিত করে" বিহঙ্গ বিশেষের /৩৯/ স্বর বিষয়ে ত্রাসিত ও উৎকণ্ঠিত হওয়া সুশিক্ষিতের কার্য্য, অশিক্ষিতের নহে. চারুপাঠ লেখক তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই ; যখন কদর্য্য ও কর্কশ স্বরে, ভয় বা মনের গ্লানি উপস্থিত করিয়া পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। ভীষণ শব্দে গর্ভিনীর জরায়ুস্থ সন্তান বিনষ্ট করে, তখন কুশব্দ ও কুস্বরকে ভয় করা সুশিক্ষিত কি অশিক্ষিতের কার্য্য? দক্ষিণ দেশের পল্লী গ্রামের ভূতল নামক পক্ষীর ভয়ানক স্বর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিলে, লেখক সে স্বরে ভয় না করার সিদ্ধান্ত কিরূপে করিতেন দেখা যাইত। যেমন কুস্বর শ্রবণ নিবন্ধন ভয়ে পীড়াদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সুস্বর শ্রবণে মনুষ্য প্রফুল্ল অরোগী হয় ; চারুপাঠ লেখক তাহা আলোচনা করেন নাই, তিনি অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিতেন, যে চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অনেক বায়ুরোগ গ্রস্ত সেতারের সুশব্দ শুনিয়া আরোগ্য লাভ করে। পাদরি সাহেবদিগের ন্যায় শাস্ত্রের কতক জানা কতক না জানার ন্যায় আর এক স্থলে চারুপাঠ লেখক স্বকপোলকল্পিত মীমাংসা করিয়াছেন "পৃথিবীর স্থলভাগ জলময় সমুদ্রে পরিবেষ্টিত বটে কিন্তু ক্ষীর সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র প্রভৃতি পুরাণোক্ত সপ্ত সমুদ্রের অস্তিত্ব ঘটিত যত উপাখ্যান প্রচলিত আছে সর্ব্বৈব মিথ্যা।" গ্রন্থকার ইহার ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ঐ সকলের অস্তিত্বের প্রতি হাস্যজনক মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট অনুধাবন করিয়াছেন যে ক্ষীর সমুদ্র অর্থে ক্ষীর পুরিত, ইক্ষু সমুদ্রার্থে, ইক্ষুরস পুরিত, সুরা সমুদ্রার্থে সুরা পুরিত সমুদ্র, ফলতঃ /৪০/ তাহা নহে, ক্ষীর গুণ বিশিষ্ট জল পূর্ণ সমুদ্রকে ক্ষীর সমুদ্র, ইক্ষুরস গুণযুক্ত সমুদ্রকে ইক্ষু সমুদ্র, সুরাগুণ সম্পন্ন জলপূর্ণ সমুদ্রকে সুরা সমুদ্র বলিয়া পৌরাণিকেরা উক্ত করিয়াছেন। চারুপাঠ লেখকের ন্যায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত গোক্ষুর বৃক্ষের স্থলে কোন ব্যক্তি জীবন্ত গরুর ক্ষুর আনিয়া পাচন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চারুপাঠ লেখকের প্রতি এইরূপ কটাক্ষ করাতে অনেকে

বিরক্ত হইতে পারেন, কি করা যায় দুঃখের বিষয় যে আমরা তাঁহার ভ্রম সিদ্ধান্ত নিচয় গ্রাহ্য করিতে পারি না।

সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব রচয়িতা, ঐতিহাসিক উপন্যাস নামক প্রস্তাব লেখককে[১] গ্রন্থকার শ্রেণীভুক্ত করিয়া ক্রমাগত তদ্বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম কি, তাহা আমরা অনুভব করিতে সক্ষম হই নাই। উক্ত লেখক একজন ইংরাজীতে পারদর্শী বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিলে ভাল শুনাইত। তিনি গ্রন্থ রচনা কার্য্যে তত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই, সে বিষয় লইয়া অধিক আন্দোলন করা পণ্ডশ্রম হইয়াছে। বাঙ্গালা পুস্তকের চারুতা সপ্রমাণ করিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে এক হাস্যজনক কথা লিখিয়াছেন "শ্রীযুক্ত হজ্‌সন প্রাট সাহেব এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করত বিশিষ্ট রূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাহাতেই সাহস প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই" হা দুর্দ্দশা! হা ভ্রান্তি! ইংরাজ হইয়া প্রাট সাহেব ঐ বাঙ্গালা পুস্তকের ভাল মন্দ যত দূর বুঝিয়াছিলেন তাহা মা গঙ্গাই জানেন।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও জগন্মোহন তর্কালঙ্কার যে যে পুরাণ অনুবাদ করিয়াছেন, সে সকল অতি পরিশুদ্ধ এবং চিত্তরঞ্জক হইয়াছে। রামকমল ভট্টাচার্য্যের প্রকৃতিবাদ অভিধান শিক্ষার্থীদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়. পুস্তক হইয়াছে। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের রোম ও রামগতি ন্যায়রত্নের বঙ্গদেশের ইতিহাসাদি, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাপ্রণালী, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতিবোধ ও টেলিমেকসের আখ্যায়িকা ইত্যাদি সকল পুস্তকই ইংরাজী হইতে অনুবাদিত, অনুবাদিত বলিয়া উহারদিগের অনুবাদকগণের প্রতি কেহ উপেক্ষা করেন না যেহেতু এক্ষণকার পুস্তক লেখকেরা প্রায় কেহই আদি রচয়িতা নহেন তাহাও এই সুরলোকে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আদি রচয়িতার পুস্তক না হইলেও যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকে শিক্ষার্থীদিগের পরমোপকার হইতেছে, উপরি উক্ত অনুবাদক মহাশয়দিগের পুস্তক শিক্ষার্থীদিগের তদনুরূপ। ঐ সকল গ্রন্থ অনুবাদকেরা সাধারণের অপরিমেয় ধন্যবাদ পাইবার যোগ্যপাত্র। উহাঁদিগের পুস্তক নিচয় শিক্ষার্থীদিগকে পবিত্র জ্ঞান মঞ্চের উর্দ্ধভাগে প্রেরণ করিয়া থাকে। করিলে কি হইবে মধ্যে মধ্যে নভেল, নাটক তাঁহাদিগকে সেই মঞ্চ হইতে অধোভাগে

১ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) গ্রন্থ রচয়িতা ভূদেব মুখোপাধ্যায়

আনিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে নিঃক্ষেপ করে ও তাঁহাদিগের চরণ, গুরুভার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাঁহাদিগকে পবিত্র জ্ঞান রথে আরোহণ করিতে দেয় না।

হরিনাথ ন্যায়রত্নের প্রণীত রামের অরণ্য যাত্রা ও বিরাট /৮২/ পর্ব্ব অতি সুমধুর রসভাব পরিপূর্ণ; অলঙ্কার ব্যাকরণ ও ভাষার সরলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লেখক সন্দভ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা শুনিলেই সহসা তাহার চারুতা অনুভব করিতে পারিবেন। যথা "ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়, যাঁহাদিগের সাগর পরিখা পর্য্যন্ত সমস্ত বসুন্ধরা বশবর্ত্তিনী, তাঁহারা জীবিত থাকিতেই তদীয় মহিষীকে সুদেষ্ণার দাসী হইয়া থাকিতে হইল। সহস্র দাস দাসী যাহার অগ্র পশ্চাৎ ধাবমান হইত, তাহাকে এক্ষণে দীনবেশে সুদেষ্ণার অনুগামিনী হইতে হইল। যে দ্রৌপদী স্বহস্তে কখন আপনারও গাত্র মার্জ্জনা করে নাই চন্দন ঘর্ষণ এক্ষণ তাহার জীবনোপায় হইল। এই দেখুন আমার তাদৃশ সুকোমল করতল কিণচয়ে কলঙ্কিত হইয়াছে। যে আমি কুন্তী ও আপনাদিগের হইতে কখনও ভীত হই নাই সেই আমাকে এক্ষণে দাসীভাবে পর গৃহে সর্ব্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকিতে হইল। বর্ণক সুকৃত হইয়াছে কি না, রাজ্ঞা পাছে কিছু বলেন, কেবল এই ভাবিয়াই দিন যামিনী যাপন করি। অতএব নাথ! আমা অপেক্ষা পাপীয়সী পৃথিবীতে আর কে আছে বল। দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।'

উক্ত লেখকের রামের অরণ্য যাত্রা পুস্তকে সীতার উক্তিতে এইরূপ সুললিত রচনা করিয়াছেন।

"দেখুন, পিতা পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি আর সকলেই নিজ নিজ পুণ্য পাপের ফল ভোগ করে, কিন্তু পত্নীকে স্বামীর ভাগ্য ভাগিনী হইতে হয়। লোকে রাজার পত্নীকে মহিষী ও সন্ন্যা- /৮৩/ সীর পত্নীকে সন্ন্যাসিনী বলিয়াই নির্দ্দেশ করে, অতএব আপনি বনবাসী তপস্বী হইলে আমি অবশ্যই বনবাসিনী তপস্বিনী হইব। কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, সখীজন, কেহই পতির তুল্যকক্ষ নহে। পতি ভিন্ন পতিব্রতা নারীর আর কোন গতিই নাই। এই জন্য লোকে নারীকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া থাকে। অতএব আপনি যখন, গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চলিলেন, তখন আমিও সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিব আপনি যদি আজ দুর্গম গহনে যাত্রা করেন,

আমি অবশ্যই আপনার অগ্রগামী হইব। কি প্রাসাদতল, কি বৃক্ষমূল, কি স্বর্গ, কি পাতাল, আপনি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন, আমাকে ছায়ার ন্যায় সহচারিণী বলিয়া জানিবেন। অতএব আমি আপনার সঙ্গে মৃগ-পূর্ণ দণ্ডক বনে অবশ্যই যাত্রা করিব। আমি কৌমারাবস্থায় পিতৃভবনে যেমন সুখে বাস করিতাম সেখানেও সেই ভাবে থাকিব। আপনার অনুমোদিত নিয়ম পালন করিয়া ব্রহ্মচারিণী হইয়া পতির শুশ্রূষা করিব—অতএব আমি নিশ্চয়ই বন গমন করিব। আপনি আমাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। আমি ফল মূল আহার করিয়া আপনার সহিত বনবাসিনী হইব। উচ্চতর ভূধর, রমণীয় নির্ঝর, বেগবতী নদী ও হংস কারণ্ডব-পূর্ণ কমলিনী শোভিত সরোবর সকল নিরীক্ষণ করিয়া পরম সুখানুভব করিব। অতএব জীবিতনাথ! আমাকে লইয়া চলুন, আমি আপনাতে রহিত হইয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না।"

গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দশকুমার গ্রন্থ সম্বন্ধে /৪৪/ কোন সারদর্শী কর্তৃক যেরূপ উক্ত হইয়াছে, আমি তাহা সম্যক্ প্রকারে স্বরূপ কথা বলিয়া অনুমোদন করি; তিনি এইরূপ বলিয়াছেন "এই বাঙ্গালা দশকুমারের রচনা অতিশয় প্রসাদ গুণশালিনী যাঁহাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় তারতম্য বিবেচনা করিবার শক্তি আছে তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে এরূপ প্রসাদ গুণশালিনী ও চমৎকারিণী রচনা বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক মধ্যে অতি বিরল।"

রামকমল ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের অযোধ্যাকাণ্ডের রচনা কি মনোহারিণী, শুনিলে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয়। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যথা—"মৈথিলী লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, আর্য্যে! আমি পতিব্রতা নারীর ব্রতাচার অবগত আছি। বীণা যেমন অতন্ত্রী হইলে বাদিত হয় না, রথ যেমন অচক্র হইলে চলিত হয় না, মীন যেমন সলিল বিহীন হইলে জীবিত থাকে না, নারীও তেমনি পতি সেবায় পরাঙ্মুখী হইলে সুখ সম্ভোগে সমর্থ হন না। পিতা মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি কেহই পতির তুল্য হিতৈষী নহেন। আমি পরম দৈবত পতিকে অবজ্ঞা করিব, আপনি এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন? আমি পরিণয় কালাবধি এই ব্রত করিয়াছি, যে ভর্ত্তার হিতের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব।"

মধুসূদন বাচস্পতি সঙ্কলিত "বসন্তসেনা" এক রমণীয় গদ্য পদ্য রচনাপূর্ণ পুস্তক, তাহার গদ্যভাগের কিয়দংশ শ্রবণ করুন।

"হায় আমি কি এতই নরাধম, এতই পাপাত্মা ও এতই /৪৫/ অধমের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িলাম। ক্ষণকালপূর্ব্বে যাঁহাদের জীবন তুল্য স্নেহভাজন ছিলাম, সেই চিরপরিচিত বন্ধুগণ সেই স্নেহকারী বান্ধবগণ, আমাকে নারী বধকারী দুরাত্মা জ্ঞান করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র, মার্জ্জারের ন্যায় লোভী, ভূজঙ্গের ন্যায় খল, কুম্ভীর ন্যায় পাপী, গৃধ্রের ন্যায় ঘৃণাস্পদ ও কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর, ভাবিয়া দূর হইতেই পরিত্যাগ করিতেছেন। হায়! সর্ব্বং সহা ভূত ধাত্রী বসুমতীও কি আমার ভার সহ্য করিতে পারিলেন না? তবে আর কাহাকে কি কহিব, কে আর আমার ভার লইবে? হে ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই তোমার বিদিত, অতএব আমি কৃতাঞ্জলি ও কাতর হইয়া বিনয় করি। তুমি আমার এই অপ্রতিবিধেয় অপার বিপৎসাগরে পোত স্বরূপ বন্ধু হও, এখনই আমার জীবন গ্রহণ করিয়া উপকার কর, আর যেন, আমাকে এক পদও চলিতে না হয়, এবং এই অসহ্য যন্ত্রণা শূল সহ্য করিতে না হয়। হে মৃত্যু তুমি ভিন্ন এ সময়ে আর কেহই হিতকারী হইতে পারিবে না. আমি শরণাগত চরণানত হইতেছি, শীঘ্র আমার প্রাণ লও, এই ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।"

ডাক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত শরীর পালন, উদ্ভিদ বিচার ও ধাত্রী শিক্ষার মর্ম্মার্থ অতি উপকারক ও ব্যবহার্য্য হইয়াছে।

তিনি যে এক্ষণকার অনেক লেখকের ন্যায় কাব্য কাণ্ডে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বৃথা কালক্ষয় করিয়া হাস্যাস্পদ হয়েন নাই, ইহা অতি বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন। কাব্য কাণ্ডে খ্যাতি /৪৬/ প্রতিপত্তি লাভ করা ঈশ্বর দত্ত বিশেষরূপ শক্তি-সম্পন্ন লোকের কার্য্য, ঈশ্বর সে শক্তি যাঁহাদিগকে না দিয়াছেন, তাঁহারাও ইদানীং কবিকুলের দলভুক্ত হইয়া কবিতা দেবীকে অলঙ্কার বিবর্জ্জিত ও পথের কাঙ্গালিনী করিয়া যথায় তথায় ভ্রমণ করান। হায় কি দুঃখের বিষয়! অতঃপর নিবেদন, হরানন্দ ভট্টাচার্য্যকৃত নলোপাখ্যান অতি বিশুদ্ধ সরল ভাষায় বিরচিত হইয়াছে; ইহাতে ব্যাকরণ কিম্বা অলঙ্কার গত কোন দোষ নাই; বিশেষত আদি সংস্কৃত পুস্তক হইতে ইহার ভাব সকল সুনিপুণতা সহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ শ্রবণ করুন।

(নল) "রাজা গমন করিলে কিয়ৎক্ষণ পরে দময়ন্তীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখিলেন. হৃদয়নাথ নিকটে নাই। অমনি দশ দিক্ শূন্য দেখিয়া হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তমকে উদ্দেশ করিয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা নাথ! এ দুঃখিনীকে ফেলিয়া কোথায় পলাইলে? আমি তোমা বিনা আর কাহাকেই জানি না। এই সংসার মধ্যে তোমা বিনা আমার আর কেহ নাই। আমি একাল পর্য্যন্ত এক দেহের ন্যায় তোমার সহিত কালযাপন করিয়াছি; কায়মনে তোমার সেবা করিয়াছি। এই দুঃসহ দুঃখভোগ তৃণ-তুল্য বোধ করিয়া তোমার সঙ্গে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু তুমি কি প্রকারে হৃদয় পাষাণবদ্ধ করিয়া চিরসঞ্চিত কলত্র-স্নেহ বিস্মরণ পূর্ব্বক, এই ভীষণ মহারণ্য মধ্যে আমাকে নিদ্রিতা একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে। এই জনশূন্য অবান্ধব স্থানে /৪৭/ আমি কাহার কাছে দাঁড়াইব? কে আমাকে রক্ষা করিবে? তোমার অন্তঃকরণে কি দয়ার লেশ মাত্র নাই? যদি মনে করিলেই মৃত্যু হইত, তাহা হইলে তোমার অদর্শনে এক মুহূর্ত্তও জীবন রাখিতাম না। অথবা বুঝি তুমি পরিহাস করিয়া লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া কৌতুক দেখিতেছ? এই পর্য্যন্তই ভাল; আর পরিহাসের প্রয়োজন নাই। বিকটাকার সিংহ, শার্দ্দূলাদি শ্বাপদগণ ভয়ঙ্কররূপে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, দেখিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। কোথায় আছ? আসিয়া দেখা দিয়া ভয় ভঞ্জন কর। এই যেন দেখিতে পাইলাম, আবার কোথায় লুকাইলে? তুমি ত অতি নিষ্ঠুর; আমার এ প্রকার বিলাপ দেখিয়া কেমন করিয়া সুস্থ মনে রহিয়াছ? আমি আমার জন্য ক্ষণকালের নিমিত্তও চিন্তা করি না। কেবল তোমার নিমিত্তই ভাবিতেছি; যখন তুমি ক্ষুধায় পিপাসায় একান্ত ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত হইয়া সায়ংকালে বৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইবে; তখন তথায় আমাকে দেখিতে না পাইলে তোমার মন কিরূপ হইবে? শুশ্রূষা করিয়া কে তোমার শ্রান্তি দূর করিবে? কে আর প্রিয়বাক্য দ্বারা তোমার হৃদয় শীতল করিবে? বলিতে বলিতেই শোকে বিহ্বল হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নয়নে বাষ্পধারা বহিয়া ধরাতল আর্দ্র হইয়া উঠিল।"

হুতোম প্যাঁচার পুস্তকের ইতিবৃত্তান্ত নিতান্ত নিকৃষ্ট, কিন্তু প্রায় এক্ষণকার মনুষ্য মাত্রেরই কেমন একপ্রকার নীচ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে যে, লোকের কুৎসা পরিপূর্ণ সেই পুস্তক পাঠে তাঁহারা /৪৮/ যথেষ্ট হর্ষলাভ ও নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। যাহা হউক উক্ত লেখকের স্বভাবোক্তি বর্ণনার পারিপাট্য অদ্বিতীয় ও অপূর্ব্ব, তাহা শ্রবণ করুন।

"গুপুস্ করে তোপ পড়ে গ্যালো, কাকগুলো কা কা করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উর্জ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফরসা হয়ে এলো—মাচের ভারিরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে—মেচুনিরা ঝকড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েচে—দিশি বিলিতী যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ি পালকি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন—জ্বর বিকার ও ওলাউঠোর প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না—উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন; কলিকাতা সহরেও দুচার গো-দাগাকে প্রাক্‌টিস কত্তে দেখা যায়।—"

"এদিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েচে। উড়ে বামুনরা ময়রার দোকানে ময়দা পিষ্‌তে আরম্ভ করেচে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে।—বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাক্তে আরম্ভ করেচে। দু এক বার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুর গুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন—"রামের মা চলতে পারে না। ওদের ন বৌটা কি বজ্জাত মা" "মাগী যে জকী" প্রভৃতি /৪৯/ নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েচেন।"

"চার আনা! চার আনা! লালাদিগি! তেরেজুরি। এসো গো বাবু ছোট আদালত" বলে গাড়োয়ানরা সৌখীন সুরে চীৎকার কচ্চে,—নবদ্বাগমনের বউএর মত দুই একটী কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আচেন—সঙ্গী জুট্‌চে না। দুই একজন গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলেচেন,—গাড়োয়ানেরা হাসি টিট্‌কিরির সঙ্গে "তবে ঝাকা মুটের যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম নয়" কম্‌প্লিমেণ্ট দিচ্চে।

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জম্‌চেন। হেটো ব্যাপারীরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কল্‌কেতা সহর বড়ই

জলজায়,—গাড়ির হর্‌রা, সইসের পরিস্‌ পরিস্‌ শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উট্‌চে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।—"

চন্দ্র—

আমি সংপ্রতি রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু শ্যামাচরণ সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্গাধিপ পরাজয় লেখক[১], লোহারাম শিরোরত্ন, মদনমোহন মিত্র, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, মনোমোহন বসু, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীময় ঘটক, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, রাধামাধব মিত্র, নৃসিংহ·/৫০/ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিবচন্দ্র দে, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি মহাশয়গণের পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলিতে অবকাশ পাইলাম না, সময়ান্তরে বলিতে মানস রহিল। বান্ধব, একাধিক সহস্র রজনী, রহস্য প্রকাশ প্রভৃতি পত্র ও পুস্তক সকল সুচারু সাধু ভাষা বিশিষ্ট; লেখকেরা যে প্রণালীতে লিখিতেছেন, ঐরূপ লিখিলে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন।

প্রিন্স—

আধুনিক লেখকদিগের রচনাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিলেন, কিন্তু কি কারণ উঁহারদিগের পুস্তকের ইতিবৃত্ত-সম্বন্ধে কিছুই উত্থাপন করিলেন না?

চন্দ্র—

কারণ এই যে এক্ষণকার লেখকেরা কেহ কেহ সাক্ষাৎসম্বন্ধে, কেহ কেহ প্রকারান্তরে অনুবাদক মাত্র, আদি-রচয়িতা নহেন; সুতরাং পুস্তকের ইতিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে উঁহারদিগের যোগ্যতার কিছুই সংশ্রব নাই। কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, কালিদাস ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণ মহাভারত হইতে শকুন্তলা এবং নৈষধচরিত প্রভৃতি সঙ্কলন করিয়া কি প্রকারে ঐ সকল পুস্তকের ইতিবৃত্তান্তের কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত হইলেন? ফলতঃ মহাভারতের ইতিবৃত্তান্তের ছায়ামাত্র উক্ত গ্রন্থকারেরা গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিজ নিজ নূতন ভাব, নূতন রস ও উৎকৃষ্টরূপ যথেষ্ট নূতন প্রসঙ্গ, তাঁহাদিগের কৃতগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; ঐরূপ এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা আপনাদিগের গ্রন্থে

১ প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

কিছু সন্নিবেশিত করিতে পারিলে, আমি তাঁহাদিগকে আদিরচয়িতা ও গ্রন্থের ইতিবৃত্তান্তের কর্ত্তা বলিতে সঙ্কোচ /৫১/ করিতাম না; ইতিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহারদিগের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হইতাম না। তাঁহাদিগের গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিয়াছি পুরাতন সাহিত্যক্ষেত্রের ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের স্থান স্থান হইতে তাঁহারদিগের পুস্তকের আদ্যোপান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে; অনুসন্ধান করিলে সেই সকল পুস্তকের কোন্ পংক্তি, কোন্ ভাব, কোন্ রস, কোন্ ইতিবৃত্তান্তের অংশ, কোন্ সংস্কৃত কোন্ ইংরাজী পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা অনায়াসে প্রমাণ করা যায়; তাঁহারা অনেকেই আদি-রচয়িতার পুস্তককে রূপান্তরিত করিয়াছেন, তাঁহারা চাক কাটিয়া জগঝম্প, ও প্যান্টুলন কাটিয়া বহির্বাস করার ন্যায় পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন। কোন প্রকৃত কিম্বা আদি-রচয়িতার লেখার সমালোচনা করিতে হইলে, তাঁহার পুস্তকস্থ ব্যক্তিদিগের কর্ম্মকলাপের চমৎকারিতার ইতিবৃত্ত ও যে স্থানের লেখার দ্বারা সুরসের উদ্ভাবন করে তাহা সবিস্তার সমালোচনাতে নিবিষ্ট করিতে হয়। যাঁহার পুস্তকস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় কাহারও কর্ম্মের বিশেষ চমৎকারিতা নাই, সকলই যৎসামান্যরূপে অনুবাদিত ও যাঁহার লেখা যৎসামান্য ও কোন স্থানে সুরসের উদ্ভাবন করিতে পারে না—সমালোচক ন্যায়রত্ন মহাশয় উক্ত লেখকের পুস্তকের আদ্যোপান্ত আপনার সমালোচনা পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগের শিরঃপীড়াদায়ক এক প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়াছেন; উহা পড়িতে কাহারও ধৈর্য্য রক্ষা পায় না।

এক্ষণে কালীপ্রসন্ন সিংহের আত্মা কহিলেন, "প্রিন্স মহোদয়, /৫২/ গদ্যলেখক মহাশয়দিগের বিবরণ অদ্য এই পর্য্যন্ত হইয়া থাক, যাহা অবশিষ্ট থাকিল, আগামী অধিবেশনে তাহা সমাপ্ত হইবে; এক্ষণে আমি কোন বিখ্যাত নব্য কবির কবিত্বের পরিচয় দিবার জন্য নিতান্ত উতলা হইয়াছি; মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুমতি দিউন যে, আমি সেই পরিচয় দিয়া সুস্থির হই।" প্রিন্স্ কহিলেন "তুমি যদি আর স্থির থাকিতে না পার, তবে যাহা বলিতে প্রার্থনা করিতেছ, তাহা উত্থাপন কর।"

কালীপ্রসন্ন—

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ করিলে মোহিত হইবেন. তাঁহার স্বভাবোক্তি রচনার কি মধুরতা।

স্বভাবোক্তি

মেঘনাদবধ হইতে

৩৫ পৃষ্ঠা

"বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড় ; চারিদিকে রম্য বনরাজী,
নন্দন-কানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমর-দল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;
বহিছে বসন্তানিল ; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে ;
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে। /৫৩/

১১৮ পৃষ্ঠা

"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী করে ;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে! কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে।

১১৯ পৃষ্ঠা

"কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি

নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা /৫৪/
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে।

১৭৯ পৃষ্ঠা "স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপ মাধুরী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি;—মরি
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা! বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ, আর মাত নাহি দিলা দেখা।

বীররস

"কি সুচারু"!

১০ পৃষ্ঠা "পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,

এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর ! /৫৫/
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে !—ধন্য শিক্ষা-বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?

২০১ পৃষ্ঠা চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোরনাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে ! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল, যেন ঘোর ভূকম্পনে !
বহিল রুধির ধারা ! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;—

২০৫।৬ পৃষ্ঠা হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিল বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে !
হায় রে রুধির ধারা (ভূধর শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,) /৫৬/
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে

সপ্তরথী-অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্রে ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে,—জননী যেমতি
খেদান্ মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে—
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে।

রৌদ্ররস

"কি অদ্বিতীয় কবিশক্তি !"

২০০ পৃষ্ঠা "ক্ষত্র-কুল-গ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ ! নির্লজ্জ তুই ! ক্ষত্রিয়-সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর সদৃশ /৫৭/
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি।
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর ? কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি ?"

২০৮ পৃষ্ঠা কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুল-গ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণ-নন্দন আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল, রে, মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা

দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ?—এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নির'শিসম তেজে !

করুণরস

"কি মনোহর !"

২৫৮ পৃষ্ঠা তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে /৫৮/
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি ব'লে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ, হে, তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি' তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃ-বৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি'
পুজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,

নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।”

২৭৪ পৃষ্ঠা হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসারি’
বাহযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে) /৫৯/
কহিলা, “আইলি কি, রে, এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর ? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র ? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।

বীভৎসরস

“কি বর্ণনার নৈপুণ্য।”

২৬৬ পৃষ্ঠা অস্থি-চর্ম্ম-সার, দ্বারে দেখিলা সুরথী,
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি’ ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি !
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি’ জ্ঞান তার ! সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর ব’সে উদরপরতা ;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে,
সুখাদ্য ! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে,
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি ! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা !
তার পাশে বসি’ যক্ষ্মা শোণিত উগরে, /৬০/

কাশি কাশি দিবানিশি ; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া ! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি ;

২৬৯ পৃষ্ঠা   দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে)
রণে ! রথমুখে ব'সে ক্রোধ সূতবেশে ;
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে ! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি ;
উর্দ্ধবাহু সদা, হায় নিধনসাধনে ।
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু ঝুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর !

উপমা, পূর্ণোপমা, মালোপমা, রূপক, সাঙ্গরূপক, পরম্পরিত রূপক, উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের চমৎকার উদাহরণ মাইকেলে অনেক পাওয়া যায় । তাহার দুই এক স্থল না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না ।

উপমা

৬৬ পৃষ্ঠা   শুখাইল অশ্রুবিন্দু যথা
শিশির নীরের বিন্দু শতদল দলে—
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে ।

পূর্ণোপমা

১১১ পৃষ্ঠা   দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে— /৬১/
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে ।

মালোপমা

১১২ পৃষ্ঠা   মলিন-বদনা দেবী, হায় রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে !

রূপক

১১ পৃষ্ঠা শোকের ঝড় বহিল সভাতে ;—
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল, মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু ; অশ্রুবারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে ।

উৎপ্রেক্ষা

১৩ পৃষ্ঠা উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী ।

১৯ পৃষ্ঠা অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন !

১১২ পৃষ্ঠা রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে ; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিনী, [৬২]
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি' চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী !

স্বভাবোক্তি অলঙ্কার

১৪/১৫ পৃষ্ঠা অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র । শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল, ফেরে কোলাহলে ।
কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;
পাক্‌শাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তস্রোতে ;
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ।
ইত্যাদি ।

অতঃপর দেবরূপী প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন—যাহা হউক কোন সংস্কৃত ও সুসাধুভাষা শিক্ষিত ভাবুক ব্যক্তি মাইকেলি অমিত্রাক্ষর রচনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার কবিতায় যথেষ্ট কবিত্ব আছে। তাঁহার কবিতায় যে যে দোষ তাহা ক্রমশ উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। শিশু কালীপ্রসন্ন যে স্বভাবোক্তির উল্লেখ করিলেন তাহা বিশুদ্ধ স্বভাবোক্তি নহে, কারণ মধ্যে মধ্যে অলঙ্কার আছে। অপরঞ্চ লেখকের—

গর্ব্বপ্রকাশ

৪ [পৃষ্ঠা] তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী /৬৩/
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

অলঙ্কারাধিকা

১৩।১৪ পৃষ্ঠা দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রিদল, (১) যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর-বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, (২) বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
(৩) নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, (৪) করভসম নব বলে বলী;
কিম্বা (৫) বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে!
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি

বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে, বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
(৬) কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন /৬৪/
শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী
(৭) গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরীকামিনী,

এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে সাত সংখ্যক উপমা সংযোগ করিয়া লেখক পরিচ্ছেদ সম্বৃত প্রকৃত মূর্ত্তিকে দেখিতে দিতেছেন না।

১৯ পৃষ্ঠা হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন !
আভরণহীন দেহ, (১) হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, (২) নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, (৩) বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল-ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে ! (৪) শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; (৫) মুক্তকেশ মেঘমালা (৬) ; ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু ; (৭) অশ্রুবারি-ধারা
আসার ! (৮) জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক আসনে। /৬৫/

লেখকের নানাবিধ গুরুভার অলঙ্কারে এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদের কটিদেশ ত্রিভঙ্গ হইয়া গিয়াছে !

শ্রুতিকটুতা এবং অপ্রযুক্ততা বা দুরূহ

৩০ পৃষ্ঠা দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,

যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে !

৫৪ পৃষ্ঠা হাসিয়া কহিলা উমা ; "রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু ! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।"

৬১।৬২ পৃষ্ঠা স্মরিলে সে কথা, সখি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা-অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ, বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর !

৯৭ পৃষ্ঠা মহাশক্তি অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে ! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে ? দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে।

২৩৭ পৃষ্ঠা দেখিলা রাক্ষস-বল বাহিরেছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধ রূপী

২৮৩ পৃষ্ঠা কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।

অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ যথা, কম্বু, কঞ্চুক, অরুন্তুদ, মন্দ্রে, /৩৬/ ইরম্মদ, অবলেপ, বীতংস, কাকোদর. প্রক্ষেড়ন, কর্ব্বুর, ত্বিষাম্পতি, গরুৎমতী, প্রপঞ্চ, আনায় ইত্যাদি।

চ্যুত সংস্কৃতি বা উদ্ভট বিভক্তি

বিলম্বেন, অবগাহে, প্রভাতিল, বাহিরি, সম্ভাষি, লম্বিতে, সম্বরিব, স্নেহেন, নিরন্তিলা, অম্বুরিলা, লাঘবিলা, আবরেন, নির্বীরিবে, ত্রাণিবে, বৃষ্টিল, স্নানি, বিউনিল, রূপস, ভুয়ারী, বিহঙ্গিনী, সুকেশিনী ইত্যাদি।

অসমর্থতা

যে শব্দে যে অর্থ বোধ না হয়।

১২৬ পৃষ্ঠা কহিল দুর্ম্মতি
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)

ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি কহিনু তোমারে।

২৪৯।৫০ পৃষ্ঠা অনম্বর আঁধারি ধাইল

শিখর :—

২০৭ পৃষ্ঠা বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী

নিষ্কল, হায়রে মরি, কলাধর যথা

রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে।

২০৯ পৃষ্ঠা সুপট্ট শয়ন শায়ী তুমি ভীমবাহু,

সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?

২৭৬ পৃষ্ঠা কোন নারী খেদে

কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দ্দয় শকুনি

মৃতজীব আঁখি যথা) /৬৭/

প্রতারিত রোষ—কৃত্রিম রাগ

অনম্বর—আকাশ

নিষ্কল—তেজোহীন

বিরাগ—দুঃখ

কুড়িছে—উপাড়িছে।

নিহিতার্থতা অপ্রসিদ্ধ অর্থ বিশিষ্ট শব্দ

২৩৫ পৃষ্ঠা বিরাজিনু দশন শিখরে

আমি

এস্থলে শিখর শব্দের অর্থ অগ্রভাগ অপ্রসিদ্ধ।

১৯ পৃষ্ঠা সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে

বামাকুল

সুরসুন্দরী শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ অপ্রসিদ্ধ।

৫৮ পৃষ্ঠা রত্ন সঙ্কলিত আভা কৌষের বসনে।

কৌষের শব্দে বর্ণবিশেষ ইহা অপ্রসিদ্ধ।

ক্লিষ্টতা-জড়িতার্থ শব্দ বিন্যাস

২২৩ পৃষ্ঠা রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে !

গজরাজ-তেজঃ ভুজে, অশ্বগতি পদে,

স্বর্ণরথ শিরঃ-চূড়া ; অঞ্চলে পতাকা,
রত্নময় ; ভেরী, তুরী, দুন্দুভি, দামামা-
আদি বাদ্য, সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর, /৬৮/
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে !

কবি-প্রসিদ্ধ বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা

প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধতা

নাচে তারাবলী
বেড়ি দেবদিবাকর মৃদু মন্দ পদে।
তিঃ সং

৫০ পৃষ্ঠা (কৈলাস পর্ব্বত) সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর।

বিরুদ্ধ রসভাব

(প্রমীলাতে বীররস)

৮৪ পৃষ্ঠা পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজ-বলে
রঘুশ্রেষ্ঠে ; এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম ;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি,—
দানব-কুলের বিধি বধিতে সমরে ;
দ্বিষৎ-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে !
অধরে ধরি, লো, মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীর-পণা।
দেখিব, যে রূপ দেখি শূর্পনখা পিসী /৬৯/
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী বনে,
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে ;

গ্রাম্যতা

৮০ পৃষ্ঠা		এক দৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে বড়ে হড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।

খেদায়, গেনু, থেনু, ভৈঁই ইত্যাদি।

অনৌচিত্যদোষ

৫৯ পৃষ্ঠা		কহিলা শৈলেশ-সুতা ; "চল মোর সাথে,
হে মন্মথ ; যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা ; চল ত্বরা করি।"

৬০ পৃষ্ঠা		কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর।

৬১ পৃষ্ঠা		কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ?
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী :

মাতৃ সম্বোধন তৎপরে আদিরসের প্রবাহ : কি সারহীনের ন্যায় সন্দর্ভ হইয়াছে। কবি কালিদাস হরপার্ব্বতী সম্বন্ধে অনেক আদিরস লিখিয়াছেন, কিন্তু এমন কুৎসিত ভাবে কুত্রাপি তাহার অবতারণা করেন নাই বা রতিসহায় কামদেবের মুখ হইতে মাতৃ সম্বোধন করান নাই। /৭০/

বধু প্রমীলা-সম্বন্ধে শ্বশুর বিভীষণের উক্তি

৯৮ পৃষ্ঠা		নিবারে সতত সতী প্রেম আলাপনে
এ কালাগ্নি, যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী—

এতদ্ব্যতীত অনুপযোগী উপমা, সন্দিগ্ধতা, শব্দানৌচিত্য, কালানৌচিত্য, রসদোষ, তদ্ যদ্ ইদম্ শব্দদোষ, দুরন্বয়, প্রভৃতি শত শত দোষ আছে, কেবল সময়াভাব জন্য বলিতে অসমর্থ হইলাম।

মেঘনাদবধ কাব্য লেখক পুস্তকান্তর হইতে কবিত্ব রূপ মধু আহরণ করিয়াছেন, আমরা স্বীকার করি ; কিন্তু তাঁহার কবিত্ব মধুতে অনেক দূষিত

পরমাণু ও মধু ক্রমের কিয়দংশ মিশ্রিত আছে, তাহা নির্ম্মল করিয়া পাঠকদিগের পান করা উচিত, যেহেতু ঐ দুষ্ট দূষিত ভাগ গলাধঃকরণ করিলে দুর্ম্মতি মত্ততা মস্তকে প্রবেশ করিয়া টলাইয়া ফেলে, আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সামান্য রূপ প্রক্রিয়াতে উহার দোষভাগ দূর হইতে পারে না, মণিরামপুরে যে প্রকারে অঙ্গার ও বালির কূপ সহকারে গঙ্গাজল নির্ম্মলের আয়োজন আছে, সেইরূপ মাইকেলি মধুময় পদ্য লেখায় নির্ম্মলের আয়োজন করিলে পরে পরিশুদ্ধ বিমল মধুরস লাভ হইতে পারে, সহজে নহে।

রচনা শিক্ষার্থে মাইকেলি রচনা আদর্শ করিবার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট বস্তু নহে।

অধিক অলঙ্কার দিলে কবিতা সুন্দরীর স্বাভাবিক বিনোদিনী /১১/ মূর্ত্তি দেখা যায় না। সে ধারণা না থাকাতে মাইকেল তূপাকার অলঙ্কারে কবিতাকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন।

তাঁহার কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ছন্দই নহে—অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতি ও গুরু লঘু বর্ণের, স্থানের ও পরিমাণের নির্দ্দেশ থাকা উচিত, মাইকেলের লেখাতে সে সকল কিছুই নাই, তিনি কেবল অক্ষর গণনানুসারে এক ছন্দ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিয়া নাম দিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় পাঠকেরা সেই ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিয়া মানিতেছেন, কিন্তু প্রথমে গদ্য লিখিয়া অক্ষর গণনা দ্বারা ভাগ করিয়া লইলে মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে।

রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—"কবিরা দুই তিনটি কথা দ্বারা যে সকল অলঙ্কার নির্ম্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন দুই তিন পংক্তিও লাগিয়াছে। মাইকেলের আর একটা দোষ এই তিনি বোধ হয় অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করেন এজন্য তাঁহার রচনা দুর্ব্বোধ হয়। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল ও সর্ব্বদা প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা, চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে ইহাতে তাহার কিছুই নাই।" অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত আজি কালি অনেকের মতে বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এই কথাতেই তাঁহার নিজের অভিপ্রায় বোধ করা গিয়াছে। বিশে- /১২/ ষত মাইকেলের রচনা ও ছন্দের বিষয়ে দেশের লোকের যে কিরূপ অভিপ্রায়, তাহা ছুছুন্দরীবধ কাব্য উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্টরূপে প্রতীতি করিয়াছেন।

যদিচ হোমর, ভর্জিল, মিল্‌টন ও রামায়ণ অবলম্বন করিয়া মাইকেল মেঘনাদ লিখিয়াছেন, তথাচ তাঁহাকে কবিত্বের উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক বলা যাইতে পারে।

তিনি যদ্যপি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, শাব্দিক ও আলঙ্কারিকের দ্বারা তাঁহার পদ্যাদি রচনা সংশোধন করাইয়া লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুস্তক অতীব প্রশংসিত হইত।

কোন প্রসিদ্ধ স্তাবক[১] লিখিয়াছেন যে "অমিত্র ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্পকালের মধ্যে এই পয়ার প্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবে—একথা কাহার মনে ছিল, কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃ-প্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।"

বঙ্গমণ্ডলীতে নহে কেবল কতিপয় সামান্য শ্রেণীর বিষয়ী লোকের ও লেখকদিগের উৎসাহদাতা মহাশয়গণের নিকট তাহা প্রদীপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত, কি সাধুভাষায় সুশিক্ষিত কোন ব্যক্তির নিকট মাইকেলের যশঃ প্রদীপ্ত হয় নাই।

মাইকেলের স্তাবক লিখিয়াছেন "পূর্ব্বে আমারও সংস্কার ছিল যে, মেঘনাদ বধের শব্দ বিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য্য এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্ব্বে ক্ষান্ত হই নাই। কিন্তু (সেই) গ্রন্থখানি বারম্বার আলোচনা করিয়া আমার সেই /১৩/ সংস্কার দূর হইয়াছে।" হইতে পারে। অন্ধ-কূপে প্রবেশ মাত্র কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু যেমন তথায় বহুক্ষণ বাস ও বারম্বার ভ্রমণ করিলে কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ মাইকেলের নানা স্থানের অন্ধকূপ স্বরূপ রচনাকূপে বসতি ও বারম্বার ভ্রমণ করিয়া স্তাবক তাঁহার রচনা চাতুর্য্য কিছু কিছু অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

স্তাবক পুনশ্চ লিখিয়াছেন, "প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; বঙ্গভাষায় অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য্য।" ঐরূপ বলিতে কি বুদ্ধিমান লোকেরা অদ্যাপি নিরস্ত হইয়াছে? স্তাবক পরে লিখিয়াছেন যে "এই গ্রন্থ খানিতে (মেঘনাদ-বধ কাব্যে) গ্রন্থকর্ত্তা যে অসামান্য কবিতা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়।"

১ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহা না বলিয়া—এই গ্রন্থ খানিতে (মেঘনাদবধ কাব্যে) হোমর, ভর্জিল, মিল্‌টন ও সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের ভাব আনিয়া মাইকেল কৌশলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এই বলিলেই হইত।

“কবিগুরু বাল্মীকি প্রভৃতি মহা কবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যে বিরচিত করিয়াছেন।” কিন্তু সেই কুসুমরাজি মূল বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তিনি তাহা পর্য্যুষিত ও নির্গন্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক উক্ত মেঘনাদবধ কাব্য পুস্তকে নানা বিষয়ক নানাবিধ অপ্রাসঙ্গিক ভাব, স্তূপাকারে উপস্থিত করা হইয়াছে, কিন্তু সে সকল স্পষ্টরূপে সহসা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। /১৪/ উহাতে বহুতর অপ্রাসঙ্গিক ভাব আছে, এই হেতু ঐ পুস্তককে আমরা অসামঞ্জস্য ভাব সমষ্টির আকর বলি।

তর্কবাগীশ মহাশয় এইরূপ বলিয়া শেষ করিলে, কালীপ্রসন্নের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে কম্পমান ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, অগ্ন্যুৎপাত হইলে লোকে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, তিনি সেইরূপ করিয়া বলিলেন, কি! মাইকেলের কবিতার দোষ কীর্ত্তন! ইহা শুনিয়া কে স্থির হইতে পারে? কি অন্যায়! উগ্রভাবে ইত্যাকার উক্তি করিলে প্রিন্স্ কহিলেন, কালীপ্রসন্ন! তোমার ন্যায় অনভিজ্ঞ শিশুর ও বিদ্যামন্দির হইতে অল্প কাল বহির্গত তরুণ জনের কিম্বা বিষয়ী লোকদিগের অভিরুচির উপর নির্ভর করিয়া আমরা মাইকেলি কবিতার মীমাংসা করিতে পারি না এবং কবিকল্পদ্রুম সদৃশ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মত আমরা অন্যথা করিতে পারি না। বৎস! স্থির হও, কালে তোমার ও তোমার ন্যায় বিবেচকদিগের জ্ঞান পরিপক্ক হইলে এ সকল বিষয়ের দোষ গুণ বিচার করিতে সক্ষম হইবে। প্রিন্স্ এইরূপ বলাতে কালীপ্রসন্ন মৌনাবলম্বন করিলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কবিতা রচনার বিবরণ বলিয়া শ্রান্ত হইলে, বেদান্তবাগীশ, প্রিন্স্ মহোদয়ের অনুমতি লইয়া তদ্বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাত্মন্ প্রিন্স্—আধুনিক কবিদিগের মধ্যে আমরা বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে যথেষ্ট প্রশংসা করি; তাঁহার লেখা দেখিলে অনায়াসে

বোধ হয়, তিনি অতি যোগ্য লোকের /৭৫/ নিকট কবিতা রচনার শিক্ষা পাইয়াছিলেন। লেখাতে তাঁহার সবিশেষ অভ্যাস জন্মিয়াছে; অন্যান্য অনেক আধুনিক গ্রন্থকারদিগের ন্যায় তিনি স্বয়ং সিদ্ধ হয়েন নাই, তাহাতেই তাঁহার কবিতা এত গুণ সম্পন্ন হইয়াছে। স্বয়ং সিদ্ধ মহাশয়গণের দৃষ্টান্তানুসারে বর্ষা নদীর মত তিনি ভ্রমযুক্ত-কবিতা-স্রোতঃ নিঃসরণ করেন নাই আহা! তাঁহার কবিতার কি রমণীয় ভাব ও লালিত্য! তাহা শ্রবণ করুন।

অতিশয়োক্তি অলঙ্কার

কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা নিকর॥

উৎপ্রেক্ষা

তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে॥
কোথাও তটিনী কুল, কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে॥
যেন রঘুপতি হৃদে হীরকের হার।
ঝল্ মল্ ভানু-করে করে অনিবার॥

কোষ মুক্ত অসি পুঞ্জ ধক্ ধক্ জ্বলে।
দিনকর কর যেন জাহ্নবীর জলে॥

স্বভাবোক্তি অলঙ্কার

বিবিধ বিহঙ্গ নানা স্বরে গান করে। /৭৬/
সন্তাপির তাপ দূর, মন প্রাণ হরে॥
সরসী সরিৎ সিন্ধু শেখর সুন্দর।
গহন গহ্বর বন নির্ঝর নিকর॥
দিনকর নিশাকর নক্ষত্র মণ্ডল।
মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল॥
আয় মন! চল্ যাই সেই সব দেশে

বর্ষায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে ॥
দেখিবে বিচিত্র শোভা শৈল আর জলে।
শ্রবণ জুড়াবে তটিনীর কল কলে ॥
কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ।
শরীর জুড়াবে, যাবে সমুদয় ক্লেশ ॥

দৃষ্টান্ত অলঙ্কার

যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকসিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক ভাগ্যে কেবল চীৎকার ॥
মাধবী মাকন্দ-কায়, প্রকাশিত প্রতিভায়,
বল তাহে কি শোভা অতুল।
আকন্দের দেহ পরে, যদ্যপি বিরাজ করে,
দেখিলে নয়নে বিঁধে শূল ॥

উপমা

অবলা তরল তৃণ তরঙ্গের প্রায়।
যে দিগে বাতাস বহে সেই দিগে ধায় ॥ /৭৭/

বীররস

মহাঘোর যুদ্ধে মুসলমান মাতে।
দিবারাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে ॥
সহস্রেক যোদ্ধা চিতোরেশ-পক্ষে।
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষে লক্ষে ॥
বহে রক্ত-ধারা বুঁদেলা-শরীরে।
হয় স্নাত সেনা ঘন স্বেদনীরে ॥
গুড়ুম গুম্ গুড়ুম্ গুম্ মহাশব্দ তোপে।
পড়ে সৈন্য ঠাটে তরোবার—কোপে ॥
গুলী পূর্ণ বন্দুক সঙ্গীন ঝাঁকে।
দুড়্দ্দুড়্ দুড়্দ্দুড়্ হুড়্মুড় হাঁকে ॥

করে বাত্ত নানা শিঙ্গা ঢোলে ঢাকে।
রণক্ষেত্র—ধূলা রবেলোক ঢাকে ॥
শনন্ শন্ শনন্ শন্ গুলী পুঞ্জ ছোটে।
সিপাহীর বক্ষে শিলাবৃষ্টি ফোটে ॥

করুণরস

অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ বিমুদিত নেত্রে পড়ি—
যে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া প্রিয়তম,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি
যে অধর সুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর,
ছিল প্রেয়সীর প্রিয়ধন। /৭৮/
সেই অধরেতে আসি, বায়সী সুখেতে ভাসি,
চক্ষে চঞ্চু করিছে ঘাতন।
ওরে ও কৃষক কাল! কি কর্ষিছে তব হাল?
জঞ্জাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায়।
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যত গাছ,
অনায়াসে উপাড়িয়া যায় ॥
সুকৃষক সেই হয়, পরিপক্ক শস্ত চয়,
সে করে ছেদন সমুদয়।
তুই কাল নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্ত চয় ॥
ধিক কাল কালামুখ! ভারতের কোন সুখ,
না রাখিলি ভুবন-ভিতর।
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর,
সব খেয়ে ভরিলি উদর ॥
কি আছে এখন আর. দাসত্ব শৃঙ্খল সার,
প্রতিপদে বাঁধা পদে পদে।
দুর্ব্বল শরীর মন, ম্রিয়মান হিন্দুগণ,
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষ মদে ॥

উল্লেখ অলঙ্কার

গদা যুদ্ধে গুণধাম, কিবা দেব বলরাম,
কিবা ভীম কিবা দুর্য্যোধন। /৭৯/
কিবা দ্রোণ কৃত দীক্ষা, অপরূপ শর শিক্ষা,
লক্ষ্য ভেদে নর নারায়ণ।

মধুসূদন বাচস্পতি সঙ্কলিত বসন্তসেনা পুস্তকের গদ্য ভাগের কতিপয় পংক্তি এই সভাসীন মহাত্মাগণকে চন্দ্রমোহন অবগত করাইয়া তাঁহার গদ্য রচনার পরিচয় দিয়াছেন, আমি সেই গ্রন্থ হইতে পশ্চাৎ যে পদ্য পংক্তি নিচয় মহাত্মাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিব, তাহাতে বাচস্পতি মহাশয়ের অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইবেন। ফলতঃ বাচস্পতি মহাশয়ের ন্যায়, মহোপাধ্যায় পণ্ডিত জনেরই কবিতা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত, সংপ্রতি যে সে কবিতা লিখিয়া বঙ্গভূমিকে পুনঃ পুন লজ্জা নীরে নিমগ্ন করিতেছেন।

ভ্রান্তিমান অলঙ্কার, অদ্বিতীয় উৎপ্রেক্ষা ও
রূপকাদি মিশ্রিত দীর্ঘ ললিত

তমোরাশি বিনাশিয়া, প্রাচী দিক প্রকাশিয়া,
উদয় ভূধরে শশী, দেখ ঐ আসিছে।
উষা করি অনুভব, ডাকিছে বিহগ সব,
পাপ নিশা গেল বলি মুদ-ভরে ভাসিছে।।
বিলম্ব নাহিক আর, দেখ দেখ চন্দ্রমার,
রেখা দেখা যায় ঐ, ক্রমে তমঃ টুটিছে।
যেন যমুনার জলে, রাজহংস কুতূহলে,
ডুবে ছিল পুনরায়, ক্রমে ক্রমে উঠিছে। /৮০/
প্রিয়তম প্রিয় পেয়ে, প্রতীচীর পানে চেয়ে,
প্রাচী দিক কৌমুদীর, ছলে যেন হাসিছে।
সতিনীর কাছে পতি, দেখিয়া দুঃখিতা অতি,
প্রতীচী তিমির শোক—নীরে যেন ভাসিছে।।
দেখ ঐ সুধাকর, প্রকাশিছে সুধা কর,
দিগঙ্গনা দীপ জ্বালি, যেন গৃহে রাখিছে।

প্রদীপের পিছে তমঃ, এ দীপের অনুক্রম,
সম্মুখে তিমির রাশি, প্রতীচীরে ঢাকিছে ॥
অর্দ্ধভাগে জ্যোতিঃ নাই, শোভা হীন শশী তাই,
উজ্জ্বল অপর ভাগ দুইরূপ হয়েছে।
বুঝি বিয়োগীর শাপে, অর্দ্ধাঙ্গ ঘেরেছে পাপে,
সংযোগীর বরে অর্দ্ধভাগে, কান্তি রয়েছে ॥

বাবু নীলমণি বসাক, গদ্য রচনায় অতি প্রসিদ্ধ, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি পদ্য রচনাতেও বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন। গ্রন্থান্তর হইতে অনুবাদ কিম্বা সঙ্কলন করিয়া যে পুস্তক প্রস্তুত করা হয়, তাহার রচনা প্রণালী দেখিলেই অনুভব হইতে থাকে, যে, সে পুস্তক, গ্রন্থান্তর হইতে অনুবাদিত কিম্বা সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু বাবু নীলমণি বসাক কি এক চমৎকার প্রণালীতে পারস্য ভাষা হইতে পারস্য উপন্যাস বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, যে তাহা দেখিলে অনুবাদ বোধ হয় না ; বোধ হয় যেন তিনি পারস্য উপন্যাসের আদি রচয়িতা ; তাঁহার ললিত রচনা, এইরূপ ভাবগর্ভ। /৮১/

গৃহ মধ্যে দেখে ভূপ নারী-রূপ নিধি।
শশহীন শশি যেন গড়িয়াছে বিধি ॥
যদ্যপি অচির প্রভা চির প্রভা হয়।
তথাপি রূপের তুল্য কোন রূপে নয় ॥
কিবা চারু যুগ্ম ভুরু শোভে অতুলিত।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত ॥
কুঞ্চিত কুন্তল জাল জিনি জলধর।
প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন মুখ মনোহর ॥
আহা মরি হেন স্থান কভু দেখি নাই।
নানা জাতি বৃক্ষ হেরি যেই দিকে চাই ॥
স্থানে স্থানে সরোবর পরিপূর্ণ জলে।
চারি পাশে শোভে বৃক্ষ শাখা নম্র ফলে॥

বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী কৃত কবিতার অনির্ব্বচনীয় মধুরতার সহিত একণকার অনেক ব্যক্তির কবিতা-মধুরতার তুলনা করা যাইতে পারে না।

যতপিও তাঁহার বঙ্গসুন্দরী প্রায় আদিরসে পরিপূর্ণ, তথাচ উহাতে কুৎসিত অশ্লীলতা নাই। আধুনিক অনেক লেখকের বিরস ছন্দোনিচয়ে শ্রবণেন্দ্রিয় অতি কষ্ট ভোগ করিয়াছে। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বঙ্গসুন্দরীর সুচারু ছন্দ আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় যথেষ্ট পরিতৃপ্ত করিয়াছে। তাঁহার কবিতা যেরূপ তাহা শ্রবণ করুন।

জগতের তুমি জীবিত রূপিণী,
　　জগতের হিতে সতত রতা; /৮২/
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী
　　বিজন কানন কুসুমলতা

পূরণিমা চারু চাঁদের কিরণ,
　　নিশার নীহার, উষার আলা,
প্রভাতের ধীর শীতল পবন,
　　গগনের নব নীরদমালা।

অধিষ্ঠান হ'লে কুঁড়ের ভিতরে,
　　কুঁড়েখানি তবু সাজে গো ভাল,
যেন ভগবতী কৈলাস শিখরে,
　　বসিয়া আছেন করিয়া আলো।

নাহিক তেমন বসন ভূষণ,
　　বাকল বসনা দুখিনী বালা;
করে দুই গাছি ফুলের কাঁকণ,
　　গলে এক গাছি ফুলের মালা।

করম ভূমিতে পুরুষ সকলে,
　　খাটিয়া খাটিয়া বিকল হয়;
তব সুশীতল প্রেমতরু তলে,
　　আসিয়া বসিয়া জুড়ায়ে রয়।

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন ;
মধুর তোমার চরিত উদার
মধুর তোমার প্রণয় ধন

তুমি সুপ্রভাত, ভাবনা আঁধারে, /৮৩/
যে আঁধার সদা রয়েছে ঘেরে ;
যেন মোহ থেকে জাগাও আমারে,
দূরে যায় তম তোমায় হেরে।

বিষণ্ণ জগত তোমার কিরণে
বিরাজ বিনোদ মূরতি ধরি,
কে যেন সন্তোস ডেকে আনে মনে
দেয় সুধারসে হৃদয় ভরি।

আননে লোচনে স্বরগ প্রকাশ
হৃদয় প্রফুল্ল কুসুমভূমি ;
জুড়াতে আমার জীবন উদাস,
ধরায় উদয় হয়েছ তুমি।

হৃদয়েরো প্রিয় মূর্ত্তি মধুরিমা,
কেঁপে কেঁপে হেলে পড়িছে কেন
বিজয়া-বিকালে সোনার প্রতিমা
দুলে দুলে জলে ডুবিছে যেন।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত কবিকল্পনার সংযোগ হওয়াতে কাব্য অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কতদূর উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক নাই, মহাশয়েরা শ্রবণ করিলেই অনুভব করিতে পারিবেন। অতএব শ্রবণ করুন—

দিবা অবসান প্রায় ; নিদাঘ ভাস্কর
বরষি অনল রাশি, সহস্র কিরণ, /৮৪/

পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর-তরু-রাজি-শিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কল কলে, মন্দ সমীরণ,—
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী জীবনে।

ধন্য আশা কুহকিনী তোমার মায়ায়—
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
দুর্ব্বল মানব-মনোমন্দিরে তোমার—
যদি না সৃজিত বিধি ; হা'য়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে ;
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ, প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র, নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা, পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞান-দেবী ছাড়িয়া আবাস ;
উন্মাদ-শার্দ্দূল তাহে করিত নিবাস।

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ ;
আতর গোলাপ গন্ধে হইয়া অচল, /৮৫/
বহিতেছে ধীর গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ ;
শোভে পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, কামিনী-কুন্তলে,
কোমল কামিনী কণ্ঠে কুসুমের হার
দেখেছ কেমন ওই সুন্দরীর গলে
শোভিতেছে মালা আহা! দেখ একবার ;
দীপমালা পুষ্পমালা, রূপের কিরণ,
করিয়াছে যামিনীর উজ্জ্বল বরণ।

গভীর নীরব এবে নবাব শিবির,
দাস দাসী কক্ষে কক্ষে জাগিছে নীরবে ;
কেবল জ্বলিছে দীপ ; বহিছে সমীর,
সশঙ্কিত চিত্তে যেন সর সর রবে।
ঘন ঘন নবাবের মলিন বদনে
বিকাসিছে স্বেদ-বিন্দু উৎকট স্বপন ;
পর্য্যঙ্ক উপরে বসে বিষাদিত মনে,
পূর্ব্ব পরিচিত সেই রমণী রতন ;
রুমালে কোমল করে সেই স্বেদ-জল,
নীরবে বসিয়া বামা মুছিচে কেবল।

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক সিন্ধু জলে ?
যাও তবে, যাও দেব, কি বলিব আর ?
ফিরিওনা পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে ; /৮৬/
কি জন্যে বলন, আহা ! ফিরিবা আবার ?
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন ;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ ;

এস সন্ধ্যে ! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার—
নক্ষত্র-রতন-রাজি করে ঝলমল ?
কিম্বা শুনে ভারতের দুঃখ সমাচার,

কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল ;
তাহে এই রক্ত বিন্দু হয়েছে নির্গত ?
এস শীঘ্র, প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,
লুকাও ভারত মুখ দুঃখে অবনত ;
আবরিত কর শীঘ্র এই রণ স্থল ;
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও এ অভাগাদের বিকৃত বদন।

বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণ পুস্তকে কবি-কল্পনায় বিশেষ চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন ; কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া তাঁহার গুণানুবাদ করিতেছি এমন নহে, শ্রবণ করিলেই তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইবেন, অতএব শ্রবণ করুন।

চল্ দেখি যাই, ওই ঠাঁই, যদি আরাম পাই,
ফাঁকায় গিয়া। /৮৭/
ঘরে যেন বিছে, দংশিছে, অনল বাহিরিছে,
শরীর দিয়া!
গগনে নক্ষত্র, যত্র তত্র, কাননে ফুল-পত্র,
পবনে দুলে।
নয়ন দুর্লভা, নারীসভা, তা সবে নিষ্প্রভা
করিয়া তুলে।

জুঁই তুলে নুয়ে, মৃদু ছুঁয়ে, কেহ কুড়ায় ভুঁয়ে
বকুল-গাদা।
পাড়ে চাঁপা ফুলে, বাহু তুলে, পায় গোলাব-মূলে,
কাঁটার বাধা॥
ভাল ফুল খুঁজি, করে পুঁজি, লতার সনে জুঝি,
নিকুঞ্জ ঘুঁটে।
পিক পেয়ে নাড়া, দিল সাড়া, পল্লব দিয়া ঝাড়া,
হরিণ উঠে॥
কল্পনার মন, ক্ষণে ক্ষণ, ফিরিছে ত্রিভুবন,
কবির সাথে।
ক্ষণে আঁখি দুটি, ভরি' উঠি, অলক ভিজাইছে,
পলক পাতে॥

শবের সে বুকের উপরে চড়ি,
মুখে ঢালি দের মন্ত, ভয়ানক মন্ত্র পড়ি পড়ি।
ক্ষণে ক্ষণে শব করে আর্ত্তস্বর ;
ক্ষণেক চেতন পেয়ে, উঠে ধড়মড়ি। /৮৮/

ভৈরব করিতে থাকে মন্ত্র জপ ;
মর মর শবদ করিয়া উঠে শ্মশান-পাদপ।
রহিয়া রহিয়া মাঠ-মধ্য দিয়া
আলেয়া চলিয়া যায় করি দপ্ দপ্।।

লোল জিহ্বা নাড়িছে বীভৎস-রস ;
ঘেরিয়া ঘেরিয়া নাচে, ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস।
মৃত নাড়ি-ভুঁড়ি করে ছেঁড়া-ছিড়ি,
মেদ-রক্ত পান করে কলস-কলস।।

হয়ো সিংহ নাড়িয়া-বেড়ায় জটা ;
থমকিয়া হাই তুলে, পরকাশি' দশনের ছটা।
কভু হয়ো বাদ করে তাগ-বাগ,
আরম্ভে তাহার পর গরজন-ঘটা।।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত কবিতাবলির ভারত ভিক্ষা উপাখ্যানে বিচিত্র কবিশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে ; স্বর্গ সভাস্থ দেবরূপী মহাত্মাগণের গোচরার্থে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি, অনুকম্পা পুরঃসর শ্রবণ করুন।

ত্যজি শয্যা তল, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
গভীর পাণ্ডুর বদন-মণ্ডল
আলোকে প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল
কহিল উচ্ছ্বাসে ভারত মাতা— / ৮৯ /
"কেন রে এখানে আসিছে কুমার ?
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার !
কি দেখিবে আর আছে কি সে দিন ?
ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া ছুটিত যে দিন
ভারত সন্তান নৈঋত ঈশান,
মুখে জয় ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাহিত গাথা !

"ভারতে কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত জীবনে জগত জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র আলাপন,
আছিল যখন ষড় দরশন —
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে
ফিনিক, সিরীয়, য়ুনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।
ছিল যবে পরা কিরীট কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
জলন্ত অনল সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া কেহ পরশি,
ডাকিত যখন 'জননী' বলিয়া / ৯০ /
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া
ছিলাম তখন জগত মাতা।
"নাহি কি সলিল, হে যমুনে গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক রাশি
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি
ভারত ভুবন ভাসাও জলে ?
হে বিপুল সিন্ধু করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল জলে ?
এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,

শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করে ভূমণ্ডলে,
জগত ব্রহ্মাণ্ড নখর দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে ;
সমর হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব আকাশ মণ্ডল —
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে !
যখন জৈমিনী, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি, / ২১ /
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ,
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তো
শাক্য সিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,
তখন (ও) তাহারা ঘৃণিত নহে ।

কিন্তু বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা নির্দোষ নহে ।

যতি ভঙ্গ

বৃত্র-সংহার

১১ পৃষ্ঠা কোন দেব অগ্রে ইন্দ্রে করুন উদ্দেশ
পশ্চাৎ যুদ্ধ কল্পনা হৈবে সমাপিত ।।

১৬ পৃষ্ঠা দানব রমণী ঐন্দ্রিলা সেখানে
শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে ।।

১৭ পৃষ্ঠা নিত্য এ থর্ব্বতা জ্ঞান, আকুল করে পরাণ ।

৭০ পৃষ্ঠা জ্বলিলা যে যশোদীপ প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে ।

৯৯ পৃষ্ঠা রাখিবে আমার কথা, কখন নহে অন্যথা,

বৃত্রসংহারের প্রিয় পাঠকেরা বলেন, উক্ত পুস্তকের কবিতায় যতিভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া সমালোচকেরা কেন এত চমৎকৃত হয়েন ; সংসারের সর্ব্বত্রই

ভঙ্গভাব বিরাজ করিতেছে, এমন যে কুলীনের গৌরবের কুল, তাহা ভঙ্গ হইয়া যায়, এমন যে দম্পতি-প্রণয় তাহাও ভঙ্গ হয়, এমন যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি ত্রিভঙ্গ হইয়া ব্রজে কত কেলিকলাপ নিষ্পাদন পূর্ব্বক ব্রজবাসীদিগের / ৯২ / চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন ; অতএব যতিভঙ্গের প্রতি সমালোচকদিগের দ্বেষভাব কেন ?

উক্ত পুস্তকের ব্যাকরণ দোষ

৪২ পৃষ্ঠা তুমি আর রতির কুশল

তব হওয়া চাই

৪২ পৃষ্ঠা বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্প ধনু পৃষ্ঠে ফেলি

বেড়াইতে মনোহর বেশ

বেশে হওয়া চাই

৪৭ পৃষ্ঠা দাসত্বে যাইত সবে শচী

দাসত্ব সঙ্গত হয় না

লজ্জাস্কর, তিষ্টিতে, রাত্রি দিবা, অহনিশি

কিবম্বিধ—

দুরূহ

৪ পৃষ্ঠা অমরত: পরিণাম পরিশেষে যদি

দৈত্যপদ রজঃপৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ

৭ পৃষ্ঠা অথবা বর্জ্জিত হয়ে দেবত্ব আপন

থাকিতে হইবে স্বর্গে কন্দর্প সে কথা

অসুর উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর

অসুর পদাঙ্ক রজ শোভিত মস্তকে।

এস্থলে কন্দর্প, পুষ্ট কলেবর, শোভিত মস্তকে এ তিন পদের কি সম্বন্ধ জানা ভার।

[১২]প্রতি অনেক ভাবক বৃত্রসংহার কাব্য-প্রণেতাকে মহা-/ ৯৩ / কবি বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন ; তদনুসারে তিনি, মহাকবির ন্যায় সমস্ত গুণ সম্পন্ন হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়াই বুঝি মহাকবি ব্যাসদেব যেমন পুরাণের স্থানে স্থানে কোন কোন প্রস্তাব বর্ণনা উপলক্ষে জটিল ও দুরবগাহ করিয়াছেন, (লোকে

যাহাকে ব্যাসকূট আখ্যা দিয়াছেন,) সেইরূপ ব্যাসদেবের ন্যায় মহাকবি মধ্যে গণনীয় হইবার ইচ্ছায় হেমবাবু বৃত্রসংহার পুস্তকের স্থানে স্থানের বিবরণ এত জটিল ও দুরবগাহ করিয়া লিখিতে যত্ন পাইয়াছেন যে, সেই সেই স্থানকে হেমকূট না বলিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধ

৬ পৃষ্ঠা   অমর আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার

আত্মার ধ্বংস অপ্রসিদ্ধ

৪২ পৃষ্ঠা   আছত আছত ভাল, গোরা ছিলে হৈলে কাল,

কন্দর্প গৌরাঙ্গ নহে

অনৌচিত্য দোষ

মাতা ঐন্দ্রিলা, পুত্র রুদ্রপীড়কে জিজ্ঞাসিতেছেন।

১৬২ পৃষ্ঠা   কিরূপ বসন ভূষা, চলন কিরূপ ;

কত বয়ঃ কার মত, কিবা তার রূপ ;

হাব ভাব হাসি ভঙ্গি, নাসা ওষ্ঠাধর,

বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নখর,

৪১ পৃষ্ঠা   ইন্দিরার প্রিয় পদ্ম   সুধাকান্ত সুধা সদ্ম,

কত সুখে লইত কমলা। /৯৪/

এবে সে ছোঁবেনা আর হাতে তুলে দিলে তাঁর,

শচির পরশ এবে মলা!

পূজনীয়া কমলাকে, "সে, ছোঁবেনা" ইত্যাদি অগৌরব বাক্য প্রয়োগ করা উচিত হয় নাই।

৭০ পৃষ্ঠা   "চিন্তা দূর কর স্থির হওগো জননী

আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসব-ঘরণী"

পুত্র হইয়া মাতাকে বাসব-ঘরণি বলিয়া সম্বোধন করা উচিত হয় নাই।

বাবু রাজকৃষ্ণ রায়, বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কবিগণের কবিতার বিবরণ এই সুর-সভায় ভবিষ্যৎ অধিবেশনে বলিব মানস আছে।

দুই এক মহাশয় ব্যতীত এক্ষণে বঙ্গ ভাষার কোন ইংরাজী-শিক্ষিত খঞ্জনী-ভায়ারা, নির্দোষ কবিতা লিখেন নাই, পরেও যে তাহা লিখিবেন, সে আশাও নাই; কবিতা-সম্বন্ধে ইঁহারদিগের রুচিই অপ্রশংসনীয়। ইঁহারা যে সকল শব্দ মনোনীত করেন, তাহা সুশ্রাব্য নহে, ইঁহাদিগের কবিতা যতি-বর্জ্জিত, সাধু, অসাধু, গ্রাম্য ও দেশান্তরীয় ভাষাতে বিমিশ্রিত। কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া স্থান ভ্রষ্ট করিয়া ইঁহারা কবিতা রচনা করেন; যদ্যপিও কবিতাতে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া স্থান ভ্রষ্ট করিবার রীতি আছে; কিন্তু ইংরাজী-শিক্ষিত খঞ্জনী ভায়ারা যেরূপ ইংরাজী প্রণালীতে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া স্থান ভ্রষ্ট করেন, বঙ্গ ভাষার কবিতায় সে প্রণালী অবলম্বন করিলে কবিতা কুৎসিত হয়। / ২৫ / ইঁহাদিগের রচনায় ব্যাকরণ যে কোথায় থাকে, তাহার নির্ণয় পাওয়া ভার; ইঁহারা কেহই অলঙ্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবিতা লিখিতে পারেন না। অলঙ্কার-বিরুদ্ধ কবিতা কখনই মনুষ্যের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। কোনকোন কবি অলঙ্কার না জানিয়াও কবিতাও লেখেন, কি জানি তাহাও দৈবকর্ত্তৃক অলঙ্কার বিরুদ্ধ হয় না ও কবিতা অতি সুচারু হয়। যাহা হউক উক্তরূপ দৈব নিবন্ধনের উপর সকলেরই নির্ভর চলে না।

শাস্ত্র

ইংরাজী-শিক্ষিতদিগের অনেকের নিকট শাস্ত্র এক হাস্তাস্পদ ও অসংলগ্ন পদার্থ হইয়াছে। যবন রাজ্যেশ্বরেরা এতদ্দেশীয় যে সকল লিপিবদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বেষাতিশয্যে বিনষ্ট করিয়াছিলেন; সেই সকলের অভাবে ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া পূর্ব্বতন পণ্ডিতবর্গ স্বীয় স্বীয় স্মরণ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্মরণ শক্তি তত ভ্রম শূন্য নহে, সেই হেতু সেই সকল সংগৃহীত শাস্ত্রে অনেক বৈষম্য ও অসংলগ্ন বিবরণ শ্রবণ করা যায়— কোন কোন শাস্ত্রের যে পত্রে কোন বিষয় বিধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পত্রান্তরে তাহা আবার নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত। যাহা হউক মূল শাস্ত্র কোন ক্রমে অসার পদার্থ নহে, তাহার সারবত্তা ও মর্ম্মার্থ এতদূর পরিপক্ক যে, পুনঃ পুনঃ কুতর্ক করিয়া তাহা অবৈধ প্রতিপন্ন করা কাহারও সাধ্য নহে। তবে আজকাল /৯৬/ অনেক সুবিজ্ঞাভিমানীগণ অনেক স্থলের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া রজ্জুকে সর্প-জ্ঞানের ন্যায় আপাতত যেরূপ বুঝিয়া লন, তাহা লইয়াই আপনা-দিগের অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া জনসমূহকে বিষম ভ্রমে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক নির্ব্বোধগণ তাহাতেই সমস্ত শাস্ত্র ভ্রান্ত মনে করিয়া প্রত্যেকেই ধর্ম্ম-শাস্ত্রের শুক সনাতন প্রভৃতি হইয়া বসেন। এক্ষণে কি বঙ্গ কি ইয়োরোপ কি অন্যান্য দেশস্থ লোক যে বিষয় সার স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, বিশেষ রূপে আন্দোলন করিলে তাহার অসার ভাগ সাধারণের চক্ষে প্রকাশ পাইতে থাকে। লিপিবদ্ধ শাস্ত্রাংশ সে প্রকার অসার প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ নহে; তাহা অসার বলিয়া কেহ কোন কালে প্রতীত করিতে পারেন নাই, পরে যে কেহ (এক্ষণকার উপক্রমণিকাপাঠী ঋষিকুল ব্যতীত) পারিবেন, এ আশঙ্কাও হয় না। বালক স্ত্রী কৃষী প্রভৃতি সামান্য লোকেরাও অধুনা শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি তর্ক ও পরিহাস করিতে ক্ষান্ত হয়েন না, তাঁহারা জানেন না যে শাস্ত্র এমন অসার পদার্থ নহে যে, তাঁহাদিগের অকিঞ্চিৎকর তর্ক বলে তাহা ম্লান ভাব ধারণ করিবে? শাস্ত্র স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য ভাবে লিপিবদ্ধ আছে, এজন্য ভাবী ঘটনার মীমাংসা-পক্ষে প্রায় ভ্রমশূন্য।

মনুষ্যকে যে শাস্ত্রের উপদেশানুসারে চলিতে হয়, সে একরূপ শাস্ত্র ও সাহিত্য নাটকাদি কাব্য আর একরূপ শাস্ত্র; যাহা পাঠে চিত্ত বিনোদন করে, যাহার ঘটনা সকল বাস্তবিক নহে, সুতরাং তাহার উপদেশানুসারে কোন কর্ম্ম

করিতে /২৭/ হয় না। এক্ষণকার ভ্রান্ত লোকেরা সেই অবাস্তবিক ঘটনাদি শাস্ত্রে বর্ণিত দেখিয়া ঘৃণা ও নিন্দা করেন ও তদনুসারে মনুষ্যের চলিতে হইবে বিবেচনা করেন। যাহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি নাহি তাহা ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে; অনেকে সংস্কৃত লিপিবদ্ধ পুস্তক হইলেই তাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্থির করেন, এমন কি অনেকের ধারণা আছে রঘু মাঘ রত্নাবলী বিক্রমোর্ব্বশী মেঘদূত প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম্ম পুস্তক।

অনভিজ্ঞ খঞ্জনী-তায়াদিগের ধারণা আছে, শাস্ত্র কিছুই নহে, উহা পরিত্যক্ত মলিন বস্ত্রের ন্যায় অপকৃষ্ট, কিন্তু আমরা বহুজন বহুবর্ষ চিন্তা করিয়া যে বিষয়ের যেরূপ স্থির করি, সৌভাগ্য ক্রমে শাস্ত্রে পাঠ কি শ্রবণ করিতে করিতে দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রকারেরা সে বিষয় এত সূক্ষ্ম ও সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা আমারদিগের ক্ষীণ বুদ্ধির ধারণায় বহুকালে উদ্ভূত হয় নাই। পরম্পরাগত শাস্ত্রের নিয়মে না চলিলে সকল লোকে এত দিনে কিসে কি করিয়া আপনাদিগের অপকার করিতেন বলা যায় না; বঙ্গবাসীরা যাহা করেন, তাহা তাঁহাদিগের নিজ নিজ সিদ্ধান্ত দ্বারা কিছুই হয় না, তাঁহারা পরম্পরাগত শাস্ত্রের আদেশানুসারে সকলই করেন, তাহাতেই শ্রেয় হয়, এক্ষণে যিনি তাহার অন্যথা করেন, তিনি ঘোর বিপদে নিপতিত হয়েন। এক্ষণকার অনেক মহাশয় যাহা শুনিয়া করেন, তাহাও শাস্ত্রের অভিপ্রায়; যাহা আপনা আপনি বুঝিয়া করেন তাহা অশাস্ত্র ও অমঙ্গলদায়ক হইয়া উঠে; নীতিশিক্ষা জ্ঞানোন্নতি প্রভৃতির অভ্রান্ত উপদেশ সমস্ত যে /২৮/ শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মের ভবিষ্যতের ফলাফল নির্দ্ধারিত করা আছে, যে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সে শাস্ত্রকেও অভিমানী দাম্ভিকগণ প্রত্যয় করেন না, কি প্রত্যয় করিবার প্রবৃত্তি দিলে পরিহাস করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা মূঢ় মস্তিষ্কবিহীন লোক আর কোথায় আছে? সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী কোন কার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহার উপদেশ লইতে এক্ষণে বঙ্গদেশীয় লোকেরা ভিন্ন জাতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাহা জানেন, কিন্তু ভিন্ন জাতির নিকট বাঙ্গালিকে পরামর্শ লইবার প্রয়োজন রাখে না। শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ শুনিলে তাহাতে সমস্ত বিষয়ের উৎকৃষ্ট আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শাস্ত্রদ্বেষী বাঙ্গালিরা কোন একটী নূতন বিষয় ভাষান্তরে দেখিয়া বলিয়া উঠেন, আহা আহা! এরূপ অভিনব চমৎকার বিবরণত শাস্ত্রে নাই, কিন্তু শাস্ত্র বাহুল্য রূপে আলোচনা করিলে ঐরূপ কত শত চমৎকার বিবরণ পাইতে পারেন,

তাহার সংখ্যা করা যায় না। আবার কেহ কেহ আপনার অন্তঃকরণে কোন এক কথার আন্দোলন করিয়া কোন বিষয় স্থির করিতে পারিয়া বলিয়া উঠেন ; "কি নূতন কথা ও নূতন ভাব ও মীমাংসা আমার হৃদয়ে উদয় হইল !" তিনি যদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখেন তবে তাঁহার সেই নূতন কথা ও নূতন ভাব ও নূতন মীমাংসা অনাদি কালের পুরাতন অতি সামান্য সম্পত্তি বলিয়া প্রতীত হইবে।

বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেক কুলাঙ্গার এতদূর অনভিজ্ঞ যে তাঁহারা / ৯৯ / বলেন ইংরাজদিগের জ্যোতিষশাস্ত্র অতি সূক্ষ্ম ও প্রাচীন। তাঁহাদিগের অনুকরণে আমারদিগের নাটকাভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে ; পুরাকালের ভগ্নাবশিষ্ট মানমন্দির, কুলাঙ্গারেরা যদ্যপি বারাণসী প্রভৃতি স্থানে দেখিয়া আসিতেন, তাহা হইলে এতদ্দেশের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা ও সূক্ষ্মতা বিষয়ের পরিচয় পাইতেন। তবে যে চক্ষে তাঁহারা সংস্কৃত-ধর্ম্ম-শাস্ত্র দেখিয়া তাহা অসার ও স্থূল বিবেচনা করিয়া থাকেন, সে চক্ষে না কিছু বুঝিয়া মানমন্দির দেখিলে মানমন্দিরকে স্থূল অট্টালিকা মাত্র, আর তাঁহারা কিছু বিবেচনা করিবেন না। এই সকল কারণে দেশীয় পণ্ডিতগণ উহাঁদিগের নিকট নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন।

আর যে কালে এতদ্দেশে নাটক অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন ইংরাজেরা নাটক অভিনয় কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন না, শুনেনও নাই ; এমন কি নাটকাভিনয় প্রকরণ স্বপ্নযোগে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণেও উদয় হয় নাই। স্থূলত ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন একান্ত পক্ষে তাহা শ্রবণ অথবা তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিলে শাস্ত্রের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ব্যতীত অশ্রদ্ধা হইবার কোন কারণ থাকিত না, এমন সনাতন সূক্ষ্মতম সংস্কৃত শাস্ত্র সত্ত্বে লোকে কেন অসার বিজাতীয় ভাষায় পুস্তক পড়িয়া দুর্ব্বল জ্ঞান সাধনার গরিমা করেন। অনভিজ্ঞ লোকেরা বলেন, সে কালের শাস্ত্রে এখন চলিলে শুভ সংঘটনার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কালভেদে যে প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, শাস্ত্রকারেরা তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। / ১০০ /

এক্ষণে বাবু প্রসন্নকুমারের আজ্ঞা সভাপতির অনুমতি লইয়া সম্বন্ধতত্ত্ব সংক্রান্ত এইরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুত্রের প্রতি পিতার ব্যবহার।

এক্ষণে অনেকের পিতা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছেন, পূর্ব্ববৎ পুত্রবৎসল নহেন। পিতার অভিপ্রায়, পুত্র আপনার অন্নাচ্ছাদন সংগ্রহ করিয়া দিনপাত করেন। তাঁহারা অনেকে পুত্রকে শাসন করিতে সাহস করেন না। পুত্র ইংরাজী পড়িয়াছেন, ইংরাজী পড়িলেই অগাধ বিদ্যা জন্মে। পিতা মনে করেন আর তাহার প্রতি পিতৃ শাসনের আবশ্যক হয় না।

অদ্যাপি ধন লোভের পরতন্ত্র হইয়া অনেকের পিতা কুরূপা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। পুত্র অপরের সহিত কলহ অপরের অপকার ও মানহীন করিলে পিতা সে সকল নিবারণ না করিয়া পুত্রের অনুচিত কার্য্যে অনুমোদন করেন। পুত্র বিপদগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত হইলে অনেকের পিতা পুত্রের উদ্ধার করিতে যত্ন পান না। অনেক নরাধম পুত্রদিগের প্রতি ইতর বিশেষ করিয়া থাকেন। পুত্রের পীড়া হইলে নিরন্তর তাহার পার্শ্বে বসিয়া থাকা ও চিন্তিত চিত্তে তাহার তত্ত্ব লওয়া ইত্যাদি স্নেহ-সূচক কার্য্য প্রায় এক্ষণকার পিতার মুখ-মণ্ডলে প্রত্যক্ষ হয় না। স্থানান্তর হইতে নির্দ্ধারিত / ১০১ / সময়ে পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন না করিলে পিতা শশব্যস্ত হইয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন একালে কোন পিতা প্রায় সেরূপ করেন না।

ধনোপার্জ্জন করিতে না পারিলে পুত্রকে অস্নেহ ও উপার্জ্জন করিতে পারিলে পুত্রকে বিশেষ স্নেহ করা পিতার নিয়ম হইয়াছে। বঙ্গে ধনানুগত পিতৃস্নেহ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন না। ক্রমশঃ বিলাতীয় পিতৃভাবের আবির্ভাব হইলে আরো কত শুনিতে পাইবেন। বঙ্গে ঐরূপ ধনলোভী পিতা দেখিলে ক্ষোভ হয় কিন্তু বিলাতে নৃশংস পিতার বৃত্তান্ত শুনিলে এই সুর-সভার অনেকে নিস্তব্ধ হইবেন। তথায় অন্ধ বালককে রাজ পথে দেখিলে দানশীল লোকেরা তাহাকে অধিক অর্থ দান করেন সেই হেতু অনেক পাষাণ পিতা পুত্রের চক্ষু উৎপাদন করিয়া রাজপথে বসাইয়া দেন।

পিতার প্রতি পুত্রের ব্যবহার।

সে কালের ইংরাজী অশিক্ষিত পুত্র কর্ত্তৃক পিতার যতদূর উপকার হইত, এক্ষণকার অগাধ বিদ্যাধর ইংরাজী শিক্ষিতের দ্বারা ততদূর হয় না। তখন

পিতার কথার উপর টীকা করিবার পদ্ধতি ছিল না, তাহাতে সংসার যাত্রা যেরূপ শৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইত, এক্ষণে সেরূপ হয় না।

পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে রামচন্দ্র কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, সেই হেতু এক্ষণকার কোন কোন কৃতী পুত্র রামকে ৎর্ব্বর গর্দ্দভ বলিয়া প্রকাশ করেন। / ১০২ /

এ সময়ের অনেক পুত্র বনিতার অনুমতি অবহেলন করিয়া পিতার সেবা ভক্তি করিতে সাহস করেন না। পুত্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আর পিতার হস্তে অর্পণ করেন না। নির্দ্দোষী পিতাকে এক্ষণকার অনেক পুত্র সহস্র অপরাধের অপরাধী বলিয়া গণনা করেন, তাঁহারা প্রায় পিতার অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য করেন, পিতা বর্ত্তমানে হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন না, সেই হেতু সর্ব্বদাই পিতার অচিরাৎ মৃত্যু প্রার্থনা করেন।

অনেক পুত্রকে পিতার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিতে দেখা যায়, সে সমস্ত অভিযোগের বিবরণ বিশেষ রূপে শুনিতে এই সভাসীন মহাত্মাগণের সাবকাশ হইবে না: অতএব সংক্ষেপে এক অভিযোগের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন—পুত্র বাদী ও প্রতিবাদী তাঁহার পিতা: জেলার বিচারালয়ে এইরূপ এক অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহার মর্ম্ম অতীব বিচিত্র। পুত্র কার্য্য স্থান হইতে আসিয়া পিতাকে বলিলেন "মহাশয় আমি যে টাকা পাঠাইয়াছিলাম, তাহার ব্যয়ের বিবরণ চাহি," পরে পিতা তাহা প্রদর্শন করাতে পুত্র অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "আমার আদেশের অতিরিক্ত টাকা আপনি ব্যয় করিয়াছেন—যাহা অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াছেন তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ করুন" পিতা তাহা প্রত্যর্পণে অশক্ত হইলে পুত্র বিচারালয়ে পিতার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন; পিতা পুত্র উভয়ে বিচারপতির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, ইত্যবসরে পিতার উকীল বক্তৃতা করিলেন—"ধর্ম্মাবতার দেখুন বাদী কি /১০৩/ অভদ্র প্রকৃতির লোক—পিতার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন; অপরিমেয় অর্থ পিতাকে অর্পণ করিলেও পিতৃঋণ পরিশোধ হইবার নহে; পিতার নামে অভিযোগ!" বাদীর উকীল কহিলেন "ধর্ম্মাবতার প্রতিবাদীর উকীল আমার মক্কেলকে অনর্থক অভদ্র বলিতেছেন, উঁহার অপেক্ষা ভদ্রলোক কোথায় আছে? কস্মিন কালে পিতৃ-ঋণ কেহ পরিশোধ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু আমার মক্কেল পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিয়া অধিক দুই সহস্র টাকা পিতার নিকট পাওনা করিয়াছেন।" শুনিয়া বিচারপতির চক্ষুস্থির হইল, তিনি কিং-

কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় বিচারাসনে মৌনাবলম্বনে রহিলেন।

ইঁহারা অনেকেই অবস্থার অতিরেক ব্যয় ভূষণ করিয়া পিতাকে নির্ধন করেন এবং পিতার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন।

মাতার প্রতি পুত্রের ব্যবহার।

অনেক পুত্র বলেন বঙ্গদেশীয় জননীরা বিদ্যাবতী নহেন, পুত্রকে দেশান্তরের হিতোপদেশ দিতে পারেন না, উঁহারা নির্বোধ, ভক্তি করিবার যোগ্য নহেন।

পুত্র মাতাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করান, পুত্র ধনবান ও বিদ্বান হইলে মাতা নানামতে সুখভোগ করিবেন, আজন্ম কাল যে আশা করিয়া থাকেন, পুত্র উপযুক্ত হইলেও সে আশা সফল হয় না। বিশেষতঃ নিষিদ্ধ কার্য্য করিতে মাতা পুনঃপুনঃ নিষেধ করেন, তাহাতে পুত্র অতিশয় বিরক্ত হয়েন। / ১০৪ /

এমন পুত্র এ কালে অনেক দেখা যাইতেছে যে, বৎসরান্তে কর্ম্ম স্থান হইতে পুত্র হুগলিতে নিজ নিবাসে আসিলে তাহার মুখমণ্ডল দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন, মাতা পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন; কি সংবাদ, কার্য্যালয় বন্ধ হইলে কলিকাতা হইতে রেলওয়ে শকটে আরোহণ করিয়া নিজ অন্তঃকরণের প্রমোদ জন্য নানাস্থান দর্শনার্থ পুত্র পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন, মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হুগলিতে ক্ষণেক অবতরণ করিতে অবকাশ পাইলেন না।

মাতার পীড়া হইলে এই মহাপুরুষেরা রীতিমত চিকিৎসা করান না। বলেন "জননীর বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছে, উঁহাকে আর ঔষধাদি কি সেবন করাইব? এক্ষণে উঁহার পক্ষে গঙ্গাজলই মহৌষধ।"

ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার ব্যবহার।

অভেদ ভ্রাতৃভাব এক্ষণে আর নাই; তবে পল্লীগ্রামে দুই এক স্থানে ভ্রাতৃ-প্রণয় দেখা যায়। ভ্রাতার দুঃখে দুঃখী, ভ্রাতার সুখে সুখী হইবার দিন যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছে তাহার নিরূপণ নাই। ইংরাজদিগের সহবাস ও তাঁহারদিগের রীতির অনুকরণ করিয়া সুভ্রাতৃ বৎসলতা কোন নির্জ্জন গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে পিতা স্বর্গগত হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কনিষ্ঠকে পিতৃ-স্নেহের সহিত লালন পালন ও পিতৃবৎ কনিষ্ঠের উপদ্রব সহ্য করিতেন, কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠকে পিতার সম্মান ও ভক্তি করিতেন; ভ্রাতৃবর্গের

নীচাশয় বনিতারা / ১০৫ / প্রায়ই ভ্রাতৃ-প্রণয়ের উচ্ছেদ করেন, ভ্রাতা যতদিন অন্যান্য ভ্রাতার অপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন না হয়েন, ততদিন তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব থাকে, সঙ্গতিপন্ন হইলেই অমনি নিজ বনিতার নামে বিষয় সম্পত্তি করিতে আরম্ভ করেন ও ভ্রাতাদিগের হইতে স্বতন্ত্র হয়েন, তাহার কারণ এই যে একত্র থাকাতে পাছে তাঁহার অর্থ অপাত্রে পতিত হয়, অর্থাৎ ভ্রাতৃগণের ভোগে আইসে। যে ভ্রাতৃগণ এক উদরে অবস্থান, এক অঙ্কে প্রতিপালিত, এক পাত্রে ভোজন, এক আসনে উপবেশন, এক শয্যায় শয়ন, এক মাতার স্তনপান করেন, তাঁহারা আর একালে একত্রে বসবাস, একত্রে শয়ন, ও ভোজনাদি করিতে পান না। এক স্থলে ভ্রাতৃবর্গের সমষ্টি হইলে পরস্পরের কত বল কত সাহায্য কত দুঃখ দূর হইতে পারে, সে সকলের প্রতি এক্ষণকার ভ্রাতারা কিছুই বিবেচনা করেন না; তাঁহারা মনে করেন, কেবল সস্ত্রীক স্বতন্ত্র থাকিলে অনন্ত সুখ লাভ হয়।

ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার ব্যবহার।

পূর্ব্বে প্রতিবাসীর প্রতি লোক যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে সহোদরা ভগিনীও ভ্রাতার নিকট সে প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যত দিন মাতা পিতা জীবিত থাকেন, তত দিন ভ্রাতা সহোদরাকে কখন কখন নিজালয়ে আনিয়া তাহার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ সমাদর ও স্নেহ প্রকাশিয়া থাকেন; পিতা মাতা স্বর্গগত হইলে আর প্রায় কাহার ভগিনীকে পিত্রালয়ে দেখা যায় না। ভগিনী অনাথা হইলে ভ্রাতা তাহাকে /১০৬/ নিজালয়ে আনিয়া পাককার্য্যে নিযুক্ত করেন। ভ্রাতৃ-জায়া জ্যেষ্ঠা বা কনিষ্ঠা হউন, ভগিনীকে তাঁহার নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া থাকিতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ভোজন ও বসন ভগিনীকে দেওয়া হইয়া থাকে। ভগিনী যে বিষয় সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃ-ভবনে বাস করেন, সে সকল প্রায় অনেক ভ্রাতা আত্মসাৎ করেন। ভ্রাতাই পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। ভ্রাতৃ-ভবনে ভগিনী কেহই নহেন, পরম্পরাগত যে, শাস্ত্রের এই নিষ্ঠুর নিয়ম আছে, তাহাই ভগিনীর পক্ষে যথেষ্ট ক্লেশদায়ক; আবার তাঁহার প্রতি এক্ষণে অনেক ভ্রাতা অতি পরের মত ব্যবহার করেন, হায় তাঁহারা কি দুরাচার!

ভ্রাতৃ-পুত্রের প্রতি পিতৃব্যের ব্যবহার।

পিতা যে পরিমাণে পুত্রকে স্নেহ করিতেন, ভ্রাতৃ-পুত্রের প্রতি পিতৃব্যের প্রায় সেই পরিমাণে স্নেহ করিবার ত্রুটি হইত না ; ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দেখা যাইত, এমন কি মহাত্মা ব্যক্তিরা নিজ সম্পত্তি পুত্র ও ভ্রাতৃ-পুত্রকে সমানাংশে বিভক্ত করিয়া দিতেন ; সংপ্রতি তদ্বিপরীত কার্য্য প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, ভ্রাতৃ-পুত্রেরা পিতৃব্যের নিকট কিছুই পান না। পিতামহের কোন ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকিলে তাহা ভ্রাতৃ-পুত্রকে না দিতে হয়, এক্ষণকার অনেক করুণাময় পিতৃব্য মহাশয়গণ অনুক্ষণ সেই যত্নই পান। ভ্রাতৃ-পুত্রকে লালন পালন করা ভদ্র লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, এক্ষণে অনেক মহাত্মা তাহা করিয়া নিজ নিজ মাহাত্ম্যের গৌরব প্রচার করেন না। এক্ষণে গুরুতর /১০৭/ বিবাদ বিসম্বাদ কেবল ভ্রাতৃ-পুত্রের সহিতই অধিক দেখা যায়। অনেক নিঃসন্তান পিতৃব্য স্বীয় ত্যাজ্য সম্পত্তি ভ্রাতৃ-পুত্র না পান, তাহা অপাত্রের ভোগে আইসে এমন সন্ধান করেন,—ধর্ম্মবলে ভ্রাতৃ-পুত্রের প্রতি দ্বেষভাব আমাকে [?] আশ্রয় করে নাই। বিষয় কর্ম্মে রহিত হইলেই এক্ষণকার পিতৃব্য মহাশয়েরা অনেকেই ভ্রাতৃ-পুত্রের সহিত বিশেষরূপ কলহে প্রবৃত্ত হয়েন।

পিতৃব্যের প্রতি ভ্রাতৃ-পুত্রের ব্যবহার।

ভ্রাতৃ-পুত্র পূর্ব্বে পিতৃব্যকে পিতার তুল্য সম্মান ও ভক্তি করিতেন, কিন্তু কালের দোষে এক্ষণকার ভ্রাতৃ-পুত্রের সে প্রকার ভাব নাই, তাঁহারা অনেকে পিতৃব্যকে একজন পথের পথিক বিবেচনা করেন, ইহাদিগের অনেকে পিতৃব্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হো হো শব্দ পূর্ব্বক করতালি দিয়াছেন দেখিয়াছি। পিতা অশক্ত হইলে ইতঃপূর্ব্বে পিতৃব্যই সংসার সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিতেন, একালে পিতার ক্ষমতা ভ্রাতৃ-পুত্র স্বয়ং গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। যেমন পিতার সহিত সুস্পষ্ট রূপে কথা কহিতে সম্ভ্রম জন্য পুত্র সঙ্কোচ করিতেন, পিতৃব্যের সহিত কথা কহিতেও সেইরূপ করিতেন। এক্ষণকার ভ্রাতৃ-পুত্রেরা পিতৃব্যের কর্ণাকর্ষণ করিয়া কথা কহেন, সমক্ষে নৃত্যগীত অভিনয় কার্য্য ও ধূম্রাদি পান করেন। কি ভয়ানক কাল !! শুনিয়াছি বিষয়ের অংশ দিবার ভয়ে বিচারালয়ে ভ্রাতৃ-পুত্রেরা অনেকে পিতৃব্যকে পিতামহীর গর্ভজাত কিন্তু পিতামহের সন্তান নহেন শপথ পূর্ব্বক ইত্যাকার ঘৃণিত মিথ্যা কথাও কহিয়াছেন। /১০৮/ এই সকল ভ্রাতৃ-পুত্রেরা কালে যখন পিতৃব্য হইবেন, তখন তাঁহাদিগের ভ্রাতৃ-পুত্রেরা ঐরূপ

প্রণালীতে সম্মান করিবেন সন্দেহ নাই এই প্রকার আচরণের সহিত বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া অনেক ভ্রাতৃ-পুত্র আবার আপনাদিগকে যোগ্য ও বিজ্ঞ গণনা করেন। অনেক যোগ্য ভ্রাতৃ-পুত্রকে পিতৃব্যের বিপক্ষে যষ্টি ধারণ করিতেও দেখা গিয়াছে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার।

স্ত্রীকে প্রশ্রয় না দেওয়া অথচ তাহার প্রতি স্নেহ রাখা স্বামীর উচিত, এক্ষণে স্বামীরা স্ত্রীকে অতিশয় প্রশ্রয় দিয়া স্ত্রীসুখে বঞ্চিত হয়েন। স্ত্রীজাতি বিনয় ও মাধুর্য্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া লোকের অপ্রিয়া হয়েন। যে চক্ষে স্বামী স্ত্রীকে দৃষ্টি করেন, সে প্রণয়ানুগত পক্ষপাত দৃষ্টি, অতএব স্বজন সজ্জন পরিজনের দৃষ্টিতে বনিতা যাহাতে প্রশংসনীয়া হন, এক্ষণে স্বামীরা সে উপায়ের উদ্দেশ করেন না। স্ত্রীকে সুবোধিনী সর্ব্বজ্ঞা বিবেচনা করিয়া এক্ষণে স্বামী তাঁহাকে হিতোপদেশ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন না। হিতোপদেশ না দেওয়াতে অনেকের বনিতা আজন্মকাল নিকৃষ্টভাবে কালযাপন করেন। যেমন কোন কোন বৃক্ষের শাখা-পল্লব মধ্যে মধ্যে ছেদন ও কর্ত্তন করিয়া না দিলে তাহাতে সুরস ফল জন্মে না, সেইরূপ রমণীর আচাররূপ বৃক্ষে কু-রীতি ও কু-নীতিরূপ যে কুৎসিত শাখা পল্লব জন্মে, তাহা এক্ষণে স্বামীকর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয় না। যে স্ত্রীর বিবেচনাশক্তি নাই, তাহার হস্তে অর্থার্পণ /১০৯/ পূর্ব্বক অর্থ নষ্ট করিয়া স্বামী বিপদে পতিত হয়েন। এক্ষণকার অনেক স্বামী নিতান্ত অসার, তাঁহারা স্ত্রীর নীচাশয়ের অনুগামী হইয়া কর্ম্ম করেন, স্ত্রীকে আপনার সদাশয়ের অনুগামিনী করিয়া কর্ম্ম করাইতে পারেন না।

শ্বশুরের প্রতি জামাতার ব্যবহার।

এক্ষণকার জামাতা শ্বশুরের প্রতি যে কত অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ বলিতে চক্ষে জলধারা আসিতেছে। জামাতারা কোন ক্রমেই শ্বশুরের প্রতি সুপ্রসন্ন নহেন, বিবাহকালে নিষ্ঠুরের ন্যায়, শ্বশুরের উপজীবিকার অর্থ পর্য্যন্ত লইয়া কন্যা গ্রহণ করেন, আবার সময়ে সময়ে প্রচুর উপহার না পাইলে শ্বশুরের প্রতি তাঁহারা প্রচণ্ড কোপ প্রকাশ করেন। এমন কি দুর্ব্বাক্যও বলিয়া থাকেন। শ্বশুর কি করিবেন, সকল কথা সহ্য করিয়া থাকেন, এবং জামাতার কন্যা হইলে অচির কালের মধ্যে জামাতাকে আবার জামাতার

জ্বালায় জ্বলিতে দেখেন। পশ্চিমাঞ্চলে জামাতার উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া তত্রত্য লোকেরা এক রাজাজ্ঞা সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইহেতু সে অঞ্চলের জামাতারা আর শ্বশুরের নিকট অপরিমেয় অর্থ কিম্বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন না; বঙ্গবাসীরা জামাতার উপদ্রব নিবারণের উপযুক্ত এক রাজাজ্ঞা যতদিন না প্রাপ্ত হইতেছেন, ততদিন তাঁহাদিগের শ্রেয়ঃ নাই। কোন দ্রব্য যদ্যপি শ্বশুর জামাতাকে বিবাহকালে দিতে অক্ষম হয়েন, তবে নিষ্ঠুর জামাতা /১১০/ অনায়াসে তাঁহার নববিবাহিতা শিশুমতি বনিতাকে পিত্রালয়ে যাইবার বিদায় দেন না। জামাতারা কি নিষ্ঠুর নৃশংস! দয়া-মায়া পথের শতযোজন অন্তর দিয়াও তাহাদিগের গতিবিধি হয় নাই। শ্বশুর জামাতার পূজনীয় ব্যক্তি, কিন্তু এক্ষণকার জামাতারা প্রকারান্তরে শ্বশুরের পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছেন। যে জামাতার বংশাবলীক্রমে কাংস্যপাত্রে ভোজন ও পিত্তল পাত্রে জলপান করিয়া আসিতেছেন, স্ত্রীগ্রহণকালে তিনি শ্বশুরের নিকট রৌপ্য স্বর্ণের ভোজন ও পেয় পাত্র লইয়াও নিশ্চিন্ত হয়েন না; যেমন ধূসরবর্ণ মেঘে উষাপ্রদোষের কিরণ পতিত হইলে তাহা নানা রাগে রঞ্জিত হয়; সেইরূপ নিষ্প্রভ কুলজাত ব্যক্তি বিবাহ কালে নানাবিধ উপসর্গরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠেন ও শ্বশুরের প্রতি কতই যে বিভীষিকা প্রদর্শন করেন, তাহা যিনি একালের শ্বশুর, তিনিই সে বিভীষিকার ফল অনুভব করিয়া থাকেন।

গুরুর প্রতি শিষ্যের ব্যবহার।

মহাশয় বলিতে দুঃখ হয়, এক্ষণকার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় গুরুগণের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান নহেন। ইহাঁদিগের মনের বৃত্তি যে কতদূর নিকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কি দীক্ষা-গুরু, কি শিক্ষা-গুরু, কি বয়ঃজ্যেষ্ঠ গুরু। কোন গুরুই ইহাঁদের পূজ্যপাদ নহেন। দীক্ষা-গুরু শিষ্য মহাশয়ের নিকট এক সামান্য ভৃত্যেরও সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয়েন না। /১১১/ বাবুরা বলেন, গুরু কি জানেন যে, উহাঁকে মান্য করিব। কিন্তু অনেক গুরু এত অধিক বিষয় জানেন যে, অধিকাংশ অনুবাদের অনুবাদ ও তস্য অনুবাদ পাঠ-কারী ইংরাজী শিক্ষিত শিষ্যেরা উক্ত গুরু হইতে অধিক কিছুই জানেন না। অপর শিক্ষা-গুরু যেরূপ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয়েন, তাহা অতি শোকাবহ; যাঁহার উপদেশে জ্ঞান লাভ করত শিষ্যেরা মূর্খত্ব পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা

করিতে অগ্রসর হয়েন, যাঁহার কৃপায় প্রাজ্ঞ-দলভুক্ত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া বিচরণ করেন, যাঁহাদিগের সাহায্যে বড় বড় টাইটেল পাইয়া ভয়ানক অভিমানী হইয়া উঠেন, সেই সকল গুরুগণকে সময়ে ভ্রূক্ষেপ করেন না। কখন যদি কোন শিক্ষাগুরুর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, সম্ভ্রম রাখা দূরে থাকুক, মুখ তুলিয়া কথাও কহেন না। গুরু পাদচারে শিষ্য যানারোহণে ভ্রমণ করেন, এরূপ অবস্থায় গুরুর সহিত কেমন করিয়াই বা বাক্যালাপ করেন। অধিকন্তু বলিয়া থাকেন, উঁহারা বেতনভুক গুরু, টাকা লইয়া শিক্ষা দিয়াছেন। যিনি অর্থ গ্রহণ করেন, তিনি ভৃত্য মধ্যে গণ্য, তাঁহার আবার মান্য কি? উঁহারা চির-কালই আমাদিগের আনুগত্য করিবেন, আমরা কখন করিব না। আবার কোন কোন শিষ্যের কুব্যবহারের কথা দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে প্রহারাদি দ্বারাও গুরুদক্ষিণা দিয়া থাকেন। এই সকল মহামতিরা ভ্রমেও ভাবেন না যে, কিরূপ পরমোপকারী উপাধ্যায় মহাশয়গণের সহিত কিরূপ আচরণ করিলাম। জন্মদাতা পিতা যে জ্ঞানধন দিতে অসমর্থ, যিনি সেই /১১২/ ধন প্রদান করেন, সামান্য ধন তাহার আংশিক মূল্যও হইতে পারে না; সেই নরাকার পশুদিগের এই কথা এক একবার মনে করা উচিত। অপর বয়ঃজ্যেষ্ঠ গুরুগণও প্রায় ঐরূপ সম্মান সময়ে সময়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আত্মা সুরলোকে সন্ধ্যতত্ত্বের কিঞ্চিৎ বিবরণ সমাপ্ত করিয়া বিশ্রামার্থে উপবেশন করিয়াছেন, ইত্যবসরে সভাস্থ সকলে তত্রস্থ মনোহর কুসুমলতা বিতানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দুইটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কামিনী তথায় পুষ্পচয়ন করিয়া কবরী ও কুন্তলে সংলগ্ন করিতেছেন, এক এক বার কল্লোলিনীর স্থির সলিলে বদনমণ্ডল দর্শন করিতেছেন, এক এক বার কল্পবৃক্ষতলস্থিত সভাস্থ জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, দেখিলে সহসা অনুভব হইতে থাকে, যেন তাঁহারদিগের ইচ্ছা জন্মিতেছে যে একবার সেই সভার সমীপে আসিয়া সেখানে কি বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতেছে শ্রবণ করেন। কিন্তু কেহ না আহ্বান করিলে সেস্থলে আসিতে দ্বৈধ করিতেছেন, উঁহার-দিগের মনের মানস পরিতৃপ্ত হেতু যথায় তাঁহারা অবস্থিতি করিতেছেন সেই স্থানে প্রাচীনতম জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের আত্মা অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্নেহে বলিলেন,—"বৎসে তোমারদিগের এই সুরসভাতে একবার শুভাগমন করিতে হইবে,"; তাঁহাদিগের অভিপ্রেত বিষয়ে আকিঞ্চন করাতে উভয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ত্রিভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রতিভায় সভাস্থল আনন্দময় করিলেন।

অতঃ-/১১৩/ পর ধীরপ্রকৃতি চন্দ্রমোহন অতি সরলভাবে জিজ্ঞাসিলেন; "আপনারা কোন কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন? আপনারদিগের নাম ও নিবাসের স্থান জানিতে আমরা অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি," রমণীদ্বয়ের একজন বিনীত ভাবে বলিলেন, 'আমারদিগের উভয়েরি দেবকুলে জন্ম, আমার নাম প্রভাবতী, আমার সঙ্গিনীর নাম সুরসুন্দরী, আমরা সাতজন প্রজাপতি ব্রহ্মার নিবাসে অবস্থিতি করি, দুই দুই জন একত্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে বঙ্গ-ভূমিতে গমন করিয়া তথাকার নারীজাতির বর্ত্তমান ব্যবহারের বিবরণ জানিয়া কমলযোনিকে দিতে হয়; আমরা প্রত্যাগমন কালে সকলেই এই মনোরম উদ্যানে শ্রান্তি দূর করিয়া যাই, ইতিপূর্ব্বে প্রমদা ও প্রিয়বা দিনী নাম্নী আমা-দিগের অন্য দুই সহচরী এই কার্য্যার্থে বঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া গিয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত উক্ত হইলে প্রিন্স্ কহিলেন, প্রসন্নকুমার বাবুর আত্মা আমাদিগকে বঙ্গের পুরুষগণের কিঞ্চিৎ বিবরণ তাঁহার সম্বন্ধতত্ত্বে উল্লেখ করিয়াছেন; বঙ্গের স্ত্রীজাতির বিবরণ এই দেবাঙ্গনা-দিগের নিকট শ্রবণ করিতে হইবে, এই কথা বলিলে চন্দ্রমোহন দেবাঙ্গনা-দিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন, বঙ্গীয় রমণীরা ইদানীং স্বসম্বন্ধীয় লোকের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতেছেন, আপনারা তাহার যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বলিলে প্রিন্স্ পরম পরিতুষ্ট হইবেন।

প্রভাবতী বলিলেন "সে বিবরণ শুনিয়া প্রিন্স্ পরিতুষ্ট হইবেন না। কেন না উঁহার প্রশস্ত মন পরদুঃখে প্রপীড়িত হয়, ইহা /১১৪/ আমারদিগের জানা আছে।" প্রিন্স্ কহিলেন "সে যাহা হউক আপনারদিগকে বঙ্গের নারী-গণের সম্বন্ধতত্ত্বের কথা আমাকে কিছু বলিতে হইবে।" "একান্তই শুনিবার ইচ্ছা, অতএব শ্রবণ করুন" এই বলিয়া প্রভাবতী নীলকান্তমণি রচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পুত্রের প্রতি মাতার ব্যবহার।

দেখিয়াছি পূর্ব্বে পুত্রকে নিমেষের নিমিত্ত চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া মাতা সুস্থির থাকিতে পারিতেন না, এক্ষণকার অনেক মাতা পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে স্বয়ং লালন পালন না করিয়া আপন প্রাচীনা মাতা, শ্বশ্রূ অথবা কুটুম্ব বনিতার প্রতি প্রায়ই সেই কার্য্যের ভার অর্পণ করেন, তিনি যখন মাতা হইয়া পুত্রের প্রতি ঐরূপ মা।। যুক্ত কার্য্য করেন তখন পিতা মাতা ভ্রাতা

তাঁহার নিকট কোন প্রত্যাশাই করিতে পারেন না। পুত্র প্রবাসে অধ্যয়ন কিম্বা ধনোপার্জ্জন করিতে যাইলে, তাঁহার অবস্থান, ভোজন ও শয়ন কিরূপে হইতেছে, তাহার সমাচার আসিতে বিলম্ব হইতেছে কারণ কি? পূর্ব্বকালে মাতারা সর্ব্বদাই এই সকল চিন্তা করিতেন। এক্ষণকার মায়াশূন্য মাতাদিগের অন্তঃকরণে সে সকল চিন্তা আর স্থান পায় না। সমীপে বসিয়া সযত্নে সন্তানকে আহার করান, কিম্বা, শয়ন করিলে নিদ্রাকর্ষণ করাইতে কর্ণমূলে মৃদু করাঘাত করা, এক্ষণে মাতার কার্য্য না হইয়া পরিচারিকার কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়াছে; পুত্র স্থানান্তর যাইলে /১১৫/ তাহার প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিয়া পথের দিকে দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি অতিশয় স্নেহের চিহ্ন আর এক্ষণকার মাতায় দেখা যায় না।

ভগিনীর প্রতি ভগিনীর ব্যবহার।

কোমল অন্তঃকরণের সহিত সহোদরা ভগিনীর শুভ সংবাদ লইতে ভগিনীরা পরস্পরে ব্যাকুল হইতেন, অধিক দিন ভগিনীর সংবাদ না পাইলে অশ্রুজল নির্গত হইত, কোন আমোদজনক কর্ম্ম তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতে পারিত না; কখন্ ভগিনীর মুখমণ্ডল দর্শন, কখন্ তাঁহার সঙ্গে মধুরালাপ করিবেন, এই আশায় দিন যাপন করিতেন। এইক্ষণে এক ভগিনী অন্য ভগিনীকে যত্ন সহকারে দর্শন করেন না, ভগিনীর মঙ্গলাস্পদ ভগিনীপতি কিম্বা তাহার পুত্র কন্যার তত্ত্বাবধারণ কিম্বা পীড়া হইলে সংবাদ লওয়া সে সকল প্রথা রহিত হইয়াছে, তবে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ নূতন নূতন অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া কুটুম্ব কন্যার ন্যায় ভগিনীর বাটীতে আবির্ভূত হইয়া আপনার ধনসম্পত্তি বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতির পরিচয় দিয়া যান। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্নেহভাব প্রকাশের কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর ব্যবহার।

এক্ষণকার ভগিনীরা প্রায় ভ্রাতৃস্নেহ বিবর্জ্জিতা, তবে যিনি পতি-পুত্র-বিহীনা, তাঁহারাই অগত্যা ভ্রাতার কিছু মঙ্গল চিন্তা করেন। প্রায় সকলেরই স্নেহ এক্ষণে স্বার্থপর হইয়াছে। /১১৬/ ভগিনী যে ভ্রাতাকে সম্পত্তিপন্ন দেখেন, তাহারই পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহার আহার তাহার শুশ্রূষাতেই রত হয়েন, তাহার পত্নীকে সমাদর, তাহার পুত্র তাহার কন্যা তাহার জামাতাকেই সর্ব্বস্ব

ভাবেন। সেই ভ্রাতা না নিদ্রা যাইলে সেই ভ্রাতা আহার না করিলে সেই ভ্রাতা সুস্থ না থাকিলে তিনি জ্ঞানশূন্য হয়েন, অন্য ভ্রাতা ক্ষুধায় কাতর, পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, নিদ্রাভাবে উৎকণ্ঠিত হইলেও ভগিনী তত্ত্ব লইবার সাবকাশ পান না। পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি তিনি পক্ষপাত করিয়া তাঁহার প্রিয় ভ্রাতাকে সমর্পণ করেন। ভাগ্য অতি চঞ্চল পদার্থ; ভগিনীর প্রিয়, সম্পত্তিশালী ভ্রাতার দুরবস্থা উপস্থিত হইলে ও বিপন্ন ভ্রাতা কালে সম্পন্নশালী হইলে ভগিনী আবার নূতন সম্পন্নশালী ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করেন। ইঁহারা যে কি ঘৃণিত প্রকৃতির ভগিনী, তাহা সভাসীন মহাশয়েরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, অতএব এরূপ ভগিনীর মুখমণ্ডল নেত্রপথে উদয় হইলে চক্ষু আচ্ছাদন করিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার।

স্বামীর সাহায্যে আপনি সুখী থাকিলেই হইল। আপনার বসন ভূষণ পান ভোজন উৎকৃষ্ট হইলেই হইল। স্বামীর প্রকৃত সেবা কিরূপে করিতে হয়, এক্ষণকার স্ত্রীরা অনেকে তাহার আলোচনা করেন না। পূর্ব্বে স্বামী সুখে থাকিলে স্ত্রী সহস্র দুঃখকেও দুঃখ জ্ঞান করিতেন না, তাঁহারদিগের দৃঢ় জ্ঞান ছিল, স্বামীর শুশ্রূষা করিলে মঙ্গল হইবে, বস্তুতঃ তাহাই /১১৭/ হইত; স্ত্রীর আচরণে স্বামী তাহার প্রতি এত সদয় থাকিতেন যে, সেই সদয়তা হইতে স্ত্রীর নানাপ্রকার সুখোদয় হইত। সে প্রকার গুণবতী স্ত্রীর সহিত লোকের আর সন্দর্শন হয় না। এক্ষণকার স্ত্রীরা নিতান্ত সোহাগিনী, তাঁহারা কেবল সোহাগই ভাল বাসেন, পরিশ্রম না করিলে মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে না। স্ত্রীরা সদাই স্ফূর্ত্তি লাভের জন্য যত্ন পান, কিন্তু অলসপরতন্ত্র হেতু তাঁহারদিগের স্ফূর্ত্তির উদয় হয় না। তবে ইঁহাদিগের অনেকে স্বামীর ন্যায় স্বেচ্ছাচার গ্রহণ করেন না এবং স্বামী ইতর ভাবাপন্ন না হয়েন, এরূপ যত্ন করেন। অনেক বুদ্ধিহীন বনিতা পতির যথেচ্ছাচারের অনুগামিনী হয়েন। অনেক বুদ্ধিহীনা বনিতা পিত্রালয়ে পতিগৃহের গ্লানি করিয়া পতির নিতান্ত অপ্রিয় হয়েন।

কন্যার প্রতি মাতার ব্যবহার।

কন্যা চিরদিন নিজগৃহে থাকিবে না, বিবাহ হইলে তাহাকে জামাতার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া সে যে কোন দেশান্তরে

যাইবে, পুনশ্চ কতদিনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, বিপদ সম্পদে ইচ্ছা করিলেই যে আর মাতা তাহাকে অঙ্কে পাইবেন সে আশা থাকে না। এই সকল চিন্তায় অভিভূত হইয়া জননীরা অশ্রুপাত করিতেন, এক্ষণে সে সকল চিন্তা মাতার অন্তঃকরণে উদয়ই হয় না। প্রসবকালে কন্যাকে বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, এই জন্য পূর্ব্বে কন্যারা তৎকালে মাতৃসদনে থাকিতেন এবং মাতা তাঁহার সেই ক্লেশ /১১৮/ লাঘব করিবার যৎপরোনাস্তি উপায় করিতেন, এইক্ষণে মাতা সত্বেও কন্যারা শ্বশুরালয়ে সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করেন। যে দিন কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইতেন, মাতা মায়াতে অভিভূতা হইয়া অন্নজল পরিত্যাগ করিতেন, এক্ষণে কন্যা মাতৃ প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিলেই মাতা অমনি নিশ্চিন্ত, আর কন্যা সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখই নাই, ধন্যরে একালের মাতা! এক্ষণকার মাতা উচ্চমনা, সেইজন্য স্নেহের বশবর্ত্তিনী হয়েন না, এই বলিয়া অনেকে ঐরূপ মাতাদিগকে প্রশংসা করেন; আমরা করি না, কারণ কামিনীর কোমল প্রাণ অত কঠিন হওয়া উচিত নহে।

মাতার প্রতি কন্যার ব্যবহার।

পূর্ব্বে কন্যা, মাতাকে যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতেন, সেরূপ সেবা শুশ্রূষা, মাতা পরিবারস্থ কোন লোকের নিকট প্রত্যাশা করিতেন না। এক্ষণকার প্রায় কাহার কন্যা বিশেষ রূপ মাতৃসেবা করেন না। ইহাঁরা মাতার নিকট কেবল অলঙ্কার সংগ্রহ করিতে যত্ন পান; কন্যা সন্ততিরা শ্বশুরালয়ে যাইয়া কেবল মাতার অদর্শন স্মরণ করিয়া রাত্রিদিন অশ্রুপাত করিতেন। কতদিন পরে মাতার সহিত সন্দর্শন হইবে, তাহার দিন গণনা ও তাঁহার অদর্শনে মাতা কিরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, অন্তঃকরণে অনবরত সেই আন্দোলন করিতেন। কন্যারা এক্ষণে শ্বশুর গৃহে গিয়া অল্পদিনের মধ্যে মাতার কথা বিস্মরণ হইয়া যান, মাতার মঙ্গল সমাচার লইতে বা জানিতে মনে থাকে না। কত কষ্টে তাঁহাকে মাতা প্রতিপালন /১১৯/ করিয়াছিলেন, কতদিন তিনি কন্যার পীড়ার সময় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিতে পারেন নাই, কতদিন তাঁহাকে উত্তম পাত্রে সমর্পণ করিতে লোকের উপাসনা করিতে হইয়াছে, ইত্যাদি কার্য্যের প্রতিশোধ দিতে কন্যাগণের আর প্রবৃত্তি জন্মে না।

ভ্রাতৃ-জায়ার প্রতি ননন্দৃর ব্যবহার।

এক্ষণে ননন্দৃ যাঁহারাই ভ্রাতৃ-জায়ার প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকেন, যেহেতু পিতা মাতা তাঁহার ভ্রাতৃ-জায়াকে যেরূপ বসন ভূষণ দেন, তাঁহাকে সে প্রকার দেন না। ভাবিয়া দেখিলেই ননন্দৃর সেই ভ্রমজন্ত দ্বেষভাব দূরীভূত হয়, কিন্তু তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন না। তিনি আবার যে ননন্দৃর ভ্রাতৃজায়া তাঁহার পিতা মাতা বধূকে অধিক বস্ত্রালঙ্কার দেন, কন্যাকে তত দেন না; এই প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, তবে কেন যে এক্ষণকার হীনবুদ্ধি ননন্দৃরা ভ্রাতৃ-জায়ার শ্বশুর দত্ত বস্ত্রালঙ্কার দেখিয়া ক্ষোভ ও হিংসা করেন? তাঁহাদিগের অনেকের হিংসা এত প্রবল যে, কলহ সংঘটনার ভয়ে বধূ পিত্রালয়ে না যাইলে পিতা কন্যাকে নিজ নিবাসে আনেন না, পূর্ব্বকালের ননন্দৃদিগের মন সরল ও ব্যবহার উৎকৃষ্ট ছিল, এক্ষণকার ননন্দৃরা সেরূপ সরলা নহেন, ও তাঁহাদিগের ব্যবহার নিতান্ত অপকৃষ্ট, সেই হেতু ভ্রাতৃ-জায়ার সুখ স্বচ্ছন্দ দেখিয়া নিতান্ত অসূয়া পরবশ হইয়া আত্মগ্লানি উপভোগ করেন। /১২০/

ননন্দৃর প্রতি ভ্রাতৃ-জায়ার ব্যবহার।

কন্যার প্রতি পিতার স্বভাবত যতদূর বিশেষ স্নেহ জন্মে, বধূর প্রতি ততদূর স্নেহ জন্মে না, এক্ষণকার স্ত্রীলোকেরা স্বভাবত অতি ঈর্ষা পরবশ, তাঁহারা সেরূপ স্নেহের ইতর বিশেষ দেখিয়া সহ করিতে পারেন না। কন্যা আপনার রক্ত হইতে জন্মিয়াছে, বধূর সহিত রক্ত সংস্রব কিছুই নাই কেবল পুত্রের প্রেয়সী বলিয়া শ্বশুর তাঁহাকে কিঞ্চিৎ স্নেহ করেন। ইহ স্বভাবের কার্য্য, এ সকল কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া এক্ষণকার ভ্রাতৃ-জায়ারা শ্বশুরের নিকট ননন্দৃর অত্যাদর দেখিয়া অতিশয় হিংসা দ্বেষ করেন।

ভ্রাতৃ-কন্যার প্রতি পিতৃস্বসার ব্যবহার।

ভ্রাতৃ-কন্যাকে পিতৃস্বসা পূর্ব্বের ন্যায় একালে আর স্নেহ করেন না, কারণ স্নেহ এক্ষণে স্বার্থপরতা হইতে উৎপন্ন হয়; পিতৃস্বসা ভাবিয়া দেখেন যে ভ্রাতৃ-কন্যা হইতে তাঁহার কোন বিশেষ উপকার হইবে না, তবে তাহার প্রতি স্নেহ করার আবশ্যকতা কি—এরূপ উত্তর কাল চিন্তা করিয়া স্ত্রীলোকেরা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই হেতু তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমতী বলিতে পারি না; ধনিষ্ঠ লোকের সহিত সদ্ভাব থাকিলেই উপকার আছে, আর অনাদি কাল

হইতে যখন ঐরূপ নিঃস্বত্ব স্নেহ চলিয়া আসিতেছে, তখন ঐরূপ না করা নিন্দনীয় কার্য্য। স্নেহের পাত্রদিগকে স্নেহ ও ভক্তি ভাজনকে ভক্তি করিলেই /১২১/ লোকে ভদ্র বলে। তাহার অন্যথা করিলে লোকে অভদ্র বলে ; অভদ্র নাম লইয়া ইহ সংসারে জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। এ সকল সেকালের নারীজাতি বিশেষ বুঝিতে পারিতেন, একালের স্ত্রীলোকেরা তাহা বুঝিতে পারেন না ; অথচ মনে মনে অভিমান করেন "আমরা পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোক-দিগের অপেক্ষা অনেকাংশে জ্ঞান বুদ্ধিতে উৎকৃষ্ট হইয়াছি।"

এক্ষণে প্রভাবতী সভাসীন মহাত্মাগণকে সবিনয়ে বলিলেন, "আমরা কার্য্যান্তরে আসিয়া আর অধিক কাল এখানে অবস্থিতি করিতে পারিতেছি না, সেই হেতু বঙ্গদেশের আধুনিক কামিনীগণের বিবরণ অতি সংক্ষেপে বলিলাম ; বারান্তরে আসিয়া বিস্তারিত পূর্ব্বক নিবেদন করিব। সম্প্রতি আমাদিগকে বিদায় অনুমতি দিউন" প্রিন্স্ প্রভৃতি সকলে তাঁহাদিগের প্রার্থনায় অনুমোদন করিলে তাঁহারা স্বর্গ সভা পরিত্যাগ করিয়া কমলযোনির নিবাসাভিমুখে গমন করিলেন।

অনন্তর সভাসীন মহাত্মাগণের যত্নে বাবু রামগোপাল ঘোষের আত্মা বঙ্গের অভিনব যুবকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক্ষণে যুবাগণ যৌবন গর্ব্বে বৃথা-গর্ব্বিত হয়েন। উঁহাদিগের শরীরে যৌবন কালের উপযুক্ত শক্তি নাই, তাদৃশ পরি-/ ১২২ / শ্রমের সাধ্য নাই, অর্দ্ধক্রোশ দূরে কার্য্যালয়ে যাইতে চরণ চলে না ; উপজীবিকার একাংশ যান বাহককে দিয়া কার্য্যালয়ে যাইতে হয়, বয়োধিকদিগের ন্যায় আহার করিতে, অপারক, যদি করেন, তাহা জীর্ণ করিতে পারেন না। বয়োধিকদিগের অপেক্ষা বীর্য্যশালী মনে করেন ; কিন্তু ইঁহারা প্রায় কেহই অরোগী নহেন। সেই হেতু নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য ও সর্ব্বপ্রকার সুখ ভোগে বঞ্চিত। দেশীয় বয়োধিক অধ্যাপক ও ভূস্বামীদিগের প্রাচীন কর্ম্মচারিগণ এত ক্ষুধা তৃষ্ণা ও কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম যে, গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকালে যখন যুবারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে পারেন না ও গৃহে বসিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেও দারুণ ক্লেশ জ্ঞান করেন, অধ্যাপক প্রভৃতি প্রাচীনেরা তখন এক বৃহৎ গুরুভার ছত্র মস্তকোপরি ধারণ পূর্ব্বক হস্তে প্রকাণ্ড যষ্টি ও স্তূপাকার বস্ত্র কক্ষে তিন চারি ক্রোশ পথ পরিভ্রমণের পর নিবাসে আসিয়া স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করেন ; দৃক্পাত নাই।

গুরুজনকে অবহেলা করা ও মনস্তাপ দেওয়া এক্ষণকার অনেক যুবা ব্যক্তির নিত্য কর্ম্ম হইয়াছে। কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ সহ্য করিবার ভয়ে ও সামান্য স্বচ্ছন্দ ভোগের অনুরোধে ইঁহারা পিতামাতাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিতে কিছুমাত্র দ্বৈধ বোধ করেন না।

ইদানীং ইঁহারা যৌবন মদে মত্ত হইয়া শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ করেন, সেই হেতু ইঁহাদিগের মধ্যে নিরন্তর অকাল মৃত্যু বিচরণ করে—ইঁহারাই অনেক নবীনা বনিতা ও শিশু সন্তানের স্বচ্ছন্দের পথে কণ্টক দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। / ১২৩ /

কেশ বিন্যাস ও পরিচ্ছেদের পারিপাট্য করিয়া ইঁহারা বর্দ্ধিষ্ণু লোক হইবার আশা করেন।

অনেক যুবা ব্যক্তি অতি হেয় হইলেও আপনাকে ক্ষুদ্র প্রাণী বিবেচনা করেন না। মনে করেন, তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, যাহা পড়িয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, আর কেহ তাহা দেখেন নাই, শুনেন নাই, অথবা পাঠ করেন নাই, এইরূপ বিবেচনা করা যুবা সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এইক্ষণকার অনেক যুবকের চক্ষের জ্যোতিঃ এত ক্ষীণ হইয়াছে যে, তাঁহারা উজ্জ্বল দিবাভাগে চক্ষে কাঁচ আবরণ না করিয়া দীর্ঘাকার বর্ণ পড়িতে পারেন না; সে কালের অতি প্রাচীন মহাশয়েরা কাঁচের সাহায্য না লইয়া নিশার আলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর অনায়াসে পড়িতে পারেন। তখনকার যুবক এত সদাশয় ছিলেন যে, তাঁহাদিগের এক এক জনের সহিত শত সহস্র লোকের আন্তরিক প্রণয় হইত, এক্ষণকার যুবাদিগের সহিত অত্যল্প লোকেরও সদ্ভাব হয় না।

যুবারা তখন এত সরল ছিলেন যে, তাঁহারা অতি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্ব্বত্র যাইতেন, এক্ষণকার যুবা মহাশয়েরা অবস্থার অতিরেক বেশ বিন্যাস করিতে না পারিলে বিপদস্থ পরম বন্ধুর নিকটেও যাইতে পারেন না।

যে যুবক আজন্ম কাল অবগত থাকেন যে, তাঁহার পিতা কোন মহৎ ব্যক্তির উপাসনা করিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রতিপালন হইয়া আসিয়াছেন, লক্ষ্মী-শ্রী আশ্রয় করিলে সেই মহৎ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে কোন যুবা প্রায় তাঁহাকে /১২৪/ চিনিতে পারেন না, কেহ কেহ ছল করিয়া কহেন "আমি আপনাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বোধ হইতেছে, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, বিশেষ স্মরণ হইতেছে না।" হা কি অকৃতজ্ঞ ঘৃণিত প্রবৃত্তি! অসঙ্গতি জন্য যাঁহার পিতা বিদ্যালয়ের বেতন দিতে পারেন নাই, সেই জন্য যে ব্যক্তি তাঁহার বেতন দিয়া পড়াইয়াছেন, তাঁহাকেও অনেক যুবা মান্য করা দূরে থাকুক গ্রাহ্যও করেন না। এরূপ যুবারা আপনারা আপনাদিগকে যতই সম্ভ্রান্ত ও যতই উৎকৃষ্ট মনে করুন, আমি তাঁহাদিগকে অর্ব্বাচীন ও অদূরদর্শী ভাবিয়া এক্ষণে আর কিছু অধিক বলিলাম না।

বিঘ্নতত্ত্ব

এক্ষণে বঙ্গবাসীরা যেমন অনেক দিকে নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য অন্য দিক হইতে বিঘ্ন নানা মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

ইদানীং অবিরল শস্য ও প্রাণহন্ত্রা ঝটিকা হইয়া থাকে, সংক্রামক জ্বরে অসংখ্য লোক জীর্ণ শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, প্রভুর অনুগ্রহ এক্ষণে সিন্ধুগত রত্নের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, কর্ম্মচারীদিগকে ভঙ্গশীল কাঁচের ন্যায় নিজ নিজ সম্মানকে একান্ত সতর্কে রক্ষা করিতে হয়। জনসমাজে থাকিয়া পূর্ব্বে যেমন জনগণের সাহায্য ও সমবেদনার প্রত্যাশা করা যাইত /১২৫/, এক্ষণে আর তাহা করা যায় না। কন্যাপাত্রস্থ করা দারুণ ক্লেশদায়ক ব্যাপার হইয়াছে। প্রায় সকল মনুষ্যই সুরথ রাজার ন্যায় সন্তান হইতে সুখ লাভ করেন।

রেলওএ শকট যেমন সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে দেশান্তরে লইয়া যায়, তেমনি এক একবার ঐ সময়ের মধ্যে বহু লোককে যমালয় লইয়া যাইতেছে। গঙ্গার তরঙ্গ পূর্ব্বরূপ প্রাণহন্ত্রা আছে। ফিরিঙ্গি ও বঙ্গজাত সাহেবেরা বাঙ্গালির উপর বিষম বিরূপ। ডাক্তারদিগের দয়ার ভাগ কিছুমাত্র নাই। সুরাপান অতিশয় প্রবল হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রব্যাদি চতুর্গুণ মূল্যবান হইয়াছে, ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচনা প্রায় রহিত হইয়াছে। পুরোহিতেরা অঙ্গহীন করিয়া যজমানের ধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন করেন। দাস দাসী ও পাচিকা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। প্রজাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে গবর্ণমেন্ট ক্রমাগত কর্ম্মচারী বৃদ্ধি করিতেছেন। কি সম্বাদ—সামান্য বেতনের সবরেজিষ্ট্রার সবডেপুটী পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূস্বামীর উপর আদেশ আজ্ঞা ও বিভীষিকা প্রকাশ করিতেছেন। আইনের কি অদ্ভুত কৌশল হইয়াছে! দস্যুকে চৌর্য্য দ্রব্য সামগ্রীর সহিত রাজপ্রহরীর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেও প্রত্যয়জনক সাক্ষ্য দিতে না পারিলে সে অনায়াসে নিষ্কৃতি পায়। কি ভয়ানক বিঘ্ন! কে দ্বিপ্রহর রজনীতে ভদ্র জনকে সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া দস্যু ধৃত করিবে? কোন লোকের বনিতা যদ্যপি অন্যায় পূর্ব্বক স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যায়, তবে সে কোন দণ্ড পাইবে না; বিচারপতি কেবল সেই স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসিবেন "তুমি তোমার স্বামীকে কি চাও না?" সে যদি /১২৬/ বলে "না" তবেই নিষ্কৃতি পায়, তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, হায় কি ভয়ানক রাজনিয়ম !!!

বঙ্গভাষার সম্বাদপত্র হইতে বঙ্গের যেরূপ উপকার হয়, সেইরূপ অপকারও হইতেছে ; সে উপকারের বিবরণ সময়ান্তরে বলিবার মানস রহিল, এস্থলে বিঘ্ন বিবরণ বলিতেছি, উপকারের কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেক। সম্বাদ পত্র হইতে এই অপকার হইতেছে যে, সম্পাদকদিগকে উপাসনা করিলে ইঁহারা অপাত্রকে ও অযোগ্য ব্যক্তিকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন ; সেই প্রশংসাতে দর্পিত হইয়া মনুষ্য গুণসম্পন্ন হইতে পারেন না। আজ কোন ব্যক্তি অন্যায় করিয়া তাঁহাদিগের আশ্রয় লউন, তাঁহারা অমনি সযত্নে লেখনী ধারণ করিয়া সেই অন্যায়ী ব্যক্তির পক্ষ সমর্থনার্থে বদ্ধপরিকর হয়েন, বিদ্যার্থিদিগের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইবার উন্মুখে ইহারা তাঁহাদিগকে পরম পণ্ডিত বলিতে আরম্ভ করেন, ব্যক্তিরা দান অভ্যাস করিবার উপক্রম করিলে তাঁহাদিগকে বদান্য, বিচারপতিরা বিচারাসনে বসিতে বসিতে, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মচর্চ্চার কেহ আরম্ভ করিলেই তাঁহাকে মহর্ষি বলিতে আরম্ভ করেন, ক্ষীণ মন ব্যক্তির কর্ণে সমাচার সম্পাদকদিগের ইত্যাকার প্রশংসাবাদ প্রবেশ হইবা মাত্র তাঁহারা উচ্চাশয়ে গমন না করিয়া অভিমান ও অহঙ্কারে জড়িত হইয়া অধঃপতনে অগ্রসর হয়েন, কি ভয়ঙ্কর বিঘ্ন। সম্বাদ পত্র প্রচারকেরা বলিতে পারেন, ঐরূপ প্রশংসাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া লোকে উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন না হইয়া অপকৃষ্ট হইবে কেন ? তাহা সত্য, কিন্তু যাহাকে /১২৭/ যেরূপ বলিলে তাঁহার হিত হইবে, তাঁহারা—প্রায় সেরূপ বলেন না। যাহা হউক লোকে যত দিন সম্বাদ পত্রের বর্ণনা ও পঙ্গা ভট্টের অতিশয় প্রশংসাকে সমান জ্ঞান না করিবেন, ততদিন বিঘ্ন বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ দোষ সকল সম্পাদকের নাই।

আর এক বিঘ্নের কথা শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে ২৪ পরগণা হুগলি ও নদীয়া এই তিন জেলার লোক নিতান্ত দাসত্বের প্রিয় ছিলেন, অন্যান্য জেলার লোক তাদৃশ দাসত্ব প্রিয় ছিলেন না ; তাঁহারা অনেকে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন ; তাঁহাদিগকে দাম্ভিক ও আচার-ভ্রষ্ট জাতির উপাসনা করিতে হইত না, এক্ষণে সকল জেলার লোকেই হীন দাসত্ব বৃত্তির অনুগামী হইয়াছেন।

শিক্ষার্থীদিগকে গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ে নিতান্ত অধিক বেতন দিতে হয়, এজন্য বিপন্ন ভদ্রজন ধীশক্তি সম্পন্ন পুত্রকে পড়াইতে পারেন না। কেবল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের গজমতি সন্তানেরাই গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে সক্ষম হয়েন।

কিন্তু তাঁহাদিগের সুখ সম্ভোগের প্রতি নিতান্ত মনঃসংযোগ থাকাতে বিদ্যা জন্মে না। বিদ্যালয় হইতে কেবল ইংরাজদিগের দোষাংশ শিক্ষা করিয়া আইসেন।

সম্রান্ত ইংরাজের উপাসনা করিয়া অনেক ইংরাজী শিক্ষিত অযোগ্য ব্যক্তি স্থানে স্থানে বিচারাসন প্রাপ্ত হয়েন। পরম পণ্ডিত মানিয়া অনেক অবোধ উকীল মোক্তার মহাশয়েরা, তাঁহাদিগের উপর অবিশ্রান্ত অসঙ্গত স্তুতিবাদ বর্ষণ করেন। সেই /১২৮/ প্রশংসাবাদে দর্পিত হইয়া ইঁহাদিগের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। বিচারাধিকারের অন্তর্গত এবং ইঁহাদিগের অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট ধনবান, সম্রান্ত ও জ্ঞানাপন্ন যে সকল লোক থাকেন, তাঁহাদিগের উপরেও ইঁহারা অনুচিত প্রভুত্ব ও গরিমা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়েন। কি ভয়াবহ বিঘ্ন! বিখ্যাত ব্যক্তিদিগকেও সেই প্রভুত্ব-প্রমত্ত রাজদাস-দিগকে অতিশয় শঙ্কা করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেন যে, বনে বসতি করিলে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদিগেরও শ্বাপদের আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এক্ষণকার অধিকাংশ বঙ্গবাসী অতি কুটিল হইয়াছেন, সেই হেতু ইঁহাদিগের পরস্পর কেহ কাহাকে এমন কি অতি নিকট সম্বন্ধীয় লোককেও প্রত্যয় করেন না—পিতা মাতা পুত্রকে,—পুত্র পিতামাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, গুরু শিষ্যকে, শিষ্য গুরুকে, রাজা প্রজাকে, প্রজা রাজাকে প্রত্যয় করেন না। ইঁহারা সুযোগ পাইলে সকলেই সকলকার অপকার করেন উপকার করিতে তত মনোযোগী নহেন; ইহাতে সমাজের যথেষ্ট বিঘ্ন হইতেছে।

পূর্ব্বাপেক্ষা খাদ্যদ্রব্য সমুদয় অতিশয় কৃত্রিম হইয়াছে, যাহা ব্যবহার করিয়া লোকে সর্ব্বদাই পীড়িত হয়েন।

ধন লোভ নিতান্ত প্রবল হওয়াতে অনেক ভদ্রসন্তান নিকৃষ্ট বৃত্তি অব-লম্বন করিয়াছেন; কি ভয়াবহ বিঘ্ন!

বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা অবৈধ কার্য্য করিলে অনেক সামান্য লোক তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুসারে অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। /১২৯/ বর্দ্ধিষ্ণু লোকের অবৈধ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট কার্য্য করিবার সঙ্গতি আছে ও তাঁহারা তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তাবলম্বী সামান্য লোকের তাহা কিছুই করিবার সঙ্গতি নাই। তাঁহারা কেবল মাত্র অবৈধ কার্য্য করিয়া জনগণের নিকট ঘৃণিত হয়েন।

সম্প্রতি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বিশেষত কলিকাতা রাজধানীতে সর্ব্বদাই এক এক সভাধিবেশন হয়, তাহার মধ্যে যে যে সভায় বিদ্যালয়ের উন্নতি, ঔষধালয় সংস্থাপন, পথ সংস্কার কিম্বা রাজনিয়ম সংশোধন প্রভৃতির আন্দোলন হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। তদ্ভিন্ন আর যে যে সভায় অধিবেশন হয়, তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। কেবল বিঘ্ন উৎপত্তি হয়।

সভ্যগণ স্বকপোল কল্পিত বিষয় ও তাঁহাদিগের ভ্রম সংস্কার সংক্রান্ত উপদেশকে জ্ঞানগর্ত্ত বলিয়া প্রচার করেন ও আশা করেন, সেই সকল মত লোকের ধারণায় অভ্রান্ত বলিয়া প্রদীপ্ত থাকে। কিন্তু প্রায় আর্য্যবংশীয়-দিগের এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান আছে যে, সেই স্বকপোল-কল্পিত ভ্রম সংস্কার সংস্থাপনার্থে সভ্য মহাশয়েরা যাহা ব্যক্ত করেন, সভা-স্থান পরিত্যাগ করিবার পরক্ষণেই শ্রোতাদিগের অন্তঃকরণে আর তাহা বিরাজ করিতে পারে না।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে অসাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন এমন কোন লোকই আবির্ভূত নাই, যে, তাঁহার নিজ মতকে জ্ঞানগর্ত্ত ভাবিয়া কেহ গ্রাহ্য করিতে পারে।

ইহাঁরদিগের সভা, ইহাঁরদিগের বক্তৃতা, ইহাঁরদিগের /১৩০/ ভ্রমমূলক জ্ঞানের আলোচনা ও প্রচারকে, বুদ্ধিজীবী লোকেরা তৃণজ্ঞান করেন। তবে কেন যে ইহাঁরা, সভা হইবার ঘোষণাপত্র বিতরণ, রাত্রি জাগরণ, বর্ত্তিকা দহন করিয়া নগর, পল্লী, উপপল্লী আলোড়ন করেন ইহার মর্ম্ম বোধগম্য নহে। ইহাঁরদিগের মনোগত প্রসঙ্গ সংক্রান্ত বক্তৃতার চীৎকারে, জনসমাজের কর্ণ বধির না করিলেই লোকে নির্ব্বিঘ্নে থাকে। এই সকল স্ব স্ব অপূর্ব্ব মত সংস্থাপনের সভায়, সারদর্শী বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাশয়গণ পদার্পণ করেন না। ঐ সকল সভায় গমনাগমন করিলে লোকের মতিচ্ছন্ন হয়, বঙ্গভূমির দুরদৃষ্টে ঐ সকল সভা কি বিঘ্নদায়কই হইয়াছে।

ভারিত্ব

পূর্ব্বকালের ভারিত্বপ্রিয় লোকেরা গাঢ়তর মঙ্গলময় চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, অথচ সদাশয়ে সকলের সহিত প্রণয়ালাপ করিতেন।

এক্ষণকার অনেকের এক প্রকার কদর্য্য ভারিত্বরূপ দুর্দ্দমনীয় পীড়া জন্মিয়াছে, এই ভারিত্বের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে বন্ধুলাভ করিতে পারেন না। ভারিত্বের প্রাদুর্ভাবে পূর্ব্ববন্ধু পর্য্যন্ত অনাত্মীয় হয়েন। এইরূপ ভারিত্বের আশ্রয়ে এক্ষণে লোকে সম্ভ্রান্ত হইতে প্রত্যাশা করেন, তাহা হইতে পারেন না। ভারিত্বাভিমানীকে সকলেই তাচ্ছিল্য করেন। /১৩১/

মানসিক কষ্ট ব্যক্ত করিলে মনের ক্লেশ হ্রাস হয়। ভারিত্বাবলম্বীরা সংসারে যে ক্লেশ পান, সেই ক্লেশের সহিত মানবলীলা সম্বরণ করেন, অধিক বাক্য ব্যয় না করাতে, তাঁহারদিগের দুঃখ প্রকাশ পায় না, সুতরাং কেহই তাঁহারদিগের দুঃখভাগী হইতে পারেন না।

জনসমাজের সকলকে সদালাপের সহিত সম্ভাষণ করিয়া পরিতৃপ্ত করণজন্য মনুষ্যের বাক্‌শক্তি হইয়াছে, কিন্তু ভারিত্বাভিমানীরা সদালাপে বিমুখ। এমন গুরুতর ভারিত্বাবলম্বী লোক দেখা গিয়াছে যে, পল্লীতে চৌর্য্য কার্য্য হইলে তাঁহারা সে বিষয়ের আদ্যোপান্ত কি জানেন রাজপক্ষীয় লোকেরা তাঁহারদিগের দ্বারা জানিতে সন্ধান করিলে, তাঁহারা মনোগত কথা ব্যক্ত না করায় দস্যুর সহচর সন্দেহ পূর্ব্বক শান্তিরক্ষকেরা তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে। যথায় হিংস্রক জন্তু, ভীষণ ভুজঙ্গ ও নৃশংস দস্যু বিচরণ করে, সেই ভারিত্বাভিমানী মহাত্মারা জানিয়াও লোকের নিকট ব্যক্ত না করাতে, কত প্রাণী সতর্ক হইতে না পারিয়া বিনষ্ট হইয়াছে। কত সাধু ব্যক্তি অসাধু লোকের সহিত বন্ধুতা করিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে—সেই অসাধু ব্যক্তির সমস্ত বিবরণ জানিয়াও দুরাচার ভারিত্বাভিমানীরা তাহা সাধু ব্যক্তিগণের নিকটে প্রকাশ করেন নাই।

এইরূপ গাঢ়তর ভারিত্বের সঙ্গে তাঁহাদিগের অনেকের যৎপরোনাস্তি লঘুত্ব আছে। কালাতিপাত করিবার জন্য তাঁহারা নির্জ্জীব তাস ও পাশাকে সহচর করিয়া থাকেন। তদপেক্ষা সামান্য /১৩২/ মনুষ্য ও শিশুকে সহচর করিয়া কালাতিপাত করাও শ্রেয়ঃ। কারণ ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রায় কোন মনুষ্য হেয় ও অশ্রদ্ধেয় নহে; ভারিত্বাভিমানীরা তাস পাশাকে বহন করিতে সর্ব্বাঙ্গ নত

করেন, তথাচ কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র প্রাণী ও শিশুকে নিকটে যাইতে দেন না, মধ্যে মধ্যে পেচকের স্থায় মুখভঙ্গি করিয়া আলাপয়ের স্থায় বলেন যে, "অমুক ব্যক্তি যার তার সঙ্গে সহচারিতা করে," তাহা শ্রুত মাত্র মহামতি গে-সাহেবের এই পদ্যাবলী আমার স্মরণ হয়।

Can grave and formal pass for wise,
When men the solemn owl despise !

অনেকে বলেন ঐরূপ ভারিত্বপ্রিয় লোকের মুখমণ্ডল প্রত্যূষে দর্শন করিলে নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত হয় না, কিন্তু সে কথার সত্যতার প্রতি আমরা নির্ভর করিতে পারি না। ফলতঃ তাঁহাদিগের বিষণ্ণ বদন নয়নগোচর হইলে অন্তঃকরণ বিমর্ষ হইয়া যায়; ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের নিকট যাইতে লোকের যেরূপ ভয়ানক শঙ্কা জন্মে, ভারিত্বাভিমানী নরাকার পশুর সমীপে যাইতেও সেইরূপ শঙ্কা জন্মে। অসদৃশ ভারিত্ব—বিশেষ অহঙ্কারের চিহ্ন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

যাঁহারা সত্বর বিষয় ব্যাপার বুঝিতে অশক্ত, তাঁহারদিগের পক্ষে ভারিত্ব অবলম্বন করা এক বিচিত্র কৌশল, সন্দেহ নাই। ভারিত্ব উপলক্ষ করিয়া নীরব থাকায় আরও লাভ আছে, বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব স্বজন অতিথি অভ্যাগত-দিগের জন্য দায়গ্রস্ত হইতে হয় না অর্থাৎ ঐ প্রকার ভাবাপন্ন লোকের নিকট যাইতে /১৩৩/ মনুষ্যমাত্রেই ঘৃণা করেন। সদাশয় বলিয়া মনুষ্যকে লোকে যে সুখ্যাতি করিয়া থাকেন, ভারিত্বাভিমানীরা সে সুখ্যাতি লাভের অধিকারী নহেন, তাঁহাদিগকে সকলেই নীচাশয় বলে। নীচাশয় নাম লইয়া তাঁহারা কি সুখে যে ধরাতলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন বলা যায় না তবে অধীন জনের নিকট কিঞ্চিৎ ভারিত্ব প্রকাশ না করিলে তাহারা ভয় পায় না, ও কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করে না, সেই হেতু দিবারাত্রি তাহাদিগের নিকট ঐরূপ কুৎসিত ভারিত্বের মূর্ত্তি ধারণ করা উচিত নহে; সময়ে সময়ে প্রফুল্ল বদনে অধীনদিগের মঙ্গলামঙ্গলের সমাচার লইতে হয়। এক্ষণকার কদর্য্য ভারিত্বা-বলম্বিদিগের সে সকল বিবেচনা না থাকায় তাঁহাদিগকে নিতান্ত নরাধম বলিয়া লোকে গণ্য করিয়া থাকেন।

ভারিত্বাভিমানীর বিবরণ অতি কৌতুকাবহ, উহাঁদিগের মুখাবলোকন করিলে অন্তঃকরণ বিষণ্ণ হয় সন্দেহ নাই; উহাঁরা সদয়চিত্তে হাস্য কৌতুক না করিলে ভিন্দিপাল প্রহার করা উচিত, ইহা আমাকে জাষ্টিশ মিত্র বাবু জনান্তিকে বলিয়াছেন।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রমোহন [তর্ক] সিদ্ধান্ত ও বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়গণের আত্মা স্বসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান বিবরণ উল্লেখ করিলে, শ্রবণান্তে সভাপতি প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাত্মার অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা একণে এইরূপে তিনি ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। /১৩৪/

উপসংহার

গ্রিন্সের উক্তি

ভাগ্য মন্দ না হইলে সকল সুখে বঞ্চিত হইবার পথে বঙ্গবাসীরা অনেকে পদার্পণ করিবেন কেন? ভিক্ষা দানে বিরত হইয়া এক্ষণে তাঁহারা অনেকে এক প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াছেন। পরোপকার ও আতিথ্য কার্য্যে বিরত হইয়াছেন। পীড়াদায়ক খাদ্য বস্ত্র ব্যবহারে তৎপর হইয়াছেন। আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান মনে করেন। মন্দভাগ্য না হইলে অভিমানে আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ভাবিয়া চিরদিন নির্ব্বোধ থাকিবেন কেন? নব্য মহাশয়েরা স্ত্রী-জাতিকে স্বাধীনতা প্রদানে প্রোৎসাহী হয়েন। কামিনীগণকে লইয়া প্রকাশ্য স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ভাগ্য মন্দ না হইলে কুলাঙ্গারেরা কুলাঙ্গনাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে লইয়া বিঘ্ন বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত হইবেন কেন?

কোন মহাপুরুষ কুলস্ত্রীগণকে মহারাণীর পুত্রের নেত্রপথে আনিয়া মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। অনধিকার স্থানে দেশীয় বিচারপতিরা ও ভূস্বামীরা অভিমানের বলে প্রভুত্ব করিতে যত্ন পান। কলিকাতার স্কুল শুভবিশিষ্ট বিদ্যালয়ের /১৩৫/ শিক্ষক ও ছাত্রগণ পরম পণ্ডিত রাজা রাধাকান্তকে যৎসামান্য জ্ঞানাপন্ন বলেন এবং ইয়োরোপীয়দিগের নিকট স্বজাতির নিন্দা করেন এ সমস্তই অসহ্য।

প্রাচীন কর্ম্মচারিরা কার্য্যে অশক্ত হইলে অনেক প্রভু এক্ষণে তাহাদিগকে কার্য্যচ্যুত করেন অথচ আর তাহারদিগের প্রতিপালনে মনোযোগী হয়েন না। কর্ম্মচারিরা কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইলে প্রভুরা তাহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। এক্ষণকার লোকের ভাগ্য মন্দ না হইলে প্রভুরা চির-কিঙ্করের প্রতি আজ কাল নিতান্ত নিষ্ঠুর হইবেন কেন?

অসময়ে অসুস্থ অনাহারী অধীন কর্ম্মচারীকে অনেক প্রভু দুর্গম স্থানে প্রেরণ করেন ও মধ্যে মধ্যে আদ্যোপান্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়া থাকেন।

পিতা পিতৃব্য জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতির উপর অনেক কৃতী প্রভুত্ব করেন ইত্যাদি সকলই শোচনীয় ব্যাপার।

যাহাতে ইতর শব্দাবলী ও ব্যভিচার দোষের আন্দোলন আছে, সেই সকল কুৎসিত গ্রন্থ পাঠে অনেকের রুচি হইয়াছে।

ভাগ্য মন্দ না হইলে সমস্ত বিষদায়িনী বাসনায় আধুনিক মনুষ্যের মন ধাবমান হয় কেন ?

যবন বালকদ্বয়ের সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা শুনিলাম, সেই রূপ অনেক শ্রোতা মাইকেলের পদাবলী শুনিয়া ভাবে নিমগ্ন হয়েন। ইহা নিতান্ত কৌতুকাবহ !

বিচারালয়ের অনুচিত ভাষা রহিতের কোন উপায় হইতেছে না। ইহা ব্যবস্থাপক সভার মহৎ অনবধানতা। /১৩৬/

সমালোচকেরা কেবল আত্মীয় ও অনুগত লেখকদিগের রচনার সমালোচনা করেন। ইহা সম্পূর্ণ অন্যায়।

যাহা হউক এ সকল কুলক্ষণের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ সমুদায় প্রচলিত আছে এবং মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতির অনুবাদক উৎকৃষ্ট লেখকেরা গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন সেই পরম মঙ্গল। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য যে কাদম্বরীর সুমধুর রচনা রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা পাঠকেরা যখন তখন পাঠ করিয়া থাকেন ; বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রচলিত আছে ; সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ হইতেছে ও তাঁহারও লেখার দোষ গুণ বিচারে ইদানীং অনেকে সক্ষম হইয়াছেন ইহা শুভ সংঘটনার লক্ষণ। ভূদেববাবুর পুস্তকে জনসন প্রাট্ সাহেবের বিবরণ অতি রহস্যজনক। অতঃপর হরিনাথ ন্যায়রত্ন, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মধুসূদন বাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশুদ্ধ ও ললিত সন্দর্ভ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শুনিয়া বিমোহিত হইয়াছি। নভেল নাটকের হিল্লোল সভ্য মহাশয়েরা সুরলোকে উত্থাপন করেন নাই সেই শুভদায়ক।

মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের স্বভাবোক্তি বীর করুণ বীভৎস প্রভৃতি রস যেরূপ প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছে, কালীপ্রসন্নের বাচনিক শুনিলাম, সেই সেই রস ভাগ পাঠ করিলে চমৎকার জ্ঞান হয়, ঐ সকল রস বর্ণনা উপলক্ষে মাইকেল যে অসাধারণ কবিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, /১৩৭/ তাহা শত মুখ হইলেও প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এক্ষণকার কবিতার যে যে দোষ তাহা তিনিই প্রথমে প্রচলিত

করিয়াছেন, সেই সকল দোষ ইতিপূর্ব্বে বেদান্তবাগীশ উল্লেখ করিয়াছেন, আমিও তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি,—এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষিত খঞ্জনী ভায়ারা নির্দ্দোষ কবিতা লিখেন না,—কবিতা সম্বন্ধে তাঁহারদিগের রুচিই অপ্রশংসনীয়; তাঁহারা যে সকল ছন্দ মনোনীত করেন, তাহা সুশ্রাব্য নহে, তাঁহারদিগের কবিতা যতি-বর্জ্জিত. সাধু, অসাধু, গ্রাম্য, ও দেশান্তরীয় ভাষাতে বিমিশ্রিত; কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া স্থান ভ্রষ্ট করিয়া তাঁহারা কবিতা রচনা করেন; যদ্যপিও কবিতাতে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া স্থান ভ্রষ্ট করিবার রীতি আছে, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত খঞ্জনী ভায়ারা যেরূপ ইংরাজী প্রণালীতে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া স্থান ভ্রষ্ট করেন, বঙ্গ ভাষার কবিতায় সে প্রণালী অবলম্বন করিলে কবিতা কুৎসিত হয়, তাঁহারদিগের রচনায় ব্যাকরণ যে কোথায় থাকে, তাহার নির্ণয় করা যায় না, তাঁহারা কেহই অলঙ্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবিতা লিখিতে পারেন না, অলঙ্কার বিরুদ্ধ কবিতা কখনই মনুষ্যের মনোরঞ্জন করিবার উপযুক্ত হয় না।

রঙ্গলাল, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নীলমণি প্রভৃতির কবিতা সম্বন্ধে তর্কভূষণ মহাশয় ও বেদান্তবাগীশ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমার একান্ত অনুমোদনীয়।

শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহা অন্তঃকরণের সহিত গ্রাহ্য না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না। স্থূলতঃ সংস্কৃত /১২৮/ শাস্ত্র এমন অসার পদার্থ নহে যে, আধুনিক বাবুদিগের অকিঞ্চিৎকর তর্ক বলে তাহা ম্লান ভাব ধারণ করে। তাঁহাদিগের মধ্যে সুবিজ্ঞাভিমানিগণ শাস্ত্রের কোন স্থানের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া রজ্জুকে সর্পজ্ঞানের ন্যায় আপাতত যেরূপ বুঝিয়া লন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক নির্ব্বোধগণ তাহাতেই সমস্ত শাস্ত্র ভ্রান্ত মনে করিয়া প্রত্যেকেই ধর্ম্ম শাস্ত্রের শুক সনাতন প্রভৃতি হইয়া বসেন। মন্দভাগ্য না হইলে অভ্রান্ত ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্রের উপদেশ এক্ষণকার অনেকের মনে অযুক্তিমূলক বলিয়া ভাসমান হইবে কেন?

পিতা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পুত্রের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহ করেন না; অশিক্ষিত পুত্র পূর্ব্বে পিতার প্রতি যেরূপ ভক্তি করিতেন, এক্ষণে সুশিক্ষিতেরা পিতাকে সেরূপ করেন না, পিতার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করেন। মাতাকে পুত্র শ্রদ্ধা করেন না, তাহাকে পরিশ্রম করান, তাহার পরিতোষের কোন কার্য্য করেন না। মন্দভাগ্য না হইলে পুত্রের সাহায্য লাভে লোকেরা

বঞ্চিত হইবেন কেন ? যেরূপ আন্তরিক যত্ন সহকারে উপাদেয় ফল পুষ্পের প্রত্যাশায় কোন বৃক্ষ রোপণ করিলে যদ্যপি তাহাতে সুস্বাদু ফল ও সগন্ধ পুষ্প উৎপন্ন না হয়, অথবা যদি নিদাঘ সন্তাপিতের নেত্রপথে নবীন নীরদ উদয় হইয়া তাহা বারি বর্ষণ না করে, তবে যেরূপ মনস্তাপ হয় ; উপযুক্ত পুত্রের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইলে তদপেক্ষা অধিক মনস্তাপ জন্মে।

ভাগ্য অপ্রসন্ন না হইলে এক্ষণকার যুবাগণ বলবীর্য্য /১৩৯/ শূন্য হইয়া বিষম বিড়ম্বনায় নিপতিত হইতেন না। অনেক ভ্রাতার, ভ্রাতার সহিত প্রণয় রহিত হইয়াছে, পূর্ব্বকালেও ভ্রাতৃ-কলহ ছিল, কিন্তু একালের ন্যায় তাহা প্রত্যেক পরিবারে প্রবল ভাবে ছিল না। ভগিনীর প্রতি এক্ষণকার অনেকের অণুমাত্র স্নেহ নাই। পিতৃব্য মহাশয়েরা অনেকে ভ্রাতৃ-পুত্রের প্রতি পরম শক্রতাচরণ করেন। ভ্রাতৃ-পুত্র পিতৃব্যকে যে সে একজন বলিয়া অবহেলা করেন। স্ত্রীকে হিতোপদেশ না দিয়া স্বামী নির্ব্বোধ স্ত্রীর বশীভূত হইয়া আত্মীয় জনের সহিতও অনুচিত ব্যবহার করেন। জামাতা শ্বশুরের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াও সন্তোষ হয়েন না। শিক্ষা দীক্ষা ও বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুকে এক্ষণকার অনেক মহাপুরুষ তৃণতুল্য জ্ঞান করেন। অতঃপর বঙ্গে মাতৃস্নেহ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে ; প্রভাবতীর নিকট শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ভগিনী কখন্ ভগিনীর মুখমণ্ডল দর্শন, কখন্ তাহার সঙ্গে মধুরালাপ করিবেন, এই আশায় দিন যাপন করিতেন ; এক্ষণে ভগিনী অন্য ভগিনীকে যত্ন সহকারে দর্শন করেন না। আপনার বসন ভূষণ পান ভোজন উৎকৃষ্ট হইলেই হইল, স্বামীর প্রকৃত সেবাতে এক্ষণকার অনেক স্ত্রী নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক নহেন। কন্যাকে কখন দেখিব কত দিনে তাহাকে জামাতার গৃহ হইতে আনিয়া অঙ্কে উপবেশন করাইব এই সকল স্নেহসূচক চিন্তায় আর একালের অনেক জননী অভিভূতা হয়েন না ; কত কষ্ট স্বীকার করিয়া মাতা কন্যাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, কতই স্নেহ করিয়াছিলেন, এই মনে /১৪০/ ভাবিয়া ও মাতার অদর্শন স্মরণ করিয়া পূর্ব্বে কন্যাগণ রাত্রিদিন অশ্রুপাত করিতেন, এক্ষণকার কন্যারা প্রায় সেরূপ করেন না। কামিনীর কোমল প্রাণ কঠিন হওয়া উচিত নহে, সে বিবেচনা না করিয়া কেহ কেহ বলেন, এক্ষণকার স্ত্রীলোকেরা উচ্চমনা হইয়াছেন, তাঁহারা অনিত্য ক্ষীণ স্নেহের বশবর্ত্তিনী নহেন। ভ্রাতৃ-জায়ার প্রতি ননন্দৃ ও ননন্দৃর প্রতি ভ্রাতৃ-জায়ার দুষ্ট অভিসন্ধি দেখিয়া জনসমাজ পরিত্যাগ করিতে লোকের ইচ্ছা জন্মে। ভ্রাতৃ-কন্যার প্রতি পিতৃস্বসার ব্যবহার অতি নিন্দনীয় হইয়াছে।

সম্বন্ধ নিবন্ধন স্নেহ এ সময়ে যেরূপ হ্রাস হইয়াছে তাহাতে লোকালয়ে কি গহন কাননে বাস বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে সমান হইয়া উঠিয়াছে ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়।

পূর্ব্বে স্ব-সম্পর্কীয় লোকের অপ্রতুল দেখিলে বঙ্গবাসীদিগের অশ্রুপাত হইত এবং তদর্থে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে ব্যগ্র হইতেন। পূর্ব্বে স্ব-সম্পর্কীয় লোকের কঠিন পীড়া হইলে যে বঙ্গে লোকে সুস্থির হইয়া নিদ্রা যাইতেন না, যে বঙ্গে স্ব-সম্পর্কীয় লোক শোকার্ত্ত হইলে লোকে তাঁহাকে বহুদিন পর্য্যন্ত সান্ত্বনা করিতেন, তাঁহার সহবাস পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেন না, যে বঙ্গে কেহ বিপদস্থ হইয়া বিচারালয়ে যাইলে স্ব-সম্পর্কীয় লোকেরা তাঁহাকে উদ্ধার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না, এক্ষণে সেই বঙ্গে কি দারুণ অপ্রতুল! কি উৎকট পীড়া! কি হৃদয় বিদীর্ণকর শোক সন্তাপ! কি বিচারালয়ের বিষম বিপদ! কোন উপলক্ষেই কোন স্ব-সম্পর্কীয় লোক কাহাকে পরিত্রাণ করিতে অগ্রসর হয়েন /১৪১/ না। কি দুঃসময়, কি নির্মমতা, কি নিষ্ঠুরতা, সম্প্রতি বঙ্গে বিচরণ করিতেছে, অপরের এবং আপনাদিগের নিকট শুনিয়া অপার দুঃখে নিপতিত হইলাম।

নব যুবারা নিতান্ত বলবীর্য্যবিহীন ও সুখ-ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন, এ সমস্ত শুনিয়া তাঁহারদিগের জন্ম গ্রহণের সার্থকতা কিছুই নাই বিবেচনা হইল।

বিঘ্নতত্ত্বে যে সকল বিঘ্নের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহা শুনিয়া হৃদ্‌কম্প হইতেছে। উপায় কি? ভাগ্য নিতান্ত মন্দ না হইলে এককালে নানা বিঘ্ন অর্থাৎ সমাজের বিঘ্ন, শারীরিক বিঘ্ন, দৈব কর্ত্তৃক দেশপ্লাবন ও শস্য হানি বিঘ্ন, ভাষার বিঘ্ন, সভা সংস্থাপন দ্বারা মহা বিঘ্ন, কোন কোন সম্বাদ পত্রিকা সম্পাদকের কৃত বিঘ্ন, দাসত্বানুরাগ বিঘ্ন প্রভৃতি পুঞ্জ পুঞ্জ বিঘ্ন দেখা দিত না।

এ সমস্ত অশুভ সংঘটনা নিবারণের উপায় কি, সভ্য মহাশয়েরা তাহা স্থির করিয়া তৃতীয় সভাধিবেশনে আমাকে অবগত করিলে বিশেষ পরিতুষ্ট হইব, এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রিন্স্‌ প্রভৃতি পরস্পরে সদালাপের পর সভা ভঙ্গ করিয়া বিদায় হইলেন। তৎপরে সুরলোকে সুমধুর বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। /১৪২/

S. S. B. S.

তথ্যপঞ্জী

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

প্রবন্ধকার। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক (১৮৪০-৪৩)। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক (১৮৪৩-৫৫)। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ১৮৪৩। নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা (১৮৫৫-১৮৫৮)। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত, কলিকাতা, ১২৯২।

অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার

সংস্কৃত পণ্ডিত। হুগলী কলেজের অধ্যাপক। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত-এর অন্যতম অনুবাদক।

অমরসিংহ

অমরসিংহ প্রণীত 'নামলিঙ্গানুশাসন' সাধারণত 'অমরকোষ' নামে পরিচিত। তিনটি ধারায় বিভক্ত সমার্থক শব্দের অভিধান 'অমরকোষ'।

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (– ১৮৭৩)

সংস্কৃত পণ্ডিত। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত-এর অন্যতম অনুবাদক। ব্রাহ্মসমাজের একজন 'অধ্যক্ষ'। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক (১৮৬৫-৬৭, ১৮৬৯-৭৩)। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৮৭০) গ্রন্থ রচয়িতা।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (১৮১৯-১৮৭৫)

সংস্কৃত পণ্ডিত। কাশীতে বেদবিদ্যা চর্চা। তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক। 'বেদান্তসার' (১৮৪৯), 'বৃহৎকথা' (প্রথম খণ্ড ১৮৫৭, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৮), 'শকুন্তলোপাখ্যান' (১৮৫৯), 'বেদান্তদর্শনম্' (১৮৬২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

আলবার্ট হল্

যুবরাজ আলবার্টের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে ২৫শে এপ্রিল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ১৫ কলেজ স্কোয়ারে কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে আলবার্ট হল্

প্রতিষ্ঠিত হয়। সভা-সমিতি, গ্রন্থাগার এবং সংস্কৃতিকেন্দ্র রূপে গৃহটি ব্যবহৃত হতো।

দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'আলবার্ট হল্,' কলিকাতা সংস্কৃতিকেন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ১৭০-৭৬।

আশুতোষ দেব (১৮০৪ ১৮৫৬)

রামদুলাল দেবসরকারের পুত্র। ছাতুবাবু নামে পরিচিত। সঙ্গীত ও নাট্যচর্চায় উৎসাহী। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভ্য। 'ধর্মসভা'র অন্যতম 'দলপতি' ছিলেন।

অ্যাডিসন

Addison, Joseph (১৬৭২-১৭১৯)। প্রবন্ধকার। *Tatler* পত্রিকার নিয়মিত লেখক (১৭০৯-১১) ও *Spectator* পত্রিকার অন্যতম পরিচালক।

ইণ্ডিয়ান লিগ্

প্রতিষ্ঠা ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৫। উদ্দেশ্য—সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব রক্ষার উপায় নির্ধারণ, এবং দেশের অর্থোৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সাধন। প্রধান উদ্যোক্তা—শিশিরকুমার ঘোষ। প্রথম সভাপতি—শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন

প্রতিষ্ঠা ২৬শে জুলাই ১৮৭৬। উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক জনমত গঠন এবং সর্বভারতীয় মিলনকেন্দ্র স্থাপন। প্রধান উদ্যোক্তা—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন ঘোষ।

দ্র. J. C. Bagal, *History of the Indian Assciation, 1816-1951*, Calcutta, 1953.

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

কবি ও সাংবাদিক। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), 'সংবাদ রত্নাবলী' (১৮৩২), 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮৪৬), 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৭) পত্রিকার সম্পাদক। জীবৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থ—'কালীকীর্ত্তন' (১৮৩৩), 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৫), 'প্রবোধ প্রভাকর' (১৮৫৮)।

দ্র. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, কলিকাতা, ১৯৬৮।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

গদ্যলেখক, সংস্কৃত পণ্ডিত, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার (১৮৪১-৪৬), হেড-রাইটার (১৮৪৯-৫০); সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী (১৮৪৬-৪৭), অধ্যাপক (১৮৫০-৫১), অধ্যক্ষ (১৮৫১-৫৮)। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন স্থাপন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮), 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১-৭৩) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

উইলসন্

Wilson, Horace Hayman (১৭৮৬-১৮৬০)। ভারতবিদ্যাবিদ্। চিকিৎসক। কলিকাতা মিণ্টের অ্যাসে-মাস্টার (১৮১৬-৩২)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডেন প্রোফেসর অফ স্যান্স্ক্রিট (১৮৩২)। *Meghdut* (১৮১৩), *Lectures on the religious and philosophical systems of the Hindus* (১৮৪০), *Sketches of the religious sects of the Hindus* (১৮৪৬) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

একাধিক সহস্র রজনী

আরব্য উপন্যাসের একাধিক বঙ্গানুবাদের মধ্যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সত্যচরণ গুপ্ত কর্তৃক গুপ্ত প্রেস থেকে প্রকাশিত 'সচিত্র একাধিক সহস্র রজনী' বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। অনুবাদকের নাম নেই। প্রত্যেক মাসে খণ্ডাকারে পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হতো। *The Bengal Magazine* পত্রিকার প্রথম খণ্ডের প্রশংসা করা হয়েছে, 'The language of the translation is good classical Bengali' (no. 38, September 1875, p. 96).

এড্‌ওয়ার্ড

Edward, Albert, Edward VII (১৮৪ -১৯১০)। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র। যুবরাজ রূপে ভারতবর্ষে আসেন ডিসেম্বর ১৮৭৫। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর ইংল্যাণ্ডের রাজা ও ভারতসম্রাট পদে অভিষিক্ত (২৩ জানুয়ারী ১৯০১)।

কালভীন ঘাট

কল্‌ভিন ইংরেজ ব্যবসায়ী। ডেভিড হেয়ারের মতো ভারতপ্রেমিক। স্মরণীয় 'পঞ্চ গোরা'র অন্যতম।

'হেয়ার কল্‌ভিন্ পামারশ্চ কেরী মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং।'

গঙ্গার ধারে কলভিন যে-ঘাট নির্মাণ করেন তা 'কালভিন ঘাট' নামে পরিচিত।

'Moving up from Chandpal Ghāt, along the noble Strand, we come upon Colvin's Ghāt, which from time immemorial was called, the *Kucha goodee* Ghāt, or the place for careening native boats.... In the immediate vicinity of Colvin's Ghāt is the Police Ghāt, now adorned by the Metcalfe Hall.' (J.C. Marshman, 'Notes on the left or Calcutta bank of the Hooghly', *Calcutta Review*, January 1845, p. 438).

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)

গদ্যলেখক। বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক (১৮৫৩)। 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫-৫৬), 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' (১৮৬১) পত্রিকার সম্পাদক। 'বাবু নাটক' (১৮৫৪), 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' (১৮৫৭), 'সাবিত্রীসত্যবান নাটক'

(১৮৫৭), 'মালতীমাধব নাটক' (১৮৫৯) রচয়িতা। 'পুরাণ সংগ্রহ : মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত' (১৮৬০-৬৬) গ্রন্থের প্রকাশক। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬১) গ্রন্থের লেখক হিসাবেই সর্বাধিক পরিচিত। অধুনা সুকুমার সেনের অভিমত, কালীপ্রসন্ন নিজে গ্রন্থটি লেখেন নি, 'অনুমান করি এই ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখনীই হুতোম প্যাঁচার নক্শার চিত্রকর।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ. ২০১)। কিন্তু তাঁর 'অনুমান' যুক্তি ও তথ্য সমর্থিত নয়।

দ্র. Manmathanath Ghosh, *Memoirs of Kali Prossunno Singh*, Calcutta, 1920.

কালীময় ঘটক (বন্দ্যোপাধ্যায়) (১৮৪০-১৯০০)

উপন্যাস-লেখক ও প্রবন্ধকার। পিতা চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত। রাণাঘাট স্কুলে শিক্ষালাভ। নদীয়া জেলার ভালুকা গ্রামের বঙ্গ বিদ্যালয়ে হেডপণ্ডিত, বর্ধমানের বেলেড়া গ্রামের বঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা; রাণাঘাট বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন ও চব্বিশ বৎসর শিক্ষকতা; কালিকাটা বয়েজ স্কুলে শিক্ষকতা। 'গ্রামবাসী' পত্রিকা পরিচালনা; মজুর ও ব্যবসায়ীদের জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন; রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার; কলিকাতা জমিদারী পঞ্চায়েত সভায় যোগদান। 'প্রথম চরিতাষ্টক' (১৮৬৩), 'দ্বিতীয় চরিতাষ্টক' (১৮৭৩), 'ছিন্নমস্তা' (১৮৭৮), 'শর্বাণী' (১৮৯০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (১৭৮৮-১৮৫১)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী পণ্ডিত (১৮১৩-২১)। সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক (১৮২৫-২৭); ব্যাকরণের অধ্যাপক (১৮৪ -৫১)। 'পদার্থ কৌমুদী' (১৮২১), 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' (১৮২২), 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২৩) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-১৮৭৩)

কবি ও সাংবাদিক। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮২১-২৭)। অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অফ দি পীস। *Hindu Intelligencer*-এর সম্পাদক (১৮৪৬-৫৭)। প্রধান কাব্যগ্রন্থ *Shair and other poems* (১৮৩০)।

কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩)

গল্পলেখক ও সাংবাদিক। *Indian Field* পত্রিকার সম্পাদক (১৮৫৯-৬৫)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (রাজশাহী) এবং পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট (কলিকাতা)। Hindu Theophilanthropic Society (১৮৪৩) ও সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভার প্রতিষ্ঠাতা।

দ্র. মন্মথনাথ ঘোষ, কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, কলিকাতা, ১৩৩১।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)

ধর্মপ্রচারক ও লেখক। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যুগ্ম-সম্পাদক (১৮৫৯)। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৬)। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির স্থাপন (১৮৬৯)। বিলাত প্রবাস. (১৮৭০)। ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৭০)। *Indian Mirror* (১৮৬১) ও 'সুলভ সমাচার' (১৮৭০) পত্রিকা পরিচালনা

দ্র. গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র. তিনখণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৮।

কোলব্রুক

Colebrooke, Henry Thomas (১৭৬৫-১৮৩৭)। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্। সরকারী কর্মচারী ; রাইটার (১৭৮২), ম্যাজিস্ট্রেট, কলেক্টর বোর্ড অফ রেভিনিউর সদস্য। এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৮০৬-১৫)। *A Digest of Hindu law* (১৭৯৮), *Miscellaneous Essays* (১৮৩৭) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. T. E. Colebrooke, *The Life and miscellaneous essays of Henry Thomas Colebrooke*, Three vols., London, 1873.

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭)

কবি ও প্রবন্ধকার। 'সদ্ভাবশতক' (১৮৬১), 'মোহভোগ' (১৮৬১), 'কৈবল্যতত্ত্ব' (১৮৮৩) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। 'মনোরঞ্জিকা' (মাসিক, ১৮৬০), 'কবিতাকুসুমাবলী' (মাসিক, ১৮৬০), 'ঢাকা প্রকাশ' (সাপ্তাহিক, ১৮৬১), 'বিজ্ঞাপনী' (সাপ্তাহিক, ১৮৬৫) পত্রিকার সম্পাদক।

কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-১৮৮৪)

সাংবাদিক, বাগ্মী, রাজনৈতিক নেতা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক (১৮৫৮), সম্পাদক (১৮৭৯)। জাস্টিস অফ দি পীস; মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (১৮৬৩); বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (১৮৭২); গভর্ণর জেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (১৮৮৩)। *Hindoo Patriot* পত্রিকার সম্পাদক (১৮৬১-৮৪)। দ্র. Ram Chandra Palit, *ed.*, *Speeches and minutes of the Honb'le Kristo Das Pal, Rai Bahadur, C.I.E., 1867-81,* Calcutta, 1882.

কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের সংস্কৃত পণ্ডিত। 'মহানির্বানতন্ত্রম্. পূর্বকাণ্ডম্' (১৮৭৬) গ্রন্থটি আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কালীকিঙ্কর বিদ্যারত্নের সঙ্গে অনুবাদ করেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫)

গদ্যলেখক, সাংবাদিক, ধর্মপ্রচারক। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮২৪-৩০)। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ (১৮৩২)। স্কুলে শিক্ষকতা (১৮৩০-৩৬)। কলিকাতা ক্রাইস্ট চার্চের প্যাস্টর (১৮৩৯-৫২)। বিশপ্স কলেজে অধ্যাপনা (১৮৫২-৬৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৫৮), এল্. এল্. ডি. (১৮৭৬)। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি (১৮৭৮)। *The Enquirer* (১৮৩১-৩৫), *Hindu Youth* (১৮৩১), 'সংবাদ সুধাংশু' (১৮৫০) প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা। বাংলা প্রধান রচনা— 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬-৫১), 'ষড়দর্শন সংবাদ' (১৮৬৭)।

ক্যাম্বেল

Campbell, Sir George (১৮২৪-১৮৯২)। আই. সি. এস.। ভারতবর্ষে আসেন ১৮৪২। বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্ণর (মার্চ ১৮৭১— এপ্রিল ১৮৭৪)। *India as it may be* (১৮৫৩), *The Capital*

of India (১৮৬৫), *The Afghan frontier* (১৮৭৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. C. E. Buckland, *Bengal under the lieutenant governors* : vol. I, Calcutta, 1901, p. 482-571.

ক্যাম্বেল চিকিৎসা বিত্তালয়

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল স্কুল। এল. এম. এস. পরীক্ষার জন্ত ছাত্ররা এখানে পাঠ গ্রহণ করতো। বর্তমানে ক্যাম্বেল হাসপাতাল ও স্কুল (পরে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত) নীলরতন সরকার হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ নামে পরিচিত।

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গদ্যলেখক। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য। অলিভার গোল্ডস্মিথের গ্রন্থাবলম্বনে 'গ্রীকদেশের ইতিহাস' (১৮৩৩) ও 'রোমদেশের ইতিহাস' রচনা করেন। অন্ত গ্রন্থ—'কীরাতার্জুনীয়' (১৮৬৫/৬৬)।

খেলাৎচন্দ্র ঘোষ

পাথুরিয়াঘাটার বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী। সনাতনী ধর্মরক্ষিণী সভার উৎসাহী সভ্য। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অফ দি পীস।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ (–১৮৪৪)

সংস্কৃত পণ্ডিত। কুমারহট্ট নিবাসী। সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক (১৮২৫-৪৪)। মুগ্ধবোধ-টীকা 'সেতুসংগ্রহ' (রচনা ১৮৩৫) ও 'খোসগল্পসার' (১৮৩৯) রচয়িতা।

গণি মিঞা, নবাব (১৮৩০-১৯০৩)

আবদুল গণি। ঢাকার জমিদার। সি. এস. আই. (১৮৭১); কে. সি. এস. আই. (১৮৮৬)। 'নবাব' উপাধি লাভ (১৮৭৫)। বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্ত বিখ্যাত।

গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮২২-১৯০৩)

সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৮৪৫-৫১); সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক (১৮৫১-৮২)। 'রঘুবংশ' (১৮৫২), 'শব্দসার' (১৮৬১), 'কাদম্বরীকথা' (১৮৮৩, ১৮৮৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা নর্মাল স্কুলের হেডমাস্টার। 'গোলকের উপযোগিতা' (১৮৬২), 'শিক্ষা প্রণালী' (১৮৬৪) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

গোল্ডস্টুকর

Goldstücker, Theodore (১৮২১-১৮৭২)। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে পণ্ডিত। লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজের সংস্কৃতের প্রোফেসর (১৮৫০-৭২)। *Panini, his place in Sanskrit literature* (১৮৬১), *Literary remains of the late Prof. Th. Goldstücker* (দুইখণ্ড, ১৮৭৯) রচয়িতা।

গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন

সংস্কৃত পণ্ডিত। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীরাম শিরোমণির ছাত্র।

গ্রান্ট

Grant, Sir John Peter (১৮০৭-১৮৯৩)। আই. সি. এস.। ভারতবর্ষে আসেন ১৮২৮। বাংলার লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর (১৮৫৯-৬২)। নীলবিদ্রোহের সময়ে প্রজার বন্ধু।

দ্র. C. E. Buckland, *Bengal under the lieutenant governors*; vol. I, Calcutta, 1901, p. 163-237.

চন্দ্রকুমার দে (১৮৩০-১৮৮৬)

প্রখ্যাত চিকিৎসক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. ডি. (১৮৬২)। জার্মান ও ফরাসী ভাষা থেকে ইংরাজীতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের গ্রন্থাদির অনুবাদক।

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮২১-১৮৯২)

হাইকোর্টে গভর্নমেণ্ট প্লিডার। বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য। রায়বাহাদুর। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী প্রিন্স্‌ অফ ওয়েল্‌সকে (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ভবানীপুরে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করেন এবং পরিবারস্থ মহিলারা যুবরাজকে অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ঘটনাটি সে সময়ে বাঙালী সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। *Hindoo Patriot* পত্রিকায় এ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়—'We congratulate both H. R. H. the Prince of Wales and the Hon'ble Babu Jaggadanand Mookerjea on the felicitous event of Monday last, which concluded the royal visit to Calcutta—H. R. H. because he saw a sight which does not ordinarily fall to the lot of a European in India, and Babu Jaggadanand because a great honor was done to him by the future Emperor of India. At the same time we cannot conceal that the national feeling has been outraged at the price as it is said which Babu Jaggadanand has paid for this honor. ·· We have said that the visit to Babu Jaggadanand's was a private affair, and no jealous eye should pry into it; we would not ourselves have noticed it at all, but for the manner in which the leading English paper of Calcutta has noticed it. It says that "about one hundred and fifty ladies of some of the highest families in Calcutta were assembled." This is not the fact... we have it on the highest authority that with the exception of some of the immediate relations of the Babu in Calcutta, one or two pleaders, a doctor, and the like of Bhowanipur, none of the "highest families of Calcutta" or Bhowanipur was represented on the occasion. Our contemporary is mistaken in thinking that there is any jealousy in the

matter; the only feeling, which seems to exist, is that a gratuitous allusion should have been made to "some of the highest families in Calcutta." The Hindus of the higher classes have not yet lost their chivalrous respect for the honor of their families which they associate with their exclusiveness, and naturally feel offended at the insinuation of their having sacrificed that honor for the gratification of any individual personal vanity. That insinuation or implication apart they have no reason to be scandalised or offended.' (January 10, 1876, p. 20).

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার (১৮২৯-১৯০০)

সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৮৫৫-৭৭)। ভাবপ্রকাশ যন্ত্রালয় ও পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। 'পরিদর্শক' (১৮৬১) দৈনিক পত্রের পরিচালক। বিষ্ণুপুরাণ, কল্কিপুরাণ, পরাশর সংহিতা-র অনুবাদক।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮৮)

উত্তরপাড়ার জমিদার। ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েসনের (সোসাইটির) সদস্য ও পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য (১৮৫১) ও সহ-সভাপতি (১৮৮১-৮২)। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি (১৮৮৬)। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ও (১৮৫৯) ও উত্তরপাড়া কলেজের (১৮৮৭) প্রতিষ্ঠাতা।

দ্র. Nilmoni Mukherjee, *A Bengal Zemindar: Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and his times, 1808-1888*, Calcutta, 1975.

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (১৮০৬-১৮৭২)

সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজে ন্যায়দর্শনের অধ্যাপক (১৮৪০-৬৯)। 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' (১৮৬১), 'পদার্থতত্ত্বসার' (১৮৬৭) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

'আত্মতত্ত্ববিবেকঃ' (১৮৪৯), 'বৈশেষিক দর্শন' (১৮৬১), 'শঙ্করবিজয়ঃ' (১৮৬৮) প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক।

জোন্স্

Jones, Sir William (১৭৪৬-১৭৯৪)। ভারতবিদ্যাবিদ্। ব্যারিস্টার; সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি (১৭৮৩-৯৪)। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা (১৭৮৪)। *Sakuntala* (১৭৮৯), *Hitopadesa* (১৭৯১) প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক। জোন্সের রচনা সংকলন—*The Works of Sir William Jones, with the life of the author,* by Lord Teignmouth (১৩ খণ্ড, ১৮০৭)।

দ্র. A. J. Arberry, *Asiatic Jones*, London, 1946.

টেম্প্‌ল্, রিচার্ড

Temple, Sir Richard (১৮২৬-১৯০২)। বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্নর (এপ্রিল ১৮৭৪—জানুয়ারী ১৮৭৭)। *India in 1880* (১৮৮২), *Oriental experiences* (১৮৮৩), *Cosmopolitan essays* (১৮৮৬), *The Story of my life* (১৮৯৬) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. C. E. Buckland, *Bengal under the lieutenant governors*; vol. II, Calcutta, 1901, p. 573-687.

ডবটন কলেজ

John Doveton (১৮০০?-১৮৫৩)-এর নামানুসারে কলিকাতার পেরেন্টাল অ্যাকেডেমি (১৮২৩-৫৫) পরবর্তীকালে (১৮৫৫) ডবটন কলেজ নামে পরিচিত হয়। ডবটন ইউরেশীয় ছিলেন, তিনি ইউরেশীয়দের শিক্ষা বিস্তারের জন্য মৃত্যুকালে পেরেন্টাল অ্যাকেডেমিকে দু লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডবটন কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে।

তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, তর্করত্ন (—১৮৫৮)

সংস্কৃত পণ্ডিত। গদ্যলেখক। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৮৫১-৫৫);

নদীয়ার সাব ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস (১৮৫৫-৫৮)। 'পদ্যাবলী' (১৮৫২), 'কাদম্বরী' (১৮৫৪), 'রাসেলাস' (১৮৫৭) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দিগম্বর মিত্র (১৮১৭-১৮৭৯)

ভূম্যধিকারী, বাগ্মী, রাজনৈতিক নেতা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক (১৮৫১), সহ-সভাপতি (১৮৬৯), সভাপতি (১৮৭২)। বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (১৮৬৪, ১৮৮০, ১৮৭২)। সি. এস. আই. (১৮৭৬), 'রাজা' (১৮৭৭) উপাধিলাভ।

দ্র. Bholanauth Chunder, *Raja Digambar Mitra, C. S. I : his life and career*, Calcutta,' 1893.

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

নাট্যকার, কবি। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮৫০-৫৫)। ডাকবিভাগে কর্ম (১৮৫৫-৭৩)। 'রায় বাহাদুর' (১৮৭১)। 'নীলদর্পণং নাটকং' ('৮৬০), 'নবীন তপস্বিনী নাটক' (১৮৬৩), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রভৃতি নাটক ও 'সুরধুনী কাব্য' (১৮৭১-৭৬), 'দ্বাদশ কবিতা' (১৮৭২) প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৯-১৮৭০)

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। হিন্দু কলেজ ও মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ।

দুর্গাচরণ লাহা (১৮২২-১৯০৪)

ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার। প্রাণকৃষ্ণ লাহা অ্যাণ্ড কোম্পানীর অংশীদার ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের (পরে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৩)। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি (১৮৮৫, ১৮৮৬, ১৮৯৫)। সি. আই. ই. (১৮৮৪), 'রাজা' (১৮৮৭), 'মহারাজা' (১৮৯১) উপাধিলাভ। তাঁর অসংখ্য দানের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান উল্লেখযোগ্য।

দ্র. Kumud Lall Dey, *The Law family of Calcutta*' Calcutta, 1932.

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

মহর্ষি। তত্ত্ববোধিনী সভার (১৮৩৯) প্রতিষ্ঠাতা। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ (১৮৪৩)। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ (১৮৪৩)। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক (১৮৫১-৫৪)। 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান', 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি', 'স্বরচিত জীবনচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)

ভূম্যধিকারী, ব্যবসায়ী, বহু জনহিতকর কর্মে উদ্যোগী। ব্যবহারজীবী। চব্বিশপরগণা নিমক মহালের কলেক্টরের দেওয়ান বা সেরেস্তাদার (১৮২৩-৩৪); কার ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৪); ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর (১৮৩১)। *Bengal Hurkaru* পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। বিলাত প্রবাস (প্রথমবার ১৮৪২, দ্বিতীয়বার ১৮৪৬)। প্রিন্স্ নামে অভিহিত।

দ্র. Kissory Chand Mittra, *Memoir of Dwarkanath Tagore*, Calcutta, 1870.

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬)

সংস্কৃত পণ্ডিত, গদ্যলেখক, সাংবাদিক। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র (১৮৩২-৪৫)। সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক (১৮৪৪-৫৫), সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক (১৮৫৫-৭৩)। 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) ও 'কল্পদ্রুম' (১৮৭৮) পত্রিকার সম্পাদক। 'নীতিসার' (১৮৫৬), 'রোমরাজ্যের ইতিহাস' (১৮৫৭), 'গ্রীসদেশের ইতিহাস' (১৮৫৭) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৩-১৮৭৪)

আইনজীবী। পজিটিভিস্ট দর্শনের প্রবক্তা। হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ (১৮৩৬-৫৪)। ওকালতি (১৮৫৬-৬৭), কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৮৬৭-৭৪)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। কোম্‌তের রচনার ইংরাজী অনুবাদ ও পজিটিভিজ্‌ম বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা।

দ্র. Dinabandhu Sanyal, *Life of the Hon'ble Justice Dwarkanath Mitter*, Calcutta, 1883.[4] কালীপ্রসন্ন দত্ত, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী, কলিকাতা, ১৮৯২।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)

কবি, দার্শনিক। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক (১৮৬৪-৭১)। 'ভারতী' (১৮৭৭-৮৩) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র (১৮৮৪-১৯০৯) সম্পাদক। 'তত্ত্ববিদ্যা' (১৮৬৬-৬৯), 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫), 'নানাচিন্তা' (১৯২০), 'প্রবন্ধমালা' (১৯২০), 'কাব্যমালা' (১৯২০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২)

কবি। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' (প্রথমখণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭), 'আর্যসঙ্গীত' (১৮৮০, ১৯০২), 'সিন্ধুদূত' (১৮৮৩) প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

কবি। চট্টগ্রাম স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর (১৮৬৮-১৯০৪)। 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১, ১৮৭৮), 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) প্রভৃতি কাব্য এবং 'আমার জীবন' (১৯০৮-১৩) গ্রন্থ রচয়িতা।

নর্থব্রুক, লর্ড

Northbrook, Thomas George Baring, First Earl of (১৮২৬-১৯০৪)। ভারতবর্ষের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল (মে ১৮৭২-এপ্রিল ১৮৭৬)। তাঁর শাসনকালে প্রধান ঘটন—বরোদার গায়কোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি; প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতবর্ষে আগমন; ইনকাম ট্যাক্সের অবলোপ।

নর্ম্যান

Norman, John Paxton (১৮১৯-১৮৭১)। কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি (১৮৬২-৭১)। আবদুল্লা নামে এক আততায়ী কর্তৃক

টাউন হলের সিঁড়িতে ছুরিকাহত, এবং সেই আঘাতের ফলে পরদিন মৃত্যু (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭১)।

নীলমণি বসাক (১৮০৮-১৮৬৪)

গদ্য ও পদ্য লেখক। বর্ধমানের কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। 'আরব্য উপন্যাস' (১৮৪৯-৫০), 'পারস্য উপন্যাস', (১৮৩৪), 'নবনারী' (১৮৫২), 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮৫৪), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৫৭-৫৮) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

নীলরত্ন হালদার (– ১৮৫৫)

সঙ্গীত রচয়িতা, কবি, সাংবাদিক। 'বঙ্গদূত' পত্রিকার সম্পাদক (১৮২৯)। 'কবিতা রত্নহার' (১৮১৫), 'বহুদর্শন (১৮২৬), 'সর্বামোদতরঙ্গিণী' (১৮৫১), 'পার্বতী গীতরত্নং' (১৮৫৮) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৪)

গ্রন্থকার। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। বিদ্যারত্ন। এম. এ. (১৮৬৭), বি. এল. (১৮৬৯)। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক (১৮৭৬)। প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক; বঙ্গবাসী কলেজে আইনের অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৯৫, ১৯০৫)। 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকার সম্পাদক (১৩০৭-১০, ১৩১২-১৪)। 'জ্যামিতি', 'জমিদারি-মহাজনী ও বাজার হিসাব' (১৮৭৩), 'রত্নাবলী নাটিকা' (১৮৭৪), 'অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন', বসুধারা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, পৃ. ৩৮১-৮৫।

পাণিনি

সংস্কৃত বৈয়াকরণ। 'অষ্টাধ্যায়ী' রচয়িতা। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী বা তার অল্প কিছু পরে তক্ষশিলার নিকট শালাতুর গ্রামে জন্ম।

পিকক্

Peacock, Sir Barnes (১৮১০-১৮৯০)। কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের

(১৮৫৯-৬২) এবং হাইকোর্টের (১৮৬২-৭০) চিফ জাস্টিস। অবসর গ্রহণের পর জুডিসিয়াল কমিটি অফ দি প্রিভি কাউন্সিলের মেম্বার (১৮৭২)।

পীল

Peel, Sir Lawrence (১৭৯৯-১৮৮৪)। কলিকাতায় অ্যাডভোকেট জেনারেল (১৮৪০-৪২), চিফ জাস্টিস (১৮৪২)। অবসর গ্রহণ ১৮৫৫। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর (১৮৫৭)।

প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫)

শিক্ষাব্রতী, সমাজসংস্কারক। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮৩৮-৪৩)। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের শিক্ষক (১৮৪৩-৪৫); বারাসত গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৪৫-৫৪); কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৫৪-৬৭); প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৮৬৩-৭৫)। বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি স্থাপন (১৮৬৩)। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক (১৮৬৬-৬৮)।

দ্র· নবকৃষ্ণ ঘোষ, প্যারীচরণ সরকার, কলিকাতা, ১৩০৯।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

লেখক, বাগ্মী। হিন্দু কলেজের ছাত্র। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর সাব-লাইব্রেরিয়ান (১৮৩৬-৪৮); লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারী (১৮৪৮-৬৬)। কালাচাঁদ শেঠ অ্যাণ্ড কোম্পানীর অংশীদার, প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যাণ্ড সন্স প্রতিষ্ঠা (১৮৫৫)। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার (১৮৬৮-৭০)। 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) সম্পাদনা। বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য রচনা। 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'অভেদী' (১৮৭১), *A Biographical sketch of David Hare* (১৮৭৭), *Life of Dewan Ramcomul Sen* (১৮৮০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১)

ঔপন্যাসিক, পুরাতত্ত্ববিদ্। হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র (১৮৫২-৬৫)। বি. এ. (১৮৬৫)। এসিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান। রেজিস্ট্রার অফ জয়েণ্ট স্টক কোম্পানিজ

(১৮৭৫-১৯০০)। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১৮৬৯, ১৮৮৪), *Durga Puja and its origin* (১৮৭১), *Substances used for food, drink and smoking by the natives of Bengal* (১৮৭৪) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

প্রতাপচন্দ্র সিংহ (১৮২৭-১৮৬৬)

পাইকপাড়ার রাজা। 'রাজাবাহাদুর'(১৮৫৪), সি. এস. আই. উপাধিলাভ। বেলগাছিয়া ভিলায় নাট্যমঞ্চ নির্মাণ ও নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮)

জমিদার। সরকারী উকীল। মেও হসপিটাল ও হিন্দু কলেজের অন্যতম গভর্ণর। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি (১৮৬৭)। *Reformer* পত্রিকার সম্পাদক (১৮৩১)। হিন্দু থিয়েটার স্থাপন (১৮৩১)। সি. এস. আই. (১৮৬৬)।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ (১৮০৫-১৮৬৭)

সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজে অলংকারের অধ্যাপক (১৮৩২-৬৩)। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনায় অসামান্য দক্ষ। 'নৈষধচরিতং' (১৮৩৬), 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' (১৮৩৯), 'উত্তররামচরিতম্' (১৮৬২), 'কাব্যাদর্শ' (১৮৬২-৬৩) প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা রচয়িতা।

দ্র. রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী, কলিকাতা, ১৮৯২।

ফকীরচন্দ্র বসু

গ্রন্থকার। চিকিৎসক। মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ, এল. এম. এস. (১৮৯৯)। 'শিবজীর অভিনয়'(১৮৭০), 'উজীরপুত্র'(১৮৭২-৭৬), 'অন্ধের চক্ষুর্দান, (১৮৭৯), 'নীতিরত্নমালা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। 'সমাজরঞ্জন' (১৮৭৭) সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক।

ফ্রাঙ্কলিন, বেঞ্জামিন

Franklin, Benjamin (১৭০৬-১৭৯০)। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক,

প্রবন্ধকার। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত গবেষণার জন্ত বিখ্যাত। *Experiments and observations on electricity* (১৭৫১-৫৩), *Journal of the negotiations for peace* (১৭৮২), *Autobiography* (১৮৬৮) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. J. Parton, *Life and times of Benjamin Franklin*; 2 vols., 1864.

বঙ্গদর্শন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৭২) প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন'-এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় চৈত্র ১২৮২ (মার্চ ১৮৭৬)। ১২৮৩ সালে 'বঙ্গদর্শন' বেরোয় নি। ১২৮৪ বৈশাখ থেকে ১২৮৯ চৈত্র পর্যন্ত (মধ্যে কিছুদিন পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ ছিল) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার। হুগলী কলেজের ছাত্র (১৮৪৯-৫৬); কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবর্তিত এনট্রান্স পরীক্ষা (১৮৫৭); বি. এ. (১৮৫৮) বি. এল. (১৮৬৯)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর (১৮৫৮-৯১)। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক (১৮৭২-৭৬)। রায়বাহাদুর (১৮৯২), সি. আই. ই. (১৮৯৪)। উপন্যাস : 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (৮৭৮), 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪), 'দেবীচৌধুরাণী(১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭) প্রভৃতি। প্রবন্ধ : 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৬), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮৭, ১৮৯২), 'ধর্মতত্ত্ব : প্রথমভাগ : অনুশীলন' (১৮৮৮)প্রভৃতি। কাব্য : 'ললিতা' (১৮৫৬) 'কবিতাপুস্তক' (১৮৭৮)।

বমউইচ্

Bomwetsch, Rev. Christian জার্মান লুথেরীয় চার্চের ধর্মপ্রচারক।

কলিকাতার ক্রাইস্ট চার্চের প্যাস্টর (১৮৬২-৬৭ ; ১৮৭০-৭৬)। সমগ্র নিউ টেস্টামেন্ট বাংলায় নিজে অনুবাদ করেন। বাঙালী মহিলাকে বিবাহ। ধর্মতত্ত্ব-সংক্রান্ত মতবিরোধের ফলে চার্চ থেকে পদত্যাগ।

বান্ধব

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। 'বান্ধব' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালের আষাঢ় মাসে (জুন ১৮৭৪)। পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন আনন্দচন্দ্র রায়। প্রথম পর্যায়ে 'বান্ধব'-এর দশটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৮১-৮৩, ১২৮৫, ১২৮৭-৮৯, ১২৯১-৯৫। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয় : ১৩০৮-১৩।

বিনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন

দরিদ্র, প্রধানত অনাথ খ্রীষ্টান শিশুদের আশ্রয় ও শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় Benevolent Institution স্থাপিত হয়। কলিকাতার বাহিরে ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরেও এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয়দের দানে এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন জনসেবার কাজে নিয়োজিত থাকে।

বিশ্বনাথ কবিরাজ

কবি ও আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ চতুর্দশ শতাব্দীতে 'সাহিত্য দর্পণ' রচনা করেন। সংস্কৃত কাব্য ও নাট্যতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থটি বিখ্যাত। বিশ্বনাথের অন্যান্য রচনা—'রাঘব বিলাস', 'প্রভাবতী পরিণয়', 'চন্দ্রকলা' প্রভৃতি।

বিশ্বম্ভর মল্লিক

গৌরচরণ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; নিমাইচরণ মল্লিকের ভ্রাতুষ্পুত্র। "ইনি নিঃসন্তান, অত্যন্ত ধর্মিষ্ঠ, দাতা এবং অতিশয় উদার ছিলেন। ইনি দরিদ্রের দুঃখ দূরীকরণে মুক্তহস্তে দান করিতেন ; এজন্য লোকে তাঁহাকে 'দাতা বিশ্বম্ভর' বলিয়া জানিত। এরূপ দানশীলতার জন্য পিতা গৌরচরণ শঙ্কিত হইয়া, মৃত্যুকালে অন্যান্য পুত্রদের বলিয়াছিলেন যে 'বিশ্বম্ভর বিষয় রাখিতে

পারিবে না, যখন খরচের প্রয়োজন হইবে, তোমরা উহাকে প্রয়োজন মত টাকা দিও।' ইহাতেই ইনি পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া পৈত্রিক বিষয়ের নিজের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করেন নাই। কথিত আছে, পিতার প্রোবেট লইবার সময় হাকিম যখন পৈত্রিক বিষয়ের স্বত্ব ছাড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন ইনি 'হরিনামের ঝুলি' দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, ইহাই আমার পিতৃদত্ত সম্পত্তি, পিতার ইচ্ছামতেই তাঁহার অন্য সম্পত্তি গ্রহণ করিব না।" (রাসবিহারী মল্লিক, বংশ গৌরব, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ২৭)।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)

কবি। 'পূর্ণিমা' (১৮৫৯), 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৮) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক। 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২), 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গসন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেমপ্রবাহিণী' (১৮৭০), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা।

দ্র. অলোক রায় সম্পাদিত, সারদামঙ্গল সাধের আসন, কলিকাতা, ১৯৭৬।

বেকন

Bacon, Francis (১৫৬১-১৬২৬)। দার্শনিক, প্রবন্ধকার, রাজনীতিবিদ্। ব্যারিস্টার (১৫৭৬), সলিসিটর জেনারেল; অ্যাটর্নি জেনারেল; এম. পি.; লর্ড চ্যান্সেলর (১৬১৮)। *Essays* (১৫৯৭), *Advancement of learning* (১৬০৫), *History of Henry the seventh* (১৬২২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

বোপদেব

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাদেব দেবগিরির রাজসভায় বোপদেব ছিলেন সভাকবি। তিনি 'মুগ্ধবোধ' রচয়িতা হিসাবে খ্যাতিমান। তাঁর অন্য রচনা 'কবিকল্পদ্রুম'।

ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন

রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপণ্ডিত। প্রথমে বিধবা-বিবাহের সমর্থন

করলেও পরে তিনি 'সাগরতরঙ্গ' নামে পুস্তক রচনা করে বিধবা-বিবাহ ও বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেন।

ভিক্টোরিয়া

Victoria (১৮১৯-১৯০১)। খুল্লতাত চতুর্থ উইলিয়ামের মৃত্যুর পর গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের রাণী (১৮৩৭) ; পরে ভারত সম্রাজ্ঞী (১৮৭৬)।

ভোলানাথ চক্রবর্তী (—১৮৮৪)

মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডপণ্ডিত। রাজনারায়ণ বসুর বন্ধু, ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী কর্মী। 'সাবিত্রীচরিত কাব্য' (১৮৬৮), 'সেই একদিন আর এই একদিন অর্থাৎ বঙ্গের পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা' (১৮৭৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)

গদ্যলেখক। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮৩৯-৪৫)। শিক্ষক, কলিকাতা মাদ্রাসা (১৮৪৮-৪৯) ; প্রধান শিক্ষক, হাওড়া স্কুল (১৮৪৯-৫৬), হুগলী নর্মাল স্কুল (১৮৫৬-৬২) ; ইনসপেকটর অফ স্কুলস (১৮৬২-৮৩)। 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রিকার সম্পাদক (১৮৬৮-৯৪)। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭), 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৫), 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪)

ব্যবসায়ী। চৈতন্যচরণ শীলের পুত্র। মিঃ স্মিথসনের বেনিয়ান (১৮২০-৩৪) ; আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা (১৮৩৪-৪৭)। বেলঘরিয়ায় অতিথিশালা ও ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ (১৮৪১) ; শীলস ফ্রী কলেজ স্থাপন (১৮.২)।

দ্র. নরেন্দ্রনাথ লাহা, সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪০, পৃ. ১-৬২।

মদনমোহন মিত্র

কবি ও নাট্যকার। 'কবিতাকলাপ' (৫ম সংস্করণ, ১৮৮০), 'মনোরমা নাটক' (১৮৭২), 'বৃহন্নলা নাটক' (১৮৭৪), 'জীবনময়' (১৮৮৬) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

কবি ও নাট্যকার। হিন্দু কলেজ (১৮৩৩-৪২) ও বিশপ্‌স কলেজের (১৮৪৪-৪৭) ছাত্র। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩। মাদ্রাজ প্রবাস (১৮৪৮-৫৬)। পুলিস কোর্টের ইন্টারপ্রিটার। বিলাত প্রবাস (১৮৬২-৬৭); গ্রেজ ইন্‌ থেকে ব্যারিস্টার (১৮৬৬)। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৯), 'পদ্মাবতী নাটক' (১৮৬০), 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬২), 'বীরাঙ্গনা কাব্য'(১৮৬২), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)

নাট্যকার, কবি। জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। 'সংবাদ বিভাকর' (১৮৫২) ও 'মধ্যস্থ' (১৮৭২) পত্রিকার সম্পাদক। হিন্দু মেলার (১৮৬৭) অন্যতম উদ্যোক্তা। 'রামাভিষেক নাটক, (১৮৬৭), 'সতী নাটক' (১৮৭৩), 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১৮৭৫), 'পার্থপরাজয় নাটক' (১৮৮১) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

মিলটন

Milton, John (১৬০৮–১৬৭৪)। কবি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ (১৬২৫-৩২)। বিতর্কমূলক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ পুস্তিকা রচনা (১৬৪১-৬০)। ক্রমওয়েলের সমর্থক। অন্ধ অবস্থায় *Paradise lost* (১৮৬৭), *Paradise regained* (১৬৭১) ও *Samson Agonistes* (১৬৭১) রচনা।

দ্র. D. Masson, *Life of Milton*, 1859-80.

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ (– ১৮৬০)

সংস্কৃত পণ্ডিত। হিন্দু কলেজ-পাঠশালা (১৮৪০), হিন্দু কলেজ (১৮৪১-৪৩) ও কলিকাতা মাদ্রাসার (১৮৪৩-৬০) শিক্ষক। রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ—'অপূর্বোপাখ্যান' (১৮৫২), 'অমরার্থ দীধিতি' (১৮৫৬), 'আরব্য উপন্যাস' (পাঁচ খণ্ড, ১৮৫৪-৫৮), 'শব্দাম্বুধি' (১৮৫৪) প্রভৃতি।

মেও, লর্ড

Mayo, Richard Southwell Bourke, Sixth Earl of (১৮২২-১৮৭২)। ভারতবর্ষের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল (১৮৬৯-৭২)। পোর্ট ব্লেয়ারে নিহত ৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭২। তাঁর শাসনকালে প্রধান ঘটনা — ডিউক অফ এডিনবরার ভারত পর্যটন (১৮৬৯-৭০), লুশাই অভিযান (১৮৭১-৭২)।

দ্র. W.W. Hunter, *Life of Lord Mayo*, 1875.

মেও হসপিটলে

৬৭/১ স্ট্র্যাণ্ড রোড (নর্থ), কলিকাতায় ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মেও হসপিটালের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। ১২০টি শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল ভারতীয়দের চিকিৎসার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত হয়।

ভট্ট মোক্ষমূলর

Müller, Friedrich Max (১৮২৩-১৯০০)। ভারতবিদ্যাবিদ্। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পারেটিভ ফিললজির অধ্যাপক (১৮৬৮)। সায়নাচার্যের টীকা-সহ ঋগ্‌বেদ প্রকাশ (১৮৪৯-৭৩)। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্ম-পুরাতত্ত্বের আলোচনা। *Sacred books of the east* (১৮ ৫) গ্রন্থমালার সম্পাদক ও *Chips from a German workshop* (১৮৬৭-৭৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. *The life and letters of the Right Honourable Friedrich Max Muller*, edited by his wife, London, 2 vols., 1902.

যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৮৯৪)

চিকিৎসক, লেখক। কৃষ্ণনগর কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র ; এল. এম. এস. (১৮৬৬)। 'ধাত্রীশিক্ষা' (১৮৬৭), 'উদ্ভিদবিচার' (১৮৭৭), 'শরীর পালন' (১৮৮১), 'পল্লিগ্রাম' (১৮৯২), 'বাঙ্গালী মেয়ের নীতিশিক্ষা' (১৮৮৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'আর্য সমাজ সম্পত্তি উপক্রমণিকা' (১৮৭৭) গ্রন্থ রচয়িতা।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)

কবি। হুগলী কলেজের ছাত্র। ইনকামট্যাক্স অ্যাসেসর ও ডেপুটি কলেক্টর (১৮৬০), ডেপুটি কলেক্টর (১৮৬১), ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর (১৮৬৪-৮২)। 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২), 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮), 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৮০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. মন্মথনাথ ঘোষ, রঙ্গলাল, কলিকাতা, ১৩৩৬।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার। আই. সি. এস. (১৮৬৯)। অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর পদে কর্মজীবনের সূত্রপাত (১৮৭১), কমিশনর পদে অবসর গ্রহণ (১৮৯৫)। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি (১৮৯৯)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি (১৮৯৪)। বাংলা ও ইংরাজী উভয়-ভাষাতেই সাহিত্য রচনা। 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবী কঙ্কণ' (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯), 'ঋগ্বেদ সংহিতা' (১৮৮৫-৮৭) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. J. N. Gupta, *Life and work of Romesh Chunder Dutt, C. I. E.*, London, 1911.

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮)

বাগ্মী, লেখক। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮২১?-৩০)। ডিরোজিও-শিষ্য, ইয়ং বেঙ্গল-দলের অন্যতম নেতা। হেয়ারের পটলডাঙা স্কুলের শিক্ষক। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক (সেপ্টেম্বর ১৮৩৫—জুলাই ১৮৩৭)। ডেপুটি কলেক্টর (১৮৩৭-৫৭)।

দ্র. সত্যনিষ্ঠ রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও বলাইচাঁদ মল্লিক তত্ত্ববিশারদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কলিকাতা, কানাইলাল পাল প্রকাশিত [তারিখ নেই]।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গদ্য লেখক। প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার অ্যাসিসট্যাণ্ট প্রোফেসর (১৮৬৬-৭৩), সংস্কৃতের প্রোফেসর (১৮৭৩-৮৫)। ফরাসী কবি ফেনেলঁ

রচিত কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে 'টেলিমেকস' (১৮৫৮, ১৮৬০) রচনা করেন। এছাড়া 'শিশুশিক্ষা', 'নীতিবোধ' (১৮৫১) প্রভৃতি পুস্তক রচয়িতা।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৮)

কবি, সাহিত্যিক, পুরাতত্ত্ববিদ্। এম. এ. (১৮৬৭), বি. এল. (১৮৬৮)। অধ্যাপক, জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (১৮৫৭), কটক ল' কলেজ (১৮৬৯), বহরমপুর কলেজ (১৮৭১), পাটনা কলেজ (১৮৭১-৭২), প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮৭৮-৭৯)। গভর্ণমেন্টের অনুবাদক (১৮৭৯-৮৬)। 'যৌবনোদ্যান' (১৮৬৮), 'মিত্রবিলাপ' (১৮৬৯), 'কাব্যকলাপ' (১৮৭০), 'রাজবালা' (১৮৭০), 'কবিতামালা' (১৮৭৭), 'নানাপ্রবন্ধ' (১৮৮৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. মন্মথনাথ ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩৪০।

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)

কবি, নাট্যকার। ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। বীণা প্রেস (১৮৮১), বীণা থিয়েটার (১৮৮৭), 'বীণা' মাসিক পত্রিকা (১৮৭৮) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা। 'বঙ্গভূষণ' (১৮৭৪), 'অবসর-সরোজিনী' (১৮৭৬, ১৮৭৯), 'রামায়ণ' (১৮৭৭-৮৫), 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮), 'রামের বনবাস' (১৮৮২), 'মীরাবাই' (১৮৮৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)

গদ্যলেখক, শিক্ষাব্রতী। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮৪০-৪৫)। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ (১৮৪৬)। সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী বিভাগে শিক্ষক (১৮৪৯-৫১); মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৫১-৬৮)। আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম অধ্যক্ষ / সভাপতি (১৮৭১-৯৯)। 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' (১৮৫৫, ১৮৭০), 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' (১৮৬৬-৬৭), 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা (১৮৭৩), 'সে কাল আর এ কাল' (১৮৭৪), 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত' (১৯০৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্র. অম্র কোলে, রাজনারায়ণ বসু জীবন ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৮১।

রাজনারায়ণ মিত্র (–১৮৫৬)

'কায়স্থ-কৌস্তুভ' (প্রথম সংখ্যা ১৭ জুলাই ১৮৪৪, দ্বিতীয় সংখ্যা ১১ মার্চ ১৮৪৫, তৃতীয় সংখ্যা ৫ মে ১৮৪৮) পত্রিকার সম্পাদক। 'কায়স্থ-কৌস্তুভ'-এর লক্ষ্য ছিল 'কায়স্থ উৎপত্তি বিবরণ, এবং তাহারদিগের ক্রিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বহু পণ্ডিত সম্মত মীমাংসা' প্রকাশ করা। কায়স্থের উৎপত্তি ও অনুরূপ প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য রাজনারায়ণ মিত্র পরে 'কৌস্তুভ-কিরণ' (অগাস্ট ১৮৪৯) নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)

ভারতবিদ্যাবিদ্। এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক (১৮৪৬-৫৬)। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর (১৮৫৬-৮১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৬৩); এল. এল. ডি. (১৮৭৬)। এসিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতি (১৮৬১), সভাপতি (১৮৮৫)। 'রাজা' উপাধিলাভ (১৮৮৮)। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১-৬০) ও 'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৬৩-৬৮) পত্রিকার সম্পাদক। *The Antiquties of Orissa* (১৮৭৫-১৮৮০), *Indo Aryans* (১৮৮১), *The Sanskrit Buddhist literature of Nepal* (১৮৮২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।
দ্র. অলোক রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কলিকাতা, ১৯৬৯।

রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭)

ভূম্যধিকারী, সমাজনেতা। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পোষ্যপুত্র। রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র। হিন্দু কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর (১৮১৮-৫০); হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের পরিচালনা-কমিটির সভাপতি (১৮৫৩); স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য (১৮১৭-৫২); ধর্ম সভার সভাপতি (১৮৩০); ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি (১৮৫১-৬৭)। 'নীতিকথা' (১৮১৮), 'শব্দকল্পদ্রুমঃ' (১৮১৯-৫৮), 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা বা সংকলক।

রাধামাধব মিত্র (১৮২৫-১৯২১)

কবি, নাট্যকার, সাংবাদিক। পিতা স্বরূপচন্দ্র মিত্র। জেনারেল অ্যাসেম্-

ব্রিজ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষালাভ। জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে আট-বছর (১৮৫৫-৬৪) ও পীল্‌স ফ্রি কলেজে বত্রিশ বছর (১৮২৪-৯৬) শিক্ষকতা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সহ-সম্পাদক; 'মাসিক প্রভাকর', 'সুধাকর' (নবপর্যায় ১২৭৭), 'সুজনরঞ্জন' (১৩০১) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক। 'কবিতাবলী' (৫২৩), 'বোধেন্দুদয়', 'স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ', 'বনিতা-মরণ খেদের কারণ', 'বসন্ত বিচ্ছেদ', 'বিধবামনোরঞ্জন নাটক', 'মনিবালা বা কলির সাবিত্রী নাটক', 'যুবরাজের অভ্যর্থনা' (১৮৭৫), 'শারদীয় মহোৎসব' (১৮৮৩), 'সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা' (১৮১২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

রামকমল ভট্টাচার্য, বিদ্যালঙ্কার

সংস্কৃত পণ্ডিত। শ্রীরামপুরের গুরু ট্রেনিং পাঠশালার পণ্ডিত। 'বিদগ্ধ-মুখমণ্ডন' (১৮৬০ ?), 'ধাতুবিবেক' (১৮৬১), 'প্রকৃতিবাদ অভিধান' (১৮৬৬) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪)

সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ (১৮৪৪-৫৫)। হুগলী নর্মাল স্কুলের শিক্ষক (১৮৫৬-৬২), বর্ধমান গুরু ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৬২), বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৮৬৫-৭৯), হুগলী নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৭৯-৯০)। 'রোমাবতী' (১৮৬২), 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২), 'চণ্ডী' (১৮৭২), 'কুপিতকৌশিক নাটক' (১৮৭৮), 'রামচরিত' (১৮৮৩), 'ইলছোবা' (১৮৮৮) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

রামগতি মুখোপাধ্যায়

নলহাটি ব্রাঞ্চ রেলওয়ে নির্মাণে রামগতি মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগের কথা সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় উল্লিখিত হতে দেখি। রামগতির প্রশংসা ক'রে *Times* পত্রিকার প্রতিনিধি মিঃ কটলেজ মন্তব্য করেন— 'Moorshedabad is connected with the main line from Calcutta to Bombay by a line of about 28 miles, terminating at a place called Nulhatti. The line was constructed on the simplest of plans, and belonged at first to the Oude and Rohilkund,

Railway Company, but never, I believe, met its own expenses and a resolution was come to, that it ought to be given up. An intelligent native servant of the company offered to take the line and pay the Company 5 percent. on the capital invested. The Directors thought that the better plan would be to give this gentleman a salary with full powers of management, and this was carried out. The railway is now the property of the Government, and pays at the rate of 12 percent. on the capital.' (*The Hindoo Patriot*, September 7, 1874).

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮)

বাগ্মী, জননেতা। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮২৮-৩২)। ডিরোজিও-শিষ্য ইয়ং বেঙ্গল-এর একজন নেতা। ব্যবসায়ী ; কেলসল, ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানীর অংশীদার, আর. জি. ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানী স্থাপন (১৮৪৮)। *Bengal Spectator* (১৮৪২-৪৩) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা : ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির (১৮৪৩) প্রধান উদ্যোক্তা। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার (১৮৬১)। *Black Acts*-এর প্রতিবাদে বক্তৃতা (১৮৫০) ; নিমতলা শ্মশানের স্থান-পরিবর্তন প্রস্তাবের প্রতিবাদে বক্তৃতা (১৮৬৪)।

দ্র. *Public speeches of the late Babu Ram Gopal Ghose and his remarks on the Black Acts,* together with a brief sketch of his life, Calcutta, 1871.

রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭)

ঐতিহাসিক, প্রবন্ধকার, কবি। বহরমপুরের ভূম্যধিকারী। ইটালীর ফ্লোরেন্টিনো আকেডেমী থেকে 'ডক্টর' উপাধিলাভ। 'তত্ত্বসঙ্গীত লহরী' (১৮৫৯), 'কুসুমমালা' (১৮৬১), 'বিলাপতরঙ্গ' (১৮৬৪), 'কবিতালহরী' (১৮৬৭), 'চতুর্দশপদী কবিতামালা' (১৮৬৭), 'ঐতিহাসিক রহস্য' (তিনভাগ, ১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৯), 'ভারতরহস্য' (১৮৮৫) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম সংস্কারক। প্রথম জীবনে অল্প কিছুদিন সরকারী চাকরী ও জন ডিগবীর 'দেওয়ান'। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস। আত্মীয় সভা (১৮১৫), ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভা (১৮২৮) স্থাপন। সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন। শিক্ষা সংস্কারের জন্য লর্ড আমহার্স্টের কাছে আবেদন (১৮২৩)। বিলাত প্রবাস (১৮৩১-৩৩)। 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্তসার' (১৮১৫), 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

দ্র. S. D. Collett, *The Life and letters of Raja Rammohun Roy*, (ed. by D. K. Biswas & P.C.Ganguli), Calcutta, 1962.

লঙ্, জেম্স

Long, Rev. James (১৮১৪-১৮৮৭)। চার্চ মিশনারী সোসাইটির পাদরি। ভারতবর্ষে অবস্থানকাল ১৮৪০-৭২, ১৮৬৬-৭২। কলিকাতায় প্রথমে মির্জাপুরে অবস্থিত সি.এম.এস. স্কুলে, এবং পরে ঠাকুরপুকুর গ্রামে মিশনের কার্যভার গ্রহণ। স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ। 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ ও ভূমিকা রচনার জন্য এক মাস কারাদণ্ড (১৮৬১)। *A Handbook of Bengal missions* (১৮৪৮), 'প্রবাদমালা' (১৮৬৮-৭২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

লব্, স্যামুয়েল

Lobb, Samuel (—১৮৭৬)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক (১৮৬১), প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক(১৮৬২-৬৩), সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে গণিতের অধ্যাপক (১৮৬৪-৬৭), হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৬৭ ৬৮), কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৭০-৭৬)। পজিটিভিস্ট ; বাংলাদেশে কোঁত্-দর্শন প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা। *A Brief view of Postivism* গ্রন্থ রচয়িতা।

লা মার্টিনিয়র

Claude Martin (১৭৩৫-১৮০০)-এর অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত লখ্নৌ

এবং কলিকাতায় La Martiniere নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মার্চ কলিকাতায় লা মার্টিনিয়র স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়; ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। কলিকাতায় লা মার্টিনিয়র স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার ক্যানন ক্রিস্টোফার।

লিটন

Lytton, Edward George Earle Lytton Bulwer (১৮০৩-১৮৭৩)। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার। *Pelham* (১৮২৮), *Last days of Pompeii* (১৮৩৪), *Harold* (১৮৪৮), *My novel* (১৮৫৩) প্রভৃতি উপন্যাস এবং *Money* (১৮৪০), *Richelieu* (১৮৩৮) প্রভৃতি নাটক রচয়িতা।

লোহারাম শিরোরত্ন (১৮২৫-১৮৮৩)

গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর নিবাসী পণ্ডিত। বহরমপুর নর্মাল স্কুলের শিক্ষক। 'মুগ্ধবোধসার', 'শিশুবোধ ব্যাকরণ', 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (দুইখণ্ড), 'নীতি-পুষ্পাঞ্জলি', 'মালতীমাধব' (১৮৬০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০-১৮৬৭)

ব্যবহারজীবী, বিচারক। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্র। সদর দেওয়ানী আদালতের রেকর্ড কীপার; জুনিয়ার গভর্ণমেন্ট প্লিডার (১৮৫৩); সিনিয়ার গভর্ণমেন্ট প্লিডার (১৮৬২)। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচার-পতি (১৮৬৩-৬৭)।

শরৎসুন্দরী দেবী (১৮৪৯-১৮৮৬)

পুটিয়ার রাণী। রাজশাহী জেলার পুটিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী (১৮৬২)। নানা সৎকার্যে বহু লক্ষ টাকা দান করেন। 'রাণী' উপাধিলাভ (১২ মার্চ ১৮৭৫); 'মহারাণী' উপাধিলাভ (১ জানুয়ারী ১৮৭৭)।

দ্র. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রাজ-তপস্বিনী, কলিকাতা, ১৯১২।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)

ধর্মপ্রচারক, কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা-লাভ (১৮৫৬-৭২)। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ (১৮৬৯)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের (১৮৭৮) প্রধান উদ্যোক্তা। বিলাত প্রবাস (১৮৮৮)। 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮), 'পুষ্পমালা' (১৮৭৫), 'মেজবৌ' (১৮৮০), 'হিমাদ্রিকুসুম' (১৮৮৭), 'ছায়াময়ী পরিণাম' (১৮৮৯), 'যুগান্তর' (১৮৯৫), 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

শ্যামাচরণ সরকার (১৮১৪-১৮৮২)

সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান অনুবাদক (১৮৫০-৫৭); সুপ্রিম কোর্টের ইন্টারপ্রিটর (১৮৫৭-৭৩)। টেগোর ল' লেকচারার (১৮৭২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৭৪)। 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৮৫২), 'ব্যবস্থাদর্পণ' (১৮৬০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন

মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতায় ২১০ বহুবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স (২৯ জুলাই ১৮৭৬)। উদ্দেশ্য—ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগদান। প্রথম দিকে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচারই প্রধান লক্ষ্য ছিল, পরে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই সংস্থা মনোযোগী হয়।

সেক্সপিয়র

Shakespeare, William (১৫৬৪-১৬১৬)। নাট্যকার, কবি, অভিনেতা। স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভনে জন্ম; ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে আগমন; বিভিন্ন থিয়েটারে যোগদান। নাটক রচনা: প্রথম পর্ব ১৫৯০/৯১-৯৪) *Henry VI, Richard III, Comedy of errors* প্রভৃতি; দ্বিতীয় পর্ব (১৫৯৫-৯৬/৯৭) *Romeo and Juliet, Midsummer night's dream, Merchant of Venice* প্রভৃতি; তৃতীয় পর্ব (১৫৯৭-১৬০০) *Henry IV, Julius Caesar, As you like it* প্রভৃতি; চতুর্থ পর্ব (১৬০১-১৬০৭/৮) *Hamlet, Othelo,*

King Lear, Macbeth প্রভৃতি ; পঞ্চম পর্ব (১৬০৮–১৬১২/১৩) *Winter's tale, The Tempest* প্রভৃতি।

সেন্টজেবিয়র কলেজ

ইংরেজ জেস্যুইট মিশনারী সম্প্রদায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট জেভিয়াস কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ান জেস্যুইট মিশনারীরা ১০নং পার্ক ষ্ট্রীটে কলেজটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

সেলিসবেরি, লর্ড

Salisbury, Robert Arthur Talbot Gascoigne Cecil, Third Marquis of (১৮৩০-১৯০৩)। সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া (১৮৬৬-৬৭ ; ১৮৭৪-৭৮); ফরেন সেক্রেটারী ; ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী (তিনবার)।

স্কট, ওয়াল্টার

Scott, Sir Walter (১৭৭১-১৮৩২)। ঔপন্যাসিক, কবি। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ; ব্যারিস্টার (১৭৯২)। কবি হিসাবে প্রথমে পরিচিতি ; *Lady of the lake* (১৮১০), *Rokeby* (১৮১২), *Lord of the isles* (১৮১৫) প্রভৃতি কাব্য রচনা। পরে উপন্যাস রচনায় অধিকতর খ্যাতি লাভ ; *Waverly* (১৮১৪), *Rob Roy* (১৮১৭), *Ivanhoe* (১৮২০) ; *The Talisman* (১৮২৫) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা।

স্বর্ণময়ী, মহারাণী (১৮২৭-১৮৯৭)

কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর (১৮৪৪) এস্টেটের ভার গ্রহণ। 'মহারাণী' উপাধিলাভ (১৮৭১) ; সি. আই. (১৮৭৮)। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিরাট দানের জন্য স্মরণীয়া।

হরলাল রায়

নাট্যকার। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ; বি. এ. (১৮৬২)। পটলডাঙ্গা

হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটির সহকারী সম্পাদক (১৮৬৩)। 'হেমলতা' (১৮৭৩), 'কঙ্কাল' (১৮৭৪), 'শত্রুসংহার নাটক' (১৮৭৪), 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৬) ও 'কনক পদ্ম' (১৮৭৫) নাটক রচয়িতা।

হরানন্দ ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগর (১৮২৭? ১৯১১)

সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। কলিকাতায় বাংলা পাঠশালায় ও মজিলপুরে ডাভিজ মডেল স্কুলের হেড পণ্ডিত। 'নলোপাখ্যান' (১৮৫৫), 'আদিকাণ্ড : রামায়ণ' (১৮৫৮) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ন্যায়রত্ন (১৮২৫-১৮৮৭)

সংস্কৃত পণ্ডিত। হাওড়া শিবপুরের অধিবাসী। বেথুন স্কুলের শিক্ষক, ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর অফ স্কুল্‌স; সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক (১৮৫৬)। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, মিউনিসিপাল কমিশনার। 'মুদ্রারাক্ষস' (১৮৬২), 'রত্নাবলী' (১৮৭৩), 'অরণ্যযাত্রা' (১৮৬৮), 'বিরাট পর্ব' (১৮৬৮) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর নিবাসী সাহিত্যিক। নর্মাল স্কুলের শিক্ষক। 'কাদম্বিনী নাটক' (১৮৬১), 'জয়বতীর উপাখ্যান' (১৮৬৩), 'কবিচরিত প্রথম খণ্ড' (১৮৬৯), 'মণিমালিনী' (১৮৭৪), 'রসসাগর' (১৮৭৭), 'রাজস্থানের ইতিহাস' (১৮৮৮) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১)

সাংবাদিক। মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অফিসে চাকুরী (১৮৫৭-৬১)। *Hindoo Patriot* পত্রিকার সম্পাদক (১৮৫৫-৬১)। ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সদস্য (১৮৫২-৬১)। নীলবিদ্রোহের সময় চাষীদের পক্ষাবলম্বন। রচনা সংকলন: 1. *Lectures on religious subjects* (ed. by Brojolal Chuckerbutty), Calcutta, 1887. 2. *Selections from the writings of*

Hurrish Chunder Mookerji (ed. by N. C. Sen Gupta), Calcutta, 1910.

দ্র. রামগোপাল সান্যাল, হিন্দুপেট্রিয়টের ভূতপূর্ব সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী, কলিকাতা, ১৮৮৭।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১৮৩৮-১৮৭২)

কবি, সাংবাদিক। ঢাকা থেকে 'কবিতাকুসুমাঞ্জলি' (১৮৬০), 'চিত্তরঞ্জিকা' (১৮৬২), 'অবকাশরঞ্জিকা' (১৮৬২), 'কাব্যপ্রকাশ' (১৮৬৪), 'হিন্দু হিতৈষিণী' (১৮৬৫), 'মিত্রপ্রকাশ' (১৮৭০) প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ। 'কবিতা কৌমুদী' (১৮৬৩-৭০), 'কীচকবধ কাব্য' (১৮৬৬), 'নির্বাসিতা সীতা' (১৮৭১) প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ রচয়িতা।

হলধর তর্কচূড়ামণি (১৭৯০-১৮৫১)

ভট্টপল্লী নিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক। জনার্দন বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র। নব্যন্যায়ের 'পত্রিকা' রচয়িতা।

হলধর ন্যায়রত্ন

সংস্কৃত পণ্ডিত। 'বঙ্গাবিধান' (১৮৩৯)-এর রচয়িতা।

হলায়ুধ

বৈয়াকরণ। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে 'অভিধান রত্নমালা' এবং 'কবিরহস্য' প্রণয়ন করেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

কবি। হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮৫৩-৬১)। ওকালতি ; সিনিয়র গভর্ণমেন্ট প্লিডার। 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১), 'কবিতাবলী' (১৮৭০), 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫, ১৮৭৭), 'ছায়াময়ী' (১৮৮০), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা।

দ্র. মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র (তিনখণ্ড), কলিকাতা, ১৩৩৫, ১৩৪৫, ১৩৩০।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যারত্ন (১৮৩১?-১৯০৬)

সংস্কৃত পণ্ডিত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত-এর অন্যতম অনুবাদক। 'রঘুবংশ' (১৮৬৮) 'কিরাতার্জ্জুনীয়' (১৮৬৭ ?) ও 'রামায়ণ' (১৮৬৯-৮৪) গ্রন্থের অনুবাদক।

হেয়ার, ডেভিড

Hare, David (১৭৭৫-১৮৪২)। কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার কার্যে অন্যতম উদ্যোগী। সিমলা পাঠশালা, আরপুলি পাঠশালা ও পটলডাঙা স্কুল পরিচালনায় অংশ গ্রহণ। স্কুল সোসাইটির সদস্য ও পরে সোসাইটির সম্পাদক। হিন্দু কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর (১৮২৫)। মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারী (১৮৩৭)।

নির্দেশিকা

গ্রন্থন-এর পক্ষে শ্রীসুশান্ত মজুমদার কর্তৃক এস ৮, বিদ্যাসাগর নিকেতন, কলিকাতা ৬৮ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীসুজিতকুমার রুদ্র কর্তৃক নিপুণ মুদ্রণ, ৩২ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।